সচিত্র
তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী

বা

ভারতবর্ষীয় তীর্থসমূহের মাহাত্ম্য প্রকাশ

ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালীর তীর্থপর্য্যটন।
অন্তিমেতে করে সবে চির আকিঞ্চন॥
ধর্ম্মকর্ম্ম তীর্থসেবা করিলে সাধন।
ইহকালে হয় সুখ, তুষ্ট নারায়ণ॥

শ্রীগোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত

প্রথম ভাগ

দ্বিতীয় সংস্করণ

CALCUTTA
THE BENGAL MEDICAL LIBRARY,
201, CORNWALLIS STREET.
1913

 মূল্য ১৷৷০ টাকা

Calcutta

PUBLISHED BY BEPIN BEHARI DHUR

356, Upper Chitpur Road

PRINTED BY FAKIR CHANDRA DAS

AT THE "INDIAN PATRIOT PRESS"

70, BARANOSI GHOSE'S STREET

Illustrated by SRIJUT PREO GOPAL DASS

1913

এই পুস্তক মূল্যবান্ স্বদেশী দীর্ঘস্থায়ী ক্লাসিক এন্টিক-উভ কাগজে ছাপা হইল।

প্রকাশক

এ|২৫

উৎসর্গ

পরম পূজ্যা মাতা ঠাকুরাণী

শ্রীচরণ কমলেষু ;—

মা !

তোমার অনন্ত করুণায় আমি এ শ্যামল ধরাতলে বিচরণ করিতেছি, তোমার ঋণ, তোমার স্নেহ, তোমার যত্ন, তোমার অপার্থিব স্বার্থত্যাগ অতুল্য ! তোমার সন্তোষ বিধান করিবার শক্তি ও সামর্থ্য, আমার এ দুর্ব্বল হৃদয়ে কি আছে মা ? দেবী তুল্যা তুমি ! এ দীন আজ তোমার সেই স্নেহসিক্ত চরণে তাহার সাধের "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" ভক্তিপুষ্পাঞ্জলিস্বরূপ অর্পণ করিতেছে, দীনের দান দয়া করিয়া গ্রহণ কর।

গ্রন্থকার

বিজ্ঞাপন

যাঁহারা তীর্থ-ভ্রমণার্থ লোকাভাবে মনে মনে চিন্তান্বিত হইয়া ভগ্নোৎসাহে কোন স্থানে যাত্রা করেন এবং তথায় ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া অপরিচিত প্রবঞ্চকদিগের সহিত বাক্যালাপের পর, তাহাদিগকে প্রকৃত সেতুয়া (তীর্থের পথদর্শক) ভাবিয়া উহাদের সঙ্গী হন, তাঁহাদিগকে প্রায়ই শেষে মনস্তাপ করিতে হয়, এমন কি ঐ সকল পাষণ্ডদিগের অত্যাচারের জন্য তীর্থসেবা দূরের কথা, স্বীয় প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত অস্থির হইতে হয়, কারণ ঐ সকল সেতুয়ারূপী প্রবঞ্চকগণ অজ্ঞ যাত্রীদিগকে প্রথমে এরূপ মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করেন—যেন তাহারা নিকটে থাকিলে উহাদিগের কত উপকার করিবে; প্রধান প্রধান খ্যাতনামা ষ্টেশনে তাহাদের গতিবিধি থাকে। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, ঐ সকল সেতুয়ারূপী প্রবঞ্চকদিগের সঙ্গী হইলে প্রথমে তাহাদের দ্বারা যৎসামান্য উপকার হয়, কিন্তু পরে তাহাদের ব্যবহারে বড়ই অসন্তুষ্ট হইতে হয়। ইহারা যাত্রীদিগের পরিচিত না হইলেও স্বীয় দক্ষতার সহিত নানাপ্রকার প্রশ্নোত্তরে তাঁহার নিকট কিরূপ অর্থ আছে, উহার সন্ধান লইয়া থাকে; তৎপরে উহারা সেই যাত্রীর ইচ্ছামত তীর্থ স্থানে পাণ্ডার নিকট লইয়া গিয়া—পাণ্ডার ন্যায্য প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক পরিমাণে অর্থ আদায় করিয়া থাকে। পাণ্ডার যথার্থ পাওনা বাদে যাহা অবশিষ্ট থাকে, উহা সেই সেতুয়ারই লভ্য হয়। তীর্থস্থানের পাণ্ডারা অধিক যাত্রী পাইবার আশায়—এইরূপ সেতুয়াদিগকে প্রশ্রয় দেন।

যদ্যপি কোন যাত্রী—কোন পাণ্ডার নাম সন্ধান করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হন, আর কোন সেতুয়া তাহার সহিত না থাকে, তাহা হইলে যে কোন তীর্থ স্থানের পাণ্ডা তাহাকে অধিক যত্ন করিয়া থাকেন এবং তাঁহার যথার্থ প্রাপ্য লইয়া সন্তুষ্টচিত্তে সুফলদানে সেই

যাত্রীকে সুখী করিয়া থাকেন। বলাবাহুল্য পাণ্ডারা বেশ জানেন যে, এই সকল যাত্রীর নিকট প্রাপ্য অংশ সমস্তই তাঁহাদের লাভ। অপরিচিত সেতুয়াদিগের সংসর্গ যাত্রীদিগের সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করা উচিত, তাহারা নিকটে আসিবার চেষ্টা দেখিলে সেই স্থান পরিত্যাগ করিবেন। এমন অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, ঐ সকল সেতুয়ারূপী প্রবঞ্চক যাত্রীর নিকট থাকিয়া প্রথমে নানাপ্রকারে তাঁহাদের বিশ্বাসভাজন হয়, আবার সুবিধানুযায়ী তাহাদেরই সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া থাকে। পবিত্র তীর্থ স্থানেও ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য বিচার তাহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না, আর এক কথা—প্রথমে উহারা নিজ খরচে যাত্রীদিগের বিশ্বাসভাজন হইবার নিমিত্ত ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞা প্রতিপালনের অপেক্ষা করে এবং রেল-খরচ প্রভৃতি নিজেই বহন করিয়া থাকে। অনেক সেতুয়া পাণ্ডাদিগের দ্বারা নিযুক্ত থাকে, তাহাদের ব্যয় পাণ্ডারাই বহন করিয়া থাকেন, কারণ বহু দূর হইতে একটী লোক ক্রমান্বয়ে বিনা খরচায় আপনার সঙ্গে থাকিয়া সমস্ত আজ্ঞাপালন করিতে থাকিলে চক্ষুলজ্জার খাতিরে, তাহার উপদেশ মত তাহারই পাণ্ডার নিকট যাইতে ইচ্ছা হয়। নানা তীর্থ স্থানে সেতুয়া-দিগের ব্যবহার দর্শনে অধীনের যতটুকু জ্ঞানলাভ হইয়াছে, তাহাতে বলা যায়—যে বহুদর্শী, পরিচিত, ধর্ম্মভীরু, বিশ্বাসী, সেতুয়া অর্থাৎ বহুকালাবধি যাঁহারা তীর্থসমূহে পরিভ্রমণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, সেইরূপ একটী লোক সংগ্রহ করিবেন, তাহা হইলে সকল বিষয়ে তাঁহাদের নিকট সাহায্য পাইবেন। যদিও তিনি পাণ্ডাদিগের নিকট স্বীয় প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করিবেন, কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি যাত্রী-দিগের সদাসর্ব্বদা মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন, কেন না—জীবিকা-নির্ব্বাহের একমাত্র ইহাই তাঁহাদের সম্বল; এই নিমিত্ত তিনি প্রাণপণে যাত্রীদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে সচেষ্ট থাকেন।

আমি একটী সদ্য ঘটনার বিষয় বর্ণনা করিতেছি ;—

একদা দশজন বিদেশী অজ্ঞ যাত্রীকে একজন সেতুয়া মিষ্টালাপে তুষ্ট করিয়া তাঁহাদের সঙ্গী হয় এবং উহারা "গয়া" তীর্থে গমন করিবেন, তাহা অবগত হইয়া হাবড়া হইতে গয়া ষ্টেশনের ভাড়া উক্ত দশজনের নিকট হিসাব করিয়া লইয়া—গয়া টিকিটের পরিবর্ত্তে শ্রীরামপুর ষ্টেশনের দশখানি টিকিট খরিদ করিয়া আনে এবং সযত্নে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া রেল-গাড়ীতে উঠাইয়া দেয়। বলাবাহুল্য, সেতুয়াটীও তাহাদের সহিত থাকিয়া প্রত্যেককে এক-একখানি টিকিট প্রদান করিরা বস্ত্রাঞ্চলে সেই টিকিট বাঁধিয়া রাখিতে উপদেশ দেন। সরল হৃদয় যাত্রীরা তাহার উপদেশমত কার্য্য করিয়া নিঃসন্দেহচিত্তে গয়া যাইতে লাগিল। এদিকে শ্রীরামপুরের মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশনে ঐ সেতুয়া—যাত্রী সংগ্রহের অছিলায় অন্তর্দ্ধান হয়, এইরূপে রেলগাড়ী এদিকে এসেনশোল জংসন ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে চিরপ্রথানুসারে রেলকর্ম্মাচারীরা টিকিট পরীক্ষা করিবার সময় সেই যাত্রীরা ঐ সেতুয়ার চাতুরী জানিতে পারিলেন। রেলকর্ম্মচারীগণ তাহাদের নিয়মানুযায়ী শ্রীরামপুর বাদে বেবাক ভাড়া আদায়, অধিকন্তু নানাপ্রকার লাঞ্ছনা করিলেন। এইরূপ প্রত্যহ কত প্রকারে কত রকম সেতুয়াদিগের চাতুরী প্রকাশ পায়, উহা বর্ণনাতীত। রেলকর্ত্তৃপক্ষের কড়া আদেশানুসারে কোন রেলকর্ম্মচারী কোন সেতুয়ার পরিচয় পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ষ্টেশন প্লাটফরম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন, এইরূপ নিয়মসত্ত্বেও নিত্য কত যাত্রীর কত প্রকার বিলাপধ্বনি শুনিতে হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই।

এইরূপ আর একটী উদাহরণ দিতেছি—যখন আমরা সপরিবারে কাশী-ধামে অবস্থান করিতেছিলাম, অভিরাম নামে একজন প্রয়াগের সেতুয়া কাশী-তীর্থ দর্শনের পর আমরা প্রয়াগতীর্থে যাইব সন্ধান পাইয়া ৬।৭ দিন একাধিক্রমে নিজ খরচে আমাদের নিকট আজ্ঞাবহ হইয়া অবস্থান করিতে

লাগিল এবং আমাদের নিকট ক্রমাগত তাহার পাণ্ডার অশেষ গুণ বর্ণনা করিতে লাগিল। আমাদের দলমধ্যে পাঁচজন পুরুষ, বাকি ১৪ জন স্ত্রীলোক, মোট ১৯ জন লোক ছিলাম। অভিরাম এই ১৯ জন যাত্রী সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত আমাদের নানা প্রকারে তুষ্ট করিয়া বলিল যে, আমি যখন আপনাদের সঙ্গে আছি, তখন দেখিবেন, আপনাদের এ তীর্থে যাবতীয় কার্য্য কত অল্প খরচে সম্পন্ন হয়। আপনারা স্ব স্ব ক্ষমতানুযায়ী প্রয়াগের শ্রাদ্ধকার্য্য কেবল সম্পন্ন করিবেন, আর ত্রিধারার সুফলের নিমিত্ত প্রত্যেক যাত্রীকে আমার পাণ্ডাকে মাত্র ১॥০ টাকা হিসাবে পৃথক্ দিতে হইবে। অভিরামের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া আমরা সকলে তাহার সহিত প্রয়াগ তীর্থের কীটগঞ্জ নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহারই উপদেশ মত তাহার পাণ্ডাকে তীর্থগুরুপদে মান্য করিলাম। বলাবাহুল্য, যে পর্য্যন্ত না অভিরাম আমাদিগকে তাহার পাণ্ডার কর কবলে আবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাবৎকাল পর্য্যন্ত সেই অভিরাম প্রাণপণ চেষ্টায় আমাদের আবশ্যকীয় সকল কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিল, কিন্তু শেষে যখন সুফলের সময় উপস্থিত হইল, অর্থাৎ পাণ্ডার হিসাব নিকাশের সময় আসিল, তখন এই আজ্ঞাবহ অভিরাম যে কোথায় অন্তর্দ্ধান করিল, তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না। অবশেষে পাণ্ডার সহিত নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক করিবার পর আমরা পাঁচজন পুরুষ লোক থাকা সত্ত্বেও এখানে লোক প্রতি ৪৲ টাকা হিসাবে সুফলের নিমিত্ত দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। ইহাতে যতটুকু শিক্ষালাভ করিয়াছি, সাধারণের সুবিধার্থে তাহাই প্রকাশ করিলাম, নিবেদন ইতি।

গ্রন্থকার।

ভূমিকা

বাঙ্গালী নানা বিষয়ে অধঃপতিত হইলেও তাঁহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মের পবিত্র মধুর ভাব এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্ম্মের নামে কাতারে কাতারে অসংখ্য হিন্দু নরনারী পুণ্য সঞ্চয়ের নিমিত্ত স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া পরম পবিত্র তীর্থস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। হিন্দু চিরকাল অকপট হৃদয়ে ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকেন। হিন্দুর সম্পূর্ণ বিশ্বাস, তীর্থস্থানে উপনীত হইয়া দেবদেবী দর্শনে মুক্তিলাভ হয়। এই অনন্ত জ্বালা যন্ত্রণাময় পরীক্ষাভূমি—"সংসারের" মায়া বন্ধন শিথিল হয়; তাই পিতা উপযুক্ত প্রাণপ্রিয় পুত্রহারা, পতি জীবনসহচরী পত্নীহারা, পুত্র জনক জননীর স্নেহসিক্ত ক্রোড়হারা হইয়া হৃদয়ের শোক, তাপ উপশম করিবার জন্য এই পবিত্র তীর্থস্থানে ছুটিয়া যান। প্রকৃতির শ্যামল শোভা সৌন্দর্য্য দর্শনে প্রাণে প্রীতি অনুভব করিয়া থাকেন, কিন্তু কালমাহাত্ম্যে আজ আমাদিগের সেই পরম পবিত্র তীর্থসমূহেও নানাপ্রকার প্রতারণা দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে নৌকাযোগে বা পদব্রজে যাঁহারা তীর্থে গমন করিতেন, তাঁহারা কত সময়, কত ক্লেশ, কত অর্থ ব্যয় করিয়া পাষণ্ড দস্যুদিগের ভয়ে ভীতচিত্তে কত বিড়ম্বনাভোগ করিয়া, জীবনের আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক, এই দুর্ল্লভ পবিত্র তীর্থস্থান দর্শন করিতেন, তাহা একবার চিন্তা করিলেও হৃদকম্প হয়।

এক্ষণে রেলগাড়ীর সাহায্যে এবং ইংরাজরাজের সুশাসন গুণে যাত্রী-দিগের গমনাগমন যতদূর সম্ভব সুখসাধ্য হইয়াছে। এই দ্রুতগামী রেল-গাড়ীর সাহায্যে অতি অল্প সময়ে ও সামান্য ব্যয়ে নির্ব্বিঘ্নে ধনী, দুঃখী, আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা সকলেই তীর্থস্থানে গমনপূর্ব্বক নয়ন ও জীবন সার্থক বোধ করিতেছেন।

পরম পবিত্র "তীর্থ" সমূহের মাহাত্ম্য অবগত হইয়াও ইহাতে অবিশ্বাস —ইহাই ভক্তিহ্রাসের প্রধান কারণ অনুমান হয়। প্রমাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে—যাহা সহজ লভ্য, তাহার আদরও তত অল্প,'আর যাহা দুর্ল্লভ—তাহার যত্নও ততোধিক পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অদ্যাপি যাত্রীদিগের মধ্যে এমন অনেক মহানুভবকে দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা তীর্থে—আগমন করতঃ ভক্তিসহকারে যথাবিধি তীর্থ কার্য্য সম্পাদন ও ভগবানের লীলাভূমি দর্শন করিয়া—প্রেমে পুলকিত হন, অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে থাকেন, এবং পবিত্র পুণ্যরজে বিলুণ্ঠিত হইয়া জীবন সার্থক বোধ করিয়া থাকেন। এ দীন আবাল্যকাল হইতে তীর্থভ্রমণ-প্রয়াসী, নানা তীর্থস্থান দর্শন করিয়া যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, তাহা সাধ্যমত এই "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" নামক পুস্তকে জনসাধারণে প্রকাশ করিয়াছে। যাঁহারা তীর্থ-ভ্রমণ অভি-লাষী, আশা করি—তাঁহারা একবার আমার বহু আয়াস ও যত্নের পুস্তক-খানি পাঠ করিয়া দেখিবেন—আমার এই "তীর্থ-ভ্রমণ কাহিনী" তীর্থ পর্য্যটকদিগের প্রিয়সহচর ও পথপ্রদর্শকের সম্পূর্ণ সহায়তা করিবে। ১ম ভাগে কালীঘাট হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের তীর্থসমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন হিন্দু গৃহস্থের পাঠোপযোগী বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় সংযোজনা করা হইয়াছে।

"তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী পুস্তক প্রণয়ন আমার প্রথম উদ্যম, ইহা যে জন-সাধারণের প্রীতিপ্রদ হইয়াছে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই প্রথম ভাগ নিঃশেষ

হইয়াছে, সেজন্য আমি গুণগ্রাহী পাঠক ও সুধীসমাজের নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁহাদিগের উৎসাহেই প্রথম ভাগ পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া পুনর্মুদ্রিত হইল। এই দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম ভাগের কলেবর এত বৃদ্ধি পাইল যে, বাধ্য হইয়া ইহাকেই দুই খণ্ডে বিভক্ত, অর্থাৎ প্রথম খণ্ডের পরিত্যক্ত অংশগুলি চতুর্থ ভাগ নামে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত বহু অর্থব্যয়ে অনেকগুলি তীর্থচিত্র ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে; এক্ষণে সুধীবৃন্দ পূর্ব্ববৎ কৃপা দৃষ্টি করিলে আমার সকল শ্রম ও অর্থ ব্যয় সার্থক বিবেচনা করিব।

সবিনয় প্রার্থনা—এ গ্রন্থে যদি কোন স্থানে কোনরূপ ভুলপ্রমাদ ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে সুধীবৃন্দ আমায় জ্ঞাপন করিলে তাহা সংশোধন করিয়া লইব। আশা উচ্চ, সামর্থ্য অতি ক্ষীণ, ভরসা সহৃদয় মহোদয়গণের সহানুভূতি লাভ।

কলিকাতা
৩৫৬, অপার চিৎপুর রোড,
সন ১৩২০ সাল।

গ্রন্থকার

তীর্থ-ভ্রমণ নামক সুবৃহৎ পবিত্র গ্রন্থখানি চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে

প্রথম ভাগে—কালীঘাট, শ্রীশ্রী৺তারকেশ্বর-তত্ত্ব, বৈদ্যনাথ, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, অযোধ্যা, হরিদ্বার, ইন্দ্রপ্রস্থ, কুরুক্ষেত্র, মথুরা, বৃন্দাবন, আগ্রা, জয়পুর, পুষ্কর ইত্যাদি। দক্ষিণে—পুরীতীর্থ। মূল্য ১৲ টাকা।

ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ ৩৩৬ পৃষ্ঠায় ৩১ খানি সুন্দর সুন্দর তীর্থ চিত্রসহ উত্তম কাপড়ে বাঁধাই হইয়া পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিতাকারে প্রকাশিত; এতদ্ভিন্ন গৃহস্থের নানাবিধ প্রয়োজনীয় বিষয় সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র, ভিঃ পিতে ১॥৶০ আনা।

দ্বিতীয় ভাগে—কলিকাতা হইতে রেলযোগে ওয়ালটেয়ার, প্রহ্লাদপুরী, গোদাবরী মান্দ্রাজ সহর, কাঞ্চীপুর, বালাজী, জলকান্তীশ্বর, অরুণাচলম্, বৈদ্যেশ্বর, মায়াভরম্, কুম্ভকোণম্, তাঞ্জোর, ত্রিচিনাপলী সহর, জগদ্বিখ্যাত শ্রীরঙ্গমজীউর দেবালয়, কাবেরী নদীর আদি বৃত্তান্ত, কিষ্কিন্ধ্যা-পুরী, বিরূপাক্ষদেব, মহীশূর রাজার স্বাধীন রাজ্য ও তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত চামুণ্ডাদেবী, মাদুরা সহর, সেতুবন্ধে—শ্রীশ্রীরামেশ্বর তীর্থ, আরও হরিদ্বার হইতে কন্‌খল্, লক্ষ্মণঝোলা, হৃষীকেশ তীর্থ, প্রসিদ্ধ ধাম শ্রীশ্রীকেদারেশ্বর ও শ্রীশ্রীবদরীকাশ্রম, এতদ্ভিন্ন কোন্ তীর্থে কিরূপ দ্রব্যের আবশ্যক, সমস্তই সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য—১।০ ভিঃ পিতে ১।৶০ টাকা মাত্র।

তৃতীয় ভাগে—কলিকাতা হইতে জব্বলপুর, নর্ম্মদা, বোম্বে, এলিফ্যাণ্টাকেপ, পুণাসহর, প্রভাসক্ষেত্র, দ্বারকাপুরী, এতদ্ভিন্ন গৌহাটীর অন্তর্গত শ্রীশ্রীকামখ্যাদেবী ও বশিষ্ঠাশ্রম, আরও চট্টগ্রামের অন্তর্গত শ্রীশ্রী৺চন্দ্রনাথ ও ৺আদিনাথ তীর্থ, দার্জ্জিলিংএ দুর্জ্জয়লিঙ্গ ও নেপালের অন্তর্গত শ্রীশ্রী৺পশুপতিনাথ দর্শন যাত্রা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

চতুর্থ ভাগে—কলিকাতা হইতে বালেশ্বর, শ্রীশ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথজীউ, বৈতরণী, ভুবনেশ্বর, সাক্ষীগোপাল, পুরী ও পদ্মক্ষেত্র, এতদ্ভিন্ন আগ্রা, জয়পুর, আজমীঢ়, পুষ্কর ও সাবিত্রীতীর্থ। মূল্য ১।০ টাকা। প্রত্যেক খণ্ডেই রাশি রাশি তীর্থ চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক খণ্ডের জন্য স্বতন্ত্র ৶০ ভিঃ পিঃ খরচ লাগে।

উত্তর-পশ্চিম তীর্থযাত্রায় আবশ্যকীয় দ্রব্যের তালিকা

তীর্থযাত্রার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিবেন যথা ;—সিদ্ধি, গাঁজা, নারিকেল ৮টা, সুপারি ৫০টা, হরিতকী ১২টা, যজ্ঞোপবীত ৫০টা রক্তচন্দন ২ খানা, সাধ্যমত স্বর্ণ বা রৌপ্যের বিল্বপত্র ২ দফা (একখানি বৈদ্যনাথজীউর অপরখানি কাশীর বিশ্বেশ্বরজীউর) সাদা চন্দন ৬ খানা, পঞ্চরত্ন ১০ দফা, আল্‌তা দুই কুড়ি, চিনের সিন্দুর ২ বাণ্ডিল, সিন্দুর-চুবড়ী সাজসহ ৬ দফা, লোহা (হাতে পরিবার) ২৫ গাছা, রুলি ১৪ জোড়া, সোণার নথ ৫টা, (কাশীর অন্নপূর্ণা দেবীর ১ দফা, কুমারী পূজার ১ দফা, সাবিত্রীদেবী ১ দফা বৃন্দাবনধামে শ্রীশ্রীরাধারাণী ১ দফা, অযোধ্যায় শ্রীশ্রীসীতাদেবীর ১দফা) সোনার তুল্‌সীপত্র ৩ দফা, (বৃন্দাবনধামে শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউ, শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউ ও শ্রীশ্রীমদনমোহনজীউর শ্রীচরণে অর্পণ করিবার নিমিত্ত।) শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর সাধ্যমতে—স্বর্ণ বা রৌপের নুপূর, বংশী সংগ্রহ করিবেন। দেবালয়ে বিতরণের নিমিত্ত, লালপাড় সাড়ী ১০ জোড়া, যে সকল ভক্ত দেবদেবীকে ভালরূপ বস্ত্র, থালা, ঘটি, দান করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা সহর হইতেই সংগ্রহ করিবেন। পশ্চিমে—প্রতি দেবালয়ে সন্ধ্যা আরতির সময় কর্পূরের আরতি হয়, এই নিমিত্ত দেবালয়ে কর্পূর দিবার প্রথা, আরও দেবালয়ে বিতরণ করিবার নিমিত্ত সাধ্যানুযায়ী মসলা লইবেন। যে সকল দ্রব্য লিখিত হইল, উহা সাধারণ যাত্রীর নিমিত্ত, ভক্তগণ ইচ্ছা করিলে অধিক পরিমাণে লইতে পারেন, কারণ দানের কোন কিছু বাঁধা নিয়ম নাই।

বিদেশ যাত্রার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত পাথেয়গুলি স্মরণ করিয়া যত্নসহকারে সংগ্রহ করিবেন, যথা ;—

মশারি ১টী, বিছানা ১ দফা, হ্যারিকেন ল্যাম্প ১টী সদাসর্ব্বদা প্রস্তুত অবস্থায় সঙ্গে রাখিবেন, কারণ রেলযোগে দূরদেশে যাইতে হইলে রাত্রি-কালে ট্রেণে উঠিবার বা নামিবার সময় আপন বাক্স, দ্রব্যাদি মিলাইয়া লইবার ইহাই সুবিধাজনক, এতদ্ভিন্ন বঁটি ১ খানি, ছোট মজবুত কুলুপ ১টী, পাকা মোটা রশি ১ গাছা (কুপ হইতে জল উঠাইবার নিমিত্ত) ব্যবহারের ঘটি ১টী, থালা, গেলাস ১ দফা, লোহার চাটু ও খন্তি ১ দফা, স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকিলে নারিকেল তৈল ১ বোতল, অম্ল আচার, দর্পণ, চিরুণী, ১ দফা, ক্লোরোডাইন ১ শিশি, বিশুদ্ধ গোলাপ জল ১ শিশি, কারণ ট্রেণে পরিভ্রমণ করিবার পর গঙ্গা, যমুনা, নদ বা নদীতে স্নান করিলে—চক্ষু উঠিবার সম্ভাবনা আছে। ট্রেণের মধ্যে অবস্থানকালে জল খাইবার জন্য একটী গেলাস সর্ব্বদা বাহিরে রাখিবেন, যে সকল ব্যক্তি বালাম-চাউল ভিন্ন অপর চাউল সহজে পরিপাক করিতে পারেন না, তাঁহাদিগকে উহা সহর হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে, তথায় উত্তম আতপ তণ্ডুল পাইবেন। এ তীর্থে পরিধেয় বস্ত্র সামান্যমাত্র লইলেই চলে—কারণ পশ্চিমের সকল স্থানেই রজকের সুবিধা আছে। এই স্থানে একটী কথা বলিবার আছে, যে স্থানে যে রজককে বস্ত্র ধৌত করিতে দিবেন, যে বাসাতে যখন অবস্থান করিবেন—তাহাদের পরিচিত রজককে দিবেন, এতদ্ভিন্ন সকল দ্রব্যই তথায় পাওয়া যায়।

গ্রন্থকার

তীর্থসেবকদিগের কর্ত্তব্য

তীর্থ-যাত্রা করিবার পূর্ব্ব দিবস গৃহে—উপবাসপূর্ব্বক যথাশক্তি গণেশ, পিতৃগণ ও বিগ্রহগণের পূজা করিয়া পরমানন্দে হৃষ্টচিত্তে শুভ দিন, শুভলগ্নে যাত্রা করিবেন। তীর্থে উপস্থিত হইয়া পিতৃগণের অর্চ্চনা করিতে হয়, এইরূপ করিলে অভীষ্ট ফললাভ হয়। তীর্থস্থানে ব্রাহ্মণের পরীক্ষা করিতে নাই। অন্নার্থীকে অন্নদান, ভিক্ষার্থীকে ভিক্ষাদান এবং চরু, শক্তু, গুড় প্রভৃতির দ্বারা পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ড দান করিতে হয়। তীর্থশ্রাদ্ধে অর্ঘ্য বা আবাহন নাই—কি প্রশস্ত, কি অপ্রশস্ত সকল সময়েই শ্রাদ্ধ করিতে পারা যায়। প্রসঙ্গত তীর্থে উপস্থিত হইয়া স্নান করিলে—স্নানফল পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তীর্থ যাত্রাজনিত ফললাভের আশা দুরূহ। তীর্থগমন দ্বারা পাপী ব্যক্তির পাপ দূর হয় সত্য, কিন্তু তাহারা অভীষ্ট ফললাভ করিতে পারে না, যাঁহারা শ্রদ্ধাশীল, তাঁহারাই অভীষ্ট ফললাভ করিয়া থাকেন। যিনি পরের জন্য বেতনাদি লইয়া তীর্থে গমন করেন, তিনি যোড়শাংশের একাংশ ফলপ্রাপ্ত হন। যাহার উদ্দেশে কুশময়ী প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করতঃ তীর্থ সলিলে নিমগ্ন করা যায়, তিনি অষ্টমাংশের একাংশ ফললাভ করেন, পুরাণে এইরূপ উপদেশ পাওয়া যায়। তীর্থে উপবাস ও শিরোমুণ্ডন করা কর্ত্তব্য, কারণ মুণ্ডনের ফলে—শিরোগত পাপরাশি তৎক্ষণাৎ দূর হইয়া থাকে। যেদিন তীর্থে প্রথম উপস্থিত হইবেন, তাহার পূর্ব্ব দিবস উপবাস এবং তীর্থপ্রাপ্তি দিবস শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিবেন।

পুরাবিৎগণ কর্ত্তৃক একটী প্রাচীন উপাখ্যান প্রকাশিত হইল। যে সকল সাধুর হৃদয়ে পরোপকারপ্রবৃত্তি জাগরূক থাকে, তাহাদের বিপদরাশি

সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং পদে পদে সম্পদ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পরোপকার দ্বারা যেরূপ শুদ্ধিলাভ হয়, তীর্থস্থানে তাদৃশী শুদ্ধির আশা নাই। পরোপকার দ্বারা যেরূপ ফল পাওয়া যায়, বহু দান দ্বারা তাদৃশ ফললাভ হয় না; পরোপকার দ্বারা যেরূপ পুণ্য উপার্জ্জিত হয়, কঠোর তপস্যাতেও তাদৃশ পুণ্য হয় না, অর্থাৎ পরোপকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং পরাপকার অপেক্ষা মহাপাপ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। জীবন ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সমস্তই করীকর্ণাগ্রবৎ চপল; সুতরাং কেবলমাত্র পরোপকার সাধন করাই মনীষী ব্যক্তির সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। যে নারী পতির আজ্ঞা না লইয়া স্বেচ্ছাক্রমে কোন তীর্থে গমন করেন, চরমে তাহাকে অধঃপতিত হইয়া শোচনীয় গতিলাভ করিতে হয়, আর যে ব্যক্তি সস্ত্রীক তীর্থস্থানে গমনপূর্ব্বক পিতৃগণের উদ্দেশে শুদ্ধচিত্তে পিণ্ডদান করেন, তাহার সৌভাগ্যের সীমা থাকে না। সেই পিণ্ড "রামসীতার" পিণ্ড নামে কথিত। পিণ্ডদানের সময় স্ত্রীকে পিণ্ড উত্তোলন করিয়া স্বামীকে সাহায্য করিতে হয়। পিতামাতা ব্যতীত জগতে শ্রেষ্ঠ গুরু আর নাই, বলাবাহুল্য—সকল তীর্থেই এই গুরু ও গোবিন্দ একত্র দর্শনে বহু পুণ্যলাভ হয়।

মানস-তীর্থের সংখ্যা অনেক। গয়াতীর্থ—পিতৃগণের মুক্তিপ্রদ; তনয়গণ ঐ স্থানে গমনপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে পিণ্ডদান দ্বারা পূর্ব্বপিতামহগণের ঋণ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। যে সকল তীর্থে স্নান করিলে পরমাগতিলাভ হয়, কথিত হইল—সত্য, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সর্ব্বভূতে দয়া, অর্জ্জব দান, দম, সন্তোষ, প্রিয়বাদিত্ব, জ্ঞান ও তপ এই সমস্তই মানস-তীর্থ বলিয়া জানিবেন। চিত্তশুদ্ধি সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনীয়। জলে দেহ প্লাবিত হইলেই তাহাকে স্নান বলা যায় না, দমগুণ রূপ জলে স্নাত, রাগাদিরহিত ও বিষয়কামনা শূন্য হইলেই প্রকৃত স্নাত বলা যায়। যে ব্যক্তি লোভী, পিশুন, ক্রূর, দাম্ভিক ও বিষয়াসক্ত, সে—সকল তীর্থে স্নাত

হইলেও পাপী এবং মলিন বলিয়া পরিগণিত হয়। দেহস্থিত মল দূর হইলেই মানব নির্ম্মল হইতে পারে না, মানস-মল-পরিত্যক্ত হইলেই শুদ্ধ-চিত্ত হওয়া যায়; অতিরিক্ত বিষয়াসক্তি—মানস-মল বলিয়া কথিত।

যে চিত্তে দুষ্টতা নিহিত আছে, তীর্থস্থানে তাহার কিরূপে পরিশুদ্ধি হইবে? চিত্ত নির্ম্মল না হইলে—দান, যজ্ঞ, শৌচ, তীর্থসেবা সকলই অতীর্থস্বরূপ হয়। জিতেন্দ্রিয় হইয়া মানুষ যেখানেই থাকুন না কেন, সেই থানেই তাঁহার তীর্থস্থান।

যে ব্যক্তি তীর্থে গমনপূর্ব্বক অন্ততঃ ত্রিরাত্রি বাস এবং গো, স্বর্ণ, দান না করেন, তাঁহাকে—জন্ম জন্ম দরিদ্র হইয়া থাকিতে হয়। তীর্থযাত্রা-ঘটিত যে ফল হয়, ভূরি দক্ষিণ যজ্ঞ দ্বারাও তাদৃশ ফলপ্রাপ্ত হইয়া যায় না, যে ব্যক্তির প্রতিগ্রহ বিমুখ ও যিনি যথালব্ধ দ্রব্যেই সন্তুষ্ট থাকেন এবং অহঙ্কারবর্জ্জিত, তাঁহারাই তীর্থ ফলপ্রাপ্তি হন। পুণ্যশীলের কথা দূরে থাকুক—শ্রদ্ধাবান ধীর ও সমাহিত হইয়া তীর্থে গমন করিলে পাপী ব্যক্তিও বিশুদ্ধিলাভ করিতে পারেন। শ্রদ্ধাহীন, নাস্তিক, সন্দিগ্ধচিত্ত ও হেতুবাদী—এই সকল লোক কদাপি তীর্থ ফলভোগী হইতে পারেন না। যাঁহারা সর্ব্বদ্বন্দ্বসহিষ্ণু, ধীর হইয়া যথাবিধি তীর্থ সমূহ পর্য্যটন করেন, অন্তিমে তাঁহারাই স্বর্গভোগী হইয়া থাকেন। তীর্থস্থানে কখন পাপকার্য্যে মতি রাখিবেন না, কাহারও সহিত কখন কলহ করিবেন না, 'ভক্তিই মুক্তি' এই সারগর্ভ উপদেশ-বাক্য হৃদয়ঙ্গমপূর্ব্বক সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন।

গ্রন্থকার

অধীন গ্রন্থকার ।

তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী

প্রথম খণ্ড

কালীঘাট দর্শন যাত্রা

কলিকাতা সহরের প্রায় তিন ক্রোশ দূরে ভবানীপুরের দক্ষিণ, বেলতলার পশ্চিমদিকস্থ পীঠ স্থানটী কালীঘাট নামে প্রসিদ্ধ। দক্ষ-যজ্ঞে সতী পতিনিন্দা শ্রবণ করিবামাত্র দেহ ত্যাগ করিলে, মহাদেব সতী-শোকে বিহ্বল হইয়াছিলেন। এমন কি, তিনি উন্মত্তের ন্যায় মৃত সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করেন। কথিত আছে, দেব-শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু, মহাদেবের এইরূপ অবস্থা দর্শনে সৃষ্টিনাশের আশঙ্কায় অধীর হইলেন এবং তাঁহাকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় সুদর্শন চক্র দ্বারা ঐ মৃতদেহ একান্ন খণ্ডে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন। সেই

বিচ্ছিন্নাংশ যে যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, বিষ্ণুমায়ায় সেই সেই স্থানই পুণ্যক্ষেত্র বা পীঠ স্থানে পরিণত হইয়াছে।

একান্ন পীঠ স্থানের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইল ;—

১। হিঙ্গুলায়—সতীর ব্রহ্মরন্ধ্র পতিত হয়। এখানে দেবী কোটরী-ভৈরব ভীমলোচন নামে খ্যাত।

২। শর্করায়—দেবীর তিন চক্ষু পতিত হয়। এখানে ভগবতী মহিষ-মর্দ্দিনী ভৈরব ক্রোধীশ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

৩। জ্বালামুখীতে—জিহ্বা পতিত হয়। এখানে দেবী অম্বিকা ভৈরব উন্মত্ত।

৪। ভৈরব পর্ব্বতে—ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ থাকায়, অবন্তী মহাদেবা ভৈরব লম্বাকর্ণ নামে বিখ্যাত।

৫। প্রভাসে—উদর থাকায়, দেবী চন্দ্রভাগা ভৈরব বক্রতুণ্ড নামে খ্যাত।

৬। গণ্ডকীতে—দক্ষিণ গণ্ড থাকায়, এখানে দেবী গণ্ডকী চণ্ডিকা ভৈরব চক্রপাণি হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

৭। গোদাবরীতীরে—বাম গণ্ড পতিত হয়। এখানে তিনি বিশ্ব-মাতৃক ভৈরব বিশ্বেশ নামে খ্যাত হইয়া অবস্থান করিতেছেন।

৮। অনলে—ঊর্দ্ধ দন্ত পুংক্তি থাকায়, দেবীনারায়ণী ভৈরব সংহার নামে পেসিদ্ধ।

৯। জনস্থানে—চিবুক থাকায় এখানে দেবী ভ্রামরী বিকৃতাক্ষ ভৈরব নামে স্থিত হইয়াছেন।

১০। সুগন্ধ্যায়—নাসা পতিত হয়, দেবী সুনন্দা, এখানে ভৈরব ত্র্যম্বক নামে প্রসিদ্ধ।

১১। পঞ্চসাগরে—অধোদন্ত পংক্তি পতিত হয়। এখানে ভগবতী বরাহী, ভৈরব মহারুদ্র নামে বিরাজমানা।

১২। করতোয়াতটে—বাম তল্প পতিত হয়। দেবী এখানে অর্পণা ভৈরব বামন নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

১৩। মলয় পর্ব্বতে—দক্ষিণ তল্প থাকায় এখানে দেবী সুনন্দা, ভৈরব সুন্দরানন্দ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

১৪। বৃন্দাবনে—কেশজাল স্থান পতিত হয়। এখানে দেবী কেশজাল উমা, ভূতেশ ভৈরব নামে বিরাজিতা। মথুরা হইতে এই পীঠ স্থানটী ৮ মাইল দূরে অবস্থিত।

১৫। কিরীটে—দেবী বিমলা ভৈরব সম্বর্ত্ত নামে বিরাজ করিতেছেন।

১৬। শ্রীহট্টে—গ্রীবা পতিত হয়। এখানে দেবী মহালক্ষ্মী ভৈরব ঈশ্বরানন্দ বা সর্ব্বানন্দ ভৈরব নামে বিখ্যাত।

১৭। কাশ্মীরে—কণ্ঠ পতিত হয়। এখানে তিনি মহামায়া ভৈরব ত্রিসন্ধোশ্বর নামে বিরাজ করিতেছেন।

১৮। রত্নাবলীতে—দক্ষিণ স্কন্ধ থাকায় দেবী কুমারী ভৈরব অভি-রামকুমার নামে বিখ্যাত।

১৯। মিথিলাতে—বাম স্কন্ধ পতিত হয়। এখানে দেবী মহাদেবী ভৈরব মহোদর নামে বিরাজ করিতেছেন।

২০। চট্টগ্রামে—দক্ষিণ হস্তার্দ্ধ থাকায় দেবী ভবানী ভৈরব চন্দ্র-শেখর নামে প্রসিদ্ধ।

২১। মানস সরোবরে—দক্ষিণ হস্তার্দ্ধ পতিত হয়। এখানে দেবী দাক্ষায়ণী অমর-ভৈরব নামে বিরাজ করিতেছেন।

২২। উজানীতে—কনুই পতিত হয়। এখানে দেবী মঙ্গলচণ্ডী ভৈরব কপিলেশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

২৩। মণিবন্ধে—মণিবন্ধ, এখানে দেবী গায়ত্রী ভৈরব সর্ব্বানন্দ নামে প্রসিদ্ধ।

২৪। প্রয়াগে—দুই হস্তের দশ অঙ্গুলি পতিত হয়। এখানে দেবী ললিতা ভব-ভৈরব নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

২৫। বহুলাতে—বাম হস্ত পতিত হয়। এখানে দেবী বহুলা চণ্ডিকা-ভৈরব ভীরুক নামে অবস্থান করিতেছেন।

২৬। জলান্ধরে—প্রথম স্তন পতিত হয়। দেবী ত্রিপুরমালিনী ভৈরব ভীষণ নামে খ্যাত হইয়াছেন।

২৭। রামগিরিতে—দ্বিতীয় স্তন পতিত হয়। এখানে দেবী শিবাণী চণ্ড-ভৈরব নামে বিরাজমান।

২৮। বৈদ্যনাথে—হৃদয় থাকায়, দেবী জয়দুর্গা নামে ভৈরব বৈদ্যনাথ হইয়া অবস্থান করিতেছেন।

২৯। কাঞ্চীদেশে—কাকালি থাকায়, এখানে ভৈরব রুরু নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

৩০। উৎকলে—নাভি পতিত হয়। এখানে দেবী বিমলা নামে ভৈরব জগন্নাথ হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

৩১। কালমাধবে—অর্দ্ধ নিতম্ব থাকায় দেবী কালিকা অসিতাঙ্গ ভৈরব নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

৩২। নর্ম্মদাতীরে-শোনন্দে—বাম নিতম্ব থাকায়, দেবী এখানে শোনাক্ষী ভদ্রসেন ভৈরবরূপে বিরাজমান।

৩৩। নেপালে—জানুদ্বয় পতিত হয়। এখানে দেবী মহামায়া ভৈরব কাপালী নামে বিখ্যাত হইয়া অবস্থান করিতেছেন।

৩৪। কামরূপে—মহামুদ্রা, দেবী কামাখ্যা নামে উমানন্দ ভৈরব হইয়া আছেন।

৩৫। মগধে—দক্ষিণ জঙ্ঘা পতিত হয়। এখানে দেবী সর্ব্বানন্দকারী ভৈরব ব্যোমকেশরূপে বিরাজিত।

৩৬। শ্রীহট্ট জেলার জয়ন্তীতে—বামজঙ্ঘা থাকায়, এখানে দেবী জয়ন্তী ভৈরব ক্রমদীশ্বর বা মেলাই চণ্ডী নামে খ্যাত হইয়া অবস্থান করিতেছেন।

৩৭। ত্রিপুরাতে—দক্ষিণ চরণ পতিত হয়। এখানে ত্রিপুরাসুন্দরী ভৈরব ত্রিপুরেশ হইয়া আছেন।

৩৮। ক্ষীরক গ্রামে—দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ থাকায় দেবী যুগাদ্যা ভৈরব ক্ষীর মস্তকরূপে বিরাজমান।

৩৯। কালীঘাটে—দক্ষিণ চরণের চারিটী অঙ্গুলী থাকায়, দেবী এখানে কালিকা নামে ভৈরব-নকুলেশ হইয়া আছেন।

৪০। কুরুক্ষেত্রে—দক্ষিন পায়ের গুলফ্, এখানে দেবী স্থাণু ভৈরব সম্বর্ত্ত হইয়া বিরাজমানা।

৪১। বক্রেশ্বরে—ভ্রূ-মধ্য পতিত হওয়ায়, এখানে দেবী মহিষমর্দ্দিনী ভৈরব বক্রনাথরূপে অবস্থান করিতেছেন।

৪২। যশোহরে—পাণিপথ থাকায় এখানে দেবী যশোরেশ্বরী নামে ভৈরব চণ্ড হইয়া বিরাজমানা।

৪৩। নন্দীপুরে—হার পতিত হয়। এখানে দেবী নন্দিনী ভৈরব নন্দিকেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

৪৪। বারানসীক্ষেত্রে—কুণ্ডল পতিত হয়। এই পুণ্যক্ষেত্রে দেবী বিশালাক্ষী ভৈরব কালরূপে অবস্থান করিতেছেন।

৪৫। কন্যাশ্রমে—পৃষ্ঠ পতিত হওয়ায় দেবী সর্ব্বানী নিমিষ ভৈরব হইয়া আছেন।

৪৬। লঙ্কায়—নুপুর পতিত হয়। এখানে দেবী ইন্দ্রাক্ষী রাক্ষশেশ্বর ভৈরব নামে বিখ্যাত।

৪৭। বিভাসে—বাম গুলফ্ পতিত হওয়ায়, দেবী ভীমরূপা সর্ব্বানন্দ ভৈরব হইয়া অবস্থান করিতেছেন।

৪৮। বিরাটে—পদাঙ্গুলী থাকায় দেবী অম্বিকা ভৈরব অমৃতরূপে বিরাজমানা।

৪৯। ত্রিস্রোতাতে—বাম পদ থাকায়, এখানে দেবী ভ্রামারী ঈশ্বর ভৈরব হইয়া অবস্থান করিতেছেন।

৫০। অট্টহাসে—অধঃওষ্ঠ থাকায় দেবী ফুল্লরা বিশ্বেশ ভৈরব হইয়া আছেন।

৫১। কর্ণাটে—কর্ণদ্বয় পতিত হওয়ায়, দেবী জয়দুর্গা এখানে ভৈরব অভিরুক হইয়া আছেন।

কালীক্ষেত্রে—সতীর দক্ষিণ চরণের চারিটী অঙ্গুলী পতিত হইয়াছে, এই শুভ সংবাদ জনসমাজে প্রচার হইবার পূর্ব্বে এই স্থানটী অরণ্যগর্ভে নিহিত ছিল।

কালীক্ষেত্র নামক স্থানটি বহুকালের প্রাচীন। প্রমাণ স্বরূপ দেখুন, আইনি-আকবরী নামক পুরাকালের মুসলমান গ্রন্থে ইহার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বিখ্যাত তোডরমল্ল যে "ওয়াশীলতুমার জমা" নামে একটী রাজস্ব হিসাব প্রস্তুত করেন, তাহাতে এই কালীক্ষেত্রের নাম দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমানকালে ইংরাজদিগের আমলে সেই প্রাচীন নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া কলিকাতা নামে খ্যাত হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হুগলীর এজেণ্ট, মাননীয় জব চার্ণক কর্ত্তৃক ১৬৯০ খৃঃ হইতে সেই জঙ্গলাবৃত কলিকাতা নগরের শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ হইয়াছে।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ১৬৮১ খৃঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নাম ধরিয়া ইংরাজেরা এই নগরে প্রথমে বাণিজ্য করিবার অছিলায় উপস্থিত হন। ইহার প্রধান কারণ এই যে, উক্ত খৃঃ ২০শে ডিসেম্বর তারিখে, ইংরাজদিগের হুগলীর এজেণ্ট মাননীয় মিঃ জব চার্ণক মহোদয়ের সহিত তথাকার ফৌজদারের কোন বিশেষ কারণে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি আপন দলবলসহ এখানে অর্থাৎ এই কালীক্ষেত্রে আশ্রয় গ্রহণ এবং সুতানুটিতে একটী কুঠি স্থাপন করেন। সুতরাং বলিতে হইবে, তাঁহার শুভাগমন হইতেই এই জঙ্গলাবৃত নগরটীর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

শেট ও বসাক—ইঁহারাই কলিকাতার আদিম নিবাসী বলিয়া খ্যাত। বলা বাহুল্য, ইঁহারা জাতিতে তন্তুবায়। পূর্ব্বে ইঁহাদের কাপড় বুনিবার সুতার ব্যবসা ছিল, ঐ সকল সুতার নুটি তাঁহারা যে স্থানে শুকাইতেন, সেই সেই স্থানগুলি অদ্যাপি সুতানুটি নামে খ্যাত।

ইতিহাস পাঠে আরও অবগত হওয়া যায় যে, সেই প্রাচীন পীঠ মন্দিরের উপর বর্ত্তমান কালী মন্দিরটী সংস্কারের পর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া সুবিধামত অপর এক স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। কেন না, বহুলা (বেহালা) নামক স্থান হইতে দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমিগুলিই কালীক্ষেত্র নামে খ্যাত। কিন্তু ইংরাজ অধিকারের সূচনা হইতে সেই কালীক্ষেত্রটী সঙ্কুচিত হইয়া সামান্যমাত্র ভূমি লইয়া কালীঘাট নামে খ্যাত হইয়াছে। ১৫৮৬ খৃঃ ভারতে প্রলয়ঙ্কর ঝড়বৃষ্টি হওয়ায় সমুদ্রের জল উথলিয়া উঠিলে কালীক্ষেত্রের দক্ষিণ দিকটী একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। সেই দক্ষিণ ভাগটী বর্ত্তমানকালে ইহার সহিত পৃথক্ হইয়া সুন্দরবন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

মিঃ চার্ণক অত্যন্ত সাহসী ও বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি এখানে

সদলে আসিয়া যে স্থানে আপন বাঙ্গলা স্থাপনপূর্ব্বক বাস করিয়াছিলেন, অদ্যাপি ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানটী বারাকপুর নামে শোভা পাইতেছে। এই স্থানে কলিকাতার কিছু পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানকালে শিয়ালদহের সন্নিকটে যে স্থানটী বৈঠকখানা নামে জনসমাজে পরিচিত, পুরাকালে ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানে একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ আপন শাখা-প্রশাখাসহ বহুদূরব্যাপী বিস্তৃত ছিল। কথিত আছে, বণিকেরা ব্যবসা উপলক্ষে নানা দেশ পর্য্যটনপূর্ব্বক শেষে তাঁহারা সকলে একবার এখানে আসিয়া ঐ বৃক্ষতলে একত্রিত হইতেন এবং পরস্পর পরস্পরের কুশল সমাচার লইতেন, অধিকন্তু নানা বিষয়ে উপদেশ পাইয়া পরমানন্দ অনুভব করিতেন। যদিও উক্ত বটবৃক্ষটী এক্ষণে তথায় নাই, তথাপি এই কারণে ঐ স্থানটী অদ্যাপি এখানে বৈঠকখানা নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে।

ইতিহাস পাঠে বুঝা যায় যে, ইংরাজেরা এখানে আসিয়া প্রথমে ১৬৯৮ খৃঃ নবাব বাহাদুরের নিকট ফোর্ট উইলিয়ম নামক দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হন। ইহার ছয় মাসকাল পরে তাঁহারা সুবিধামত আবার সম্রাট আজিম ওসমান পাশার নিকট উক্ত সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা নগরটী মূল্য ধার্য্য করিয়া ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন।

বর্ত্তমানকালে আমরা যে উইলিয়ম ফোর্ট দেখিতে পাই, উহা ইংরাজদিগের প্রতিষ্ঠিত সেই প্রাচীন কেল্লা নয়, আধুনিক ফেয়ারলি প্লেস নামক স্থানে সেই কেল্লাটী স্থাপিত ছিল। কথিত আছে, নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন ইংরাজদিগের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া সসৈন্যে কলিকাতায় তাঁহাদিগকে আক্রমণ করেন, তখন তাঁহার বীর সৈন্যেরা অমিত বিক্রমে সেই প্রাচীন ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত কেল্লাটী একেবারে ভূমিস্যাৎ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ঐ সময় চাঁদপালের ঘাট নামক স্থানে দক্ষিণ

অংশটী অত্যন্ত বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, বর্ত্তমানকালে সেই জঙ্গলাবৃত স্থানটী চৌরঙ্গী নামে অভিহিত। ইংরাজদিগের ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হইলে, তাঁহারা আপন ইচ্ছামত বর্ত্তমান উইলিয়ম নামক ফোর্টটী ভাগীরথী-তীরের উপর স্থাপিত করিয়া কলিকাতা সহরটিকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ উইলিয়মের রাজত্বকালে ১৭৭৩ খৃঃ এই কেল্লাটী প্রস্তুত হয়। এই নিমিত্ত ইহার নাম ফোর্ট উইলিয়ম হইয়াছে। এই কেল্লাটীর ছয় দিকে ছয়টী ফটক আছে, ঐ সকল ফটক ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত যথা ;—সেণ্টজর্জ্জ গেট, ট্রেজারী গেট, চৌরঙ্গী গেট, পলাসী গেট, কলিকাতা গেট, ও ওয়াটার গেট। ইহার চতুর্দ্দিকে ৯৯টী কামান, শত্রুদিগের আক্রমন হইতে রক্ষা পাইবার অভিপ্রায়ে সজ্জিত আছে, আবার এই কেল্লা-মধ্যেই হাট, বাজার, গির্জ্জা, বিচারালয় প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিয়া ইংরাজ রাজের মহিমা প্রকাশ করিতেছে।

এই প্রাচীন বনজঙ্গলাবৃত দস্যু, ডাকাত পরিপূর্ণ কলিকাতা নগরটী কিরূপে কাহার আমলে এরূপ সৌন্দর্য্যশালী হইয়া ভারতের রাজ-ধানীতে পরিণত হইয়াছে, পাঠক মহোদয়ের নিকট তাহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইল।

ইংরাজদিগের রাজত্বকালে ১৭৫৬ খৃঃ একবার বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, এই কলিকাতা নগরটী তাঁহাদের হাতছাড়া হয়, তৎপরে ১৭৫৭ খৃঃ ২রা জানুয়ারী তারিখে, তাঁহারা শত্রুদিগকে বাহু এবং বুদ্ধিবলের পরিচয় দিয়া ঐ সকল বিদ্রোহী দমনপূর্ব্বক ইহাকে পুনরায় অধিকার করেন। ঠিক্ এই সময় সৌভাগ্যক্রমে ইংরাজেরা নবাব-সেনাপতি মিরজাফরের বলে বলিয়ান হইয়া পলাসী যুদ্ধে জয়লাভপূর্ব্বক, নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত এবং তৎস্থানে মিরজাফরকে নবাব পদে অভিষেক করেন। ১৭৫৭ খৃঃ ১৭ই আগষ্ট তারিখ হইতেই ইংরাজ

নামাঙ্কিত মুদ্রার প্রচলন হয়, তখন ঐ মুদ্রা বিলাতে প্রস্তুত হইত। সুতরাং বলিতে হইবে, এই ১৭৫৭ খৃঃ হইতেই কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে সুরু হইয়াছে। তৎপরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাদের নবপ্রতিষ্ঠিত নবাব মিরজাফরের নিকট হইতে কলিকাতার চতুপার্শ্ববর্ত্তী যে ভুভাগের স্বত্বলাভ করেন, উহাই এক্ষণে ২৪ পরগণা নামে খ্যাত হইয়া অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

১৭৭২ খৃঃ লর্ড হেষ্টিংস মহোদয় ভারতের গভর্ণর হইলে, এখানে রেভিনিউবোর্ড স্থাপিত হয়। তৎপরে ১৭৭৫ খৃঃ খিদিরপুরের উত্তর-স্থিত টালিগঞ্জ নামক স্থানে "কর্ণেল টলি" নামক এক মহাত্মার তত্ত্বাবধানে একটী খাল খনন করান হয়। ইহার কিছুকাল পরে এই খৃষ্টাব্দেই কর্ণেল হেন্‌রি-ওয়াটসন নামে আর একজন সাহেব এখানে উপস্থিত হইয়া খিদিরপুরের ডকটী নির্ম্মাণ করিয়া বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত করিয়া দেন।

১৭৮৩ খৃঃ উইলিয়ম জোন্স নামক এক মহাপুরুষ বিলাত হইতে সুপ্রীমকোর্টের জজ হইয়া এখানে আসেন, তাঁহারই উদ্যোগে কলিকাতায় "এসিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গল" নামক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পার্ক ষ্ট্রীটের উত্তর পশ্চিম কোণে অদ্যাপি এই সভা গৃহটী বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিতেছে। বোধ হয়, সকলেই অবগত আছেন যে, এখানকার গভর্ণর মাননীয় কর্ণওয়ালিস মহোদয়ের রাজত্বকালে, তাঁহারই আদেশে শিবপুরের বোটানিকেল গার্ডেন এবং ইহার কিছু উত্তরে বিসপ কলেজটী স্থাপিত হওয়ায়, ভারতবাসীর উচ্চশিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়। ইনি যুদ্ধাদিতে জয়লাভ করিয়া যেমন যশোভাজন হইয়াছিলেন, রাজস্বেরও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া তেমনই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এই মহাত্মার শাসনকালেই

ফৌজদারী ও দেওয়ানি বিচারালয়ের সৃষ্টি হয়। তৎপরে অর্থাৎ ১৭৮৮ খৃঃ, বর্ত্তমান লালবাজারের সন্নিকটে টেরিটীর বাজারটী স্থাপিত হয়। মহাত্মা টেরিটা সাহেব কর্ত্তৃক এই বাজারটী সংস্থাপিত হওয়ায়, তাঁহারই নামানুসারে এই বাজারটীর নাম টেরিটির বাজার হইয়াছে। এক সময় এই বাজারটী অতিশয় সৌন্দর্য্যশালী ছিল। কথিত আছে, উক্ত সাহেবের মৃত্যুর পর লটারির দ্বারা বাজারটী হস্তান্তরিত হওয়ায় এক্ষণে উহা বর্দ্ধমানের মহারাজাদের সম্পত্তি হইয়াছে। এ বাজারে অদ্যাপি পক্ষী ও ছোট ছোট বন্য জানোয়ারগুলি এবং মজবুত জুতা সকল বিক্রয় হয় বলিয়া জনসমাজে ইহা প্রসিদ্ধ আছে। এক্ষণে এই বাজার-টীর সৌন্দর্য্য ধর্ম্মতলার মিউনিসিপাল মার্কেট যাহা ৯০০০০০৲ টাকা ব্যয়ে মিউনিসিপাল কমিসনার মাননীয় হগ সাহেব স্থাপিত করেন, তথায় সংযুক্ত হইয়াছে। ইহার কিছুকাল পরে ক্রমে ১৭৯৯ খৃঃ গভর্ণ-মেণ্ট হাউসটী প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই স্থানের শোভা শত গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৮০৪ খৃঃ টাউন হল স্থাপিত হয়, তাহার পর ১৮২৩ খৃঃ কলি-কাতায় টাকশাল, সংস্কৃত কলেজ এবং বেঙ্গল ক্লাব স্থাপিত হইয়া, সেই প্রাচীন নগরটী এক অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত হইয়াছে। যখন ভারতবর্ষে সার চার্লস ১৮৩৫ খৃঃ গভর্ণর পদে অভিষিক্ত হন, সেই সময় এখানে মুদ্রণ-স্বাধীনতা আইন প্রস্তুত হয়, এবং এই মহাত্মার আদেশেই সাধা-রণ পুস্তকাগার স্থাপিত হওয়ায় জনসাধারণের বিস্তর সুবিধা হইয়াছে। সার চার্লসেরই শাসনকালে প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার কিছুকাল পরে যখন লর্ড অকৃলাণ্ড মহোদয় এখানকার গভর্ণর হন, ঐ সময় তাঁহার ভগ্নী, মিস ইডেন্, বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়মের সন্নিকটস্থ ভাগীরথীতীরের উপরিভাগে

একটী বাগান স্থাপনা করিয়া, তাঁহরাই নামানুসারে উদ্যানটী "ইডেন গার্ডেন" নামে খ্যাত করেন।

এই ইডেন উদ্যানে সকল শ্রেণীর নরনারী অদ্যাপি অবাধে বিচরণ এবং স্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিয়া তাঁহার মহিমা প্রকাশ করেন। ইহার পর ১৮৫১ খৃঃ রেলওয়ে কার্য্য আরম্ভ হইয়া বাণিজ্যের এবং যাত্রীদিগের দূর-দেশ গমনাগমনের পথ প্রশস্ত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ইহারই বৎসরকাল পর, ডাক্তার ওসানসি মহোদয় টেলিগ্রামের সৃষ্টি করিয়া আপন বুদ্ধি-বলের পরিচয় প্রদান করেন, আবার এই সন হইতেই ডাকের জন্য স্বতন্ত্র কার্য্য বিভাগ স্থাপিত হইয়া পত্রাদি চালাইবার সুবন্দোবস্ত হয়, আরও স্থানে স্থানে প্রশস্ত রাজপথ প্রস্তুত করাইয়া সাধারণের গমনাগমনের কত সুবিধা করিয়াছেন, উহা লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করা অসাধ্য।

১৮৫৬ খৃঃ লর্ড ক্যানিং মহোদয় ভারতবর্ষের গভর্ণর পদে নিযুক্ত হইলে, নানা সাহেবের মন্ত্রণায় দেশীয় সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়। বলা-বাহুল্য, ইহাতে তাঁহার শাসন কার্য্যে নানারূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া-ছিল। তারপর বিদ্রোহী দল ইংরাজ রাজের আয়ত্ব হইলে, ওয়াকোপ সাহেব বাংলার ডাকাইত কমিশন পদে নিযুক্ত হইয়া, এখানকার ডাকাইতদিগকে উৎসন্ন করেন, তৎসঙ্গে গোয়েন্দা বিভাগ স্থাপিত করিয়া ভারতবাসীদিগকে নিরাপদে বাস করিবার অবসর প্রদান করেন। এই-রূপে বৎসরকাল অতীত হইলে, ১৮৫৮ খৃঃ মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিবর্ত্তে স্বয়ং স্বহস্তে ভারত সাম্রাজ্যের শাসন ভার গ্রহণ করেন এবং ১৮৫৯ খৃঃ "ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" পদের সৃষ্টি করিয়া "ইনকম ট্যাক্স" নামক নূতন কর স্থাপন করেন। এইরূপে কিছুকাল একভাবে কাটিলে পর, ১৮৬২ খৃঃ লর্ড এলগিন্ মহোদয় এখানকার গভর্ণর হইলেন, তখন তিনি প্রজাবর্গের সুবিচারের সুবিধার নিমিত্ত

সদর আদালত ও সুপ্রীমকোর্টকে একত্র করাইয়া হাইকোর্টের স্থাপনা করেন। এই সন হইতে শিয়ালদহে রেলগাড়ী চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। তৎপর ১৮৭৮ খৃঃ মাননীয় লর্ড রিপন গভর্ণর পদে অভিষিক্ত হইলে, তাঁহারই শাসনকালে নূতন রাইটর্স বিল্ডিং, ইডেন হাঁসপাতাল এবং এক পয়সা মূল্যের পোষ্টকার্ড প্রচলনের সৃষ্টি হয়। এই সদাশয় গভর্ণরের শাসনকালে ভারতবাসী নানাপ্রকারে তাঁহার নিকট সাহার্য্য লাভ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এই মহাত্মাই তুলাজাত দ্রব্যের শুল্ক উঠাইয়া দেন এবং ইঁহারই আদেশক্রমে বাঙ্গালীর সুসন্তান কায়স্থকুল তিলক রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় হাইকোর্টের চিফ জাষ্টিস পদলাভ করিয়া, শেষে আপন দক্ষতার সহিত সুবিচারপূর্ব্বক "স্যার" উপাধিতে ভূষিত হইয়া বাঙ্গালীমাত্রেরই মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। এইরূপে পর পর অদ্যাপি এখানে যত গভর্ণর জেনারেল আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই কলিকাতার কিছু না কিছু শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন।

নগরটীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গতিপন্ন গ্রামবাসীদিগের ধারণা জন্মিল যে, চোর ডাকাতগণের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবার কলিকাতাই উপযুক্ত স্থান; কেননা এখানে যেরূপ শান্তি রক্ষা হইতেছে, এরূপ আর কোথাও নাই। সুতরাং ধনী পল্লীবাসীরা দলে দলে সপরিবারে আপন আপন গ্রাম হইতে এখানে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার ফলে কলিকাতাবাসী জমীদারগণের অর্থের স্বচ্ছল হওয়ায়, তাঁহারাও পুরাতন গৃহগুলির সংস্কার করিতে মনস্থ করিলেন।

বেশী দিনের কথা বলিতে চাহি না, গত দশ বৎসরের মধ্যে এ সহরের যেরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতে বলিতে পারা যায়—পূর্ব্বে যে সকল পল্লীবাসী কলিকাতায় আসিয়া তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনের বাসাবাটীতে অবস্থান করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানকালে ঐ সকল

ব্যক্তিকে কলিকাতায় পুনরাগমন করিয়া তাঁহাদের বাসাবাটীর সন্ধান করিতে হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে গোলক-ধাঁধাঁয় পতিত হইতে হয়। ইহার কারণ এই যে, কি চিৎপুর রোড, কি মেছুয়াবাজার, কি বড়বাজার, কি ক্লাইব ষ্ট্রীট, কি ষ্ট্রাণ্ড রোড, কি চৌরঙ্গী রোড, প্রভৃতি স্থান, যে দিকেই দৃষ্টিপাত হয়, সেই দিকেই নূতন নূতন অট্টালিকা সকল স্থাপিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় এবং অপ্রশস্ত পথগুলি যেরূপ নবকলেবরে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে, তাহাতে যে ঐ সকল প্রাচীন ব্যক্তির ধাঁধাঁ লাগিবে, ইহা আর বিচিত্র কি ?

১৯০১ খৃঃ বিদেশ হইতে সমাগত লোকদিগের সংখ্যা এখানে যত ছিল, ১৯১১ খৃঃ সেনসস্ দৃষ্টে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তদাপেক্ষা এক্ষণে এ সহরে ৮২ হাজার ২০৯ জন অধিক হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৬৯ হাজার ৫২৩ জন পুরুষ। বলাই বাহুল্য যে বিদেশ হইতে যেরূপ বহু লোক আসিয়া থাকেন, সেইরূপ আবার এখানে জন্ম গ্রহণ করিয়াও বহু লোক বাহিরে চলিয়া যান। এই আমদানী ও রপ্তানী উভয়ের হিবাব দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, ১৯০১ খৃঃ অপেক্ষা ১৯১১ খৃঃ মোটের উপর ৩০ হাজার ৩৮১ জনের বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আলোচ্য দশ বৎসরে কলিকাতার লোকসংখ্যা শতকরা ৫·৭ হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু সহরতলীর লোকসংখ্যা শত করা ৪·৫৩ হিসাবে বাড়িয়াছে। ইহার মধ্যে মাণিকতলাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে, অর্থাৎ শতকরা ৬৬ জন হিসাবে বৃদ্ধি হইয়াছে। গার্ডেন রিচে শতকরা ৬৬ এবং কাশীপুর-চিৎপুর শত করা ১৮২ হিসাবে বাড়িয়াছে। পল্লীগ্রাম হইতে বহু লোক কলিকাতায় আসিয়া মাণিকতলা ও কাশীপুর অঞ্চলে বাস করিয়া থাকেন বলিয়াই এই সকল বিভাগে লোক সংখ্যার বৃদ্ধি এরূপ দ্রুত হইয়াছে।

গত দশ বৎসর কলিকাতার লোক শত করা ২৪ জন হিসাবে বাড়িয়াছিল, কিন্তু উহার পরবর্ত্তী দশ বৎসরে শত করা ৫'৭ হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ ইহার কারণ স্থির করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে সহরতলীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল, তজ্জন্য বিদেশীয়গণ কলিকাতায় আসিয়া ঐ সকল অঞ্চলে বাস করিতে চাহিতেন না। কিন্তু বিগত দশ বৎসর হইতে ইহাতে পাকা ড্রেণ, জলের কল প্রভৃতি সংযোগে উন্নতি হইয়াছে বলিয়া এ সকল অঞ্চলের জল বাতাস, জনতাপূর্ণ সহর অপেক্ষা ভাল হইয়াছে। বিশেষতঃ সহরতলী অর্থাৎ কাশীপুর চিৎপুর, মাণিকতলা, আলিপুর, টালিগঞ্জ, বেহালা ও হাওড়া হইতে কলিকাতায় যাতায়াতের জন্য স্থলপথে যেরূপ নূতন নূতন ট্রামপথের সৃষ্টি হইয়াছে, সেইরূপ আবার জলপথেও গঙ্গার উভয়তীরের অধিবাসীদিগের গমনাগমনের সুবিধার্থে খেয়া ষ্টীমার বহুবার যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে। অধিকন্তু তথায় বাস করা সহর অপেক্ষা অল্প ব্যয় সাধ্য, সুতরাং অনেকেই কলিকাতা সহরের মধ্যে বাস করা অপেক্ষা ঐ সকল বিভাগে বাস করিবার পক্ষপাতী হইয়াছেন। ১৯০১ খৃঃ সহরতলীতে যত বস্তি ছিল, এক্ষণে তাহা অপেক্ষা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এদিকে কলিকাতার মধ্যভাগে বস্তির সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস করিবার চেষ্টা হইতেছে, এই সকল কারণে সহর অপেক্ষা সহরতলীতে অপেক্ষাকৃত দ্রুতবেগে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

কালীঘাটের আদি বৃত্তান্ত—এক কাপালিক এই কালীক্ষেত্রের অরণ্যের কোন এক স্থানে বাস করিতেন। একদা সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় যে, "তোমার বাসস্থানের সন্নিকটে তোমারই ইষ্টদেবী বিরাজ করিতেছেন, তথায় গমন করিলেই তুমি তাঁহার দর্শন পাইবে, ইহার ফলে তোমার বহুদিনের আশা পূর্ণ হইবে।"

'পরদিবস প্রত্যূষে কাপালিক স্বপ্নাদেশ মত হিংস্রক জন্তু পরিপূর্ণ সেই বিজন অরণ্যের নানা স্থান পাতি পাতি অন্বেষণ করিয়াও সমস্ত দিনের মধ্যে দেবীর দর্শন প্রাপ্ত হইলেন না, তথাপি তিনি ঐ স্বপ্নের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া, অমাবস্যার তমসাচ্ছন্ন রজনীতে সেই নিবিড় বনে উপবিষ্ট হইয়া, তাঁহারই উদ্দেশে স্তব স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন। কেন না, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস সাধুদিগের স্বপ্ন কখনও মিথ্যা হইবার নয়, পাপ হৃদয়ের স্বপ্নই অলীক হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, যে অরণ্যে দিবাভাগে মনুষ্যগণ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া দলবদ্ধ হইয়াও প্রবেশ করিতে শঙ্কা বোধ করিত, আজ সেই ভয়ঙ্কর স্থানে এই কাপালিক ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে নিরস্ত্র হইয়া, তাঁহার ইষ্টদেবীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে সমস্ত দিনের পর অর্দ্ধ রজনীতে সাধুর নিদ্রাকর্ষণ হইলে, পুনর্ব্বার তাঁহার প্রতি আর একটী স্বপ্নাদেশ হইল, "হে ভক্ত! তোমার অচলা ভক্তিতে আমি মুগ্ধ হইয়াছি, তোমার তপস্যা স্থানের অদূরে আমি এক খণ্ড শিলারূপে অবস্থান করিতেছি, তথায় উপস্থিত হইলেই আমার দর্শন পাইবে।" এবার স্বপ্নে তিনি এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং প্রেমে পুলকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বনের নানা স্থানে অন্বেষণ করিতে করিতে একস্থানে এক খণ্ড শিলার চতুষ্পার্শে অদ্ভুত জ্যোতিঃ বহির্গত হইয়া ঐ স্থানটী আলোকিত করিয়া রহিয়াছে দর্শন করিলেন, তখন তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। বলা বাহুল্য, সেই দণ্ডেই তিনি ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক ইষ্টদেবীর উদ্দেশে পূজার্চ্চনা তপ, জপ, হোম প্রভৃতি করিতে আরম্ভ করিলেন। পূজা সমাপনান্তে তিনি দেখিলেন যে, এই জঙ্গলাবৃত অরণ্যের মধ্যভাগ দিয়া পুণ্য সলিলা ভাগীরথী কুলু কুলু শব্দে সাগরাভিমুখে প্রবাহিতা হইতেছেন। বণিক্‌গণ

পূর্ব্বে বাণিজ্য উপলক্ষে সতত এই স্রোতস্বিনী ভাগীরথীর উপর দিয়া নৌকাযোগে আপনাপন গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিতেন।

একদা এক বণিক্ বাণিজ্য যাত্রা উপলক্ষে এই স্থান অতিক্রম করিবার সময় সহসা শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ করিলেন। এই জঙ্গলাবৃত নির্জ্জন স্থানে এরূপ পূজার্চ্চনার শব্দ এবং মাঙ্গলিক চিহ্ন সকল শুনিবামাত্র তিনি চমৎকৃত হইলেন, সুতরাং ইহার কারণ নির্ণয় হেতু তাঁহার অধীনস্থ লোকদিগকে বাণিজ্যপোত খানি তথায় স্থগিত করিতে অনুমতি করিলেন, অধিকন্তু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, আমি বহুবার এই স্থান দিয়া গমনাগমন করিয়াছি—কিন্তু কখনও এখানে এইরূপ সৎগন্ধ বা শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ করি নাই। তিনি নানা প্রকার চিন্তা করিয়া ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব সংগ্রহের জন্য সেই রজনী তথায় অবস্থান করিতে মনস্থ করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে সম্ভ্রান্ত বণিক্ সদলে এই অরণ্যের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক স্থানে এক সাধু পুরুষকে ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন দর্শন পাইলেন। বহুক্ষণ পর সেই মহাপুরুষের ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার নিকট সবিনয়পূর্ব্বক জ্ঞাতব্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সাধু বণিকের অচলা ভক্তি দেখিয়া অকপটচিত্তে পূর্ব্বাপর সকল বৃত্তান্তই তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন। তৎশ্রবণে মহাত্মা বণিক সেই দেব স্থানে এই মানত করিলেন যে, যদ্যপি এবার বাণিজ্যে আমার অধিক লাভ হয় এবং নিরাপদে বাটী প্রত্যাগমন করিতে পারি, তাহা হইলে আমি এই স্থানে দেবীর একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দিব। এইরূপ মানত করিয়া তিনি আপন গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিলেন। ক্রমে জনসমাজে এই ভাগীরথীতীরে বিষ্ণুচক্র বিচ্ছিন্ন সতীর পদাঙ্গুলী পতিত এবং কালী মূর্ত্তির আবির্ভাব বিষয় প্রকাশিত হইল। তদবধি বণিকগণ এখানে উপস্থিত হইবামাত্র এই দেবী

দর্শন এবং মনের অভিলাষ প্রার্থনাপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাত্রা করিতে লাগিলেন। কালক্রমে পূর্ব্ব পরিচিত বণিক মায়ের কৃপায় ব্যবসায়ে লাভবান এবং নির্ব্বিঘ্নে স্বীয় বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে উক্ত বণিক এখানে এই জঙ্গলাবৃত স্থানে একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করাইয়া দেবী স্থানে তাঁহার পূর্ব্ব অঙ্গীকার পালন করিলেন, এবং তন্মধ্যে সেই সাধু মহাপুরুষের অনুরোধে ঐ জ্যোতির্ম্ময় প্রস্তর খণ্ডখানি স্থাপনপূর্ব্বক উপর্য্যুপরি প্রস্তরখণ্ড গাঁথাইয়া তদোপরি অন্য একখানি প্রস্তরে নাসিকা, আর স্বর্ণের দ্বারা চক্ষুদ্বয় অঙ্কিত করাইলেন, তৎপরে জিহ্বা, অসি, মুকুট, হস্ত চতুষ্টয় ইহাতে সংযোজিত করিয়া মায়ের মনমোহিনী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া আপন কীর্ত্তি স্থাপিত করিলেন।

বণিক নির্ম্মিত এই কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে পর, স্থানীয় জমিদার বড়িয়ার সাবর্ণ চৌধুরীদিগের উপর ঐ সাধুর অনুরোধে দেবীর পূজার ভারার্পণ হইল। তখন মায়ের কোন কিছুই আয় না থাকায় চৌধুরী মহাশয়েরা বিরক্ত হইয়া তাঁহাদেরই কুলপুরোহিত হালদারদিগকে মায়ের সমস্ত স্বত্ব দান করিলেন।

হালদিগের ভাগ্যক্রমে ক্রমশঃ ভক্তদিগের শুভাগমনে মায়ের যথেষ্ট আয় হইয়াছে, এমন কি প্রতিদিন হাজার হাজার লোক এই তীর্থ হইতে দেবীর কৃপায় প্রতিপালিত হইতেছেন। কালক্রমে হালদারদিগের পুষ্যি বৃদ্ধি হওয়াতে দেবী এক্ষণে সাধারণের ভাগে পড়িয়াছেন। এ তীর্থে ধনী ভক্তগণ আসিয়া দেবীর উদ্দেশে যে পূজা প্রদান করেন, পূজারী হালদারদিগের মধ্যে যাঁহার পালা থাকে, তিনিই ঐ পূজার দ্রব্য-সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কোন ভক্ত মানত করিয়া স্বর্ণের হাত, কেহ মুণ্ডমালা, কেহ বা স্বর্ণের মুকুট প্রভৃতি মানতপূর্ব্বক দান করিয়া থাকেন, ইহারই ফলে দেবীর আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। বলাবাহুল্য,

এই দেবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই ক্রমে ক্রমে ভক্তসমাগম বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তখন ভাগীরথীর তীর হইতে জঙ্গলের মধ্যপথ দিয়া দেবী স্থানে গমনাগমন পক্ষে ভক্তগণের অত্যন্ত অসুবিধা হয় দর্শনে, উক্ত বণিক কৃপাপূর্ব্বক ভাগীরথীতীরে একটী ঘাট বাঁধাইয়া, তথা হইতে পীঠ স্থানের মন্দিরে যাতায়াতের নিমিত্ত জঙ্গল কাটাইলেন এবং একটী প্রশস্ত পথ নির্ম্মাণ করাইয়া সাধারণের বিশেষ উপকার করিলেন। তৎসঙ্গে নিজে কত পুণ্যসঞ্চয় করিলেন,তাহার ইয়ত্তা নাই। যে ঘাটটী বণিক প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন, ঐ ঘাটের নামানুসারে এ তীর্থ টী কালীঘাট নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে পর এই প্রাচীন কালিকাদেবীর মন্দিরটী বেমেরামতি অবস্থায় ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তদ্দর্শনে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ দেওয়ান কাশীনাথ দাসের বংশধরেরা উহা স্থানান্তরিত করিয়া ১২৯২ সালে বর্ত্তমান মন্দিরটী নবকলেবরে প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক পূর্ব্বপুরুষদিগের মান বজায় রাখিয়াছেন।

হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন যে, মগরার যুক্ত ত্রিবেণী হইতে মধ্য-ভাগে গঙ্গা, পশ্চিমে সরস্বতী, পূর্ব্বে যমুনা স্বতন্ত্রভাবে স্রোতস্বতী হইয়া আধুনিক কলিকাতার উইলিয়ম ফোর্ট নামক দুর্গ স্থানের নিকট ঘুরিয়া বণিক নির্ম্মিত এই ঘাট স্থানের সম্মুখ দিয়া প্রবাহিতা হইয়া ক্রমে সাগরাভিমুখে পতিতা হইয়াছেন। এই কারণে এই স্থানের স্রোতস্বিনী গঙ্গা বা নদীকে সাধারণে আদিগঙ্গা নামে অভিহিত করেন। পাঠক-বর্গের প্রীতির নিমিত্ত আধুনিক এই কালীঘাট হইতে পীঠ স্থানের মন্দির পর্য্যন্ত একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল।

কালিকাদেবীর মন্দির এবং চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান যাহা পুরীর অন্তর্গত, উহার পরিমাণ প্রায় দেড় বিঘা হইবে। এই নবপ্রতিষ্ঠিত মন্দিরটী জম

হইতে অতি কম পঞ্চাশ হস্ত পরিমাণ উচ্চ। মন্দিরের সম্মুখ ভাগেই নাটমন্দির সংস্থাপিত আছে। ঐ নাটমন্দিরের উপর কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয় ভক্তমাত্রেই দেবীর উদ্দেশে তপ, জপ, হোম প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি সম্পাদন করিয়া থাকেন। যে সকল ভক্ত এই দেবী স্থানে কোনরূপ মানত করেন, তাঁহারা এই নাটমন্দিরের উপরিভাগে বসিয়া আপনাপন মানসিক ক্রিয়া—ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত বা আচার্য্য দ্বারা উদযাপান করাইয়া থাকেন। প্রত্যেক ভক্তকে এই মানসিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবার জন্য মায়ের নামে এখানে যে গদি আছে, উহাতে স্বতন্ত্র খাজনা জমা দিতে হয়।

নাটমন্দিরের দক্ষিণাংশের নিম্নদেশটী দেবীর উদ্দেশে ছাগ ও মহিষাদি যথানিয়মে বলি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। দুর্গোৎসবের সময় এই নির্দ্দিষ্ট স্থানে যে কত বলিদান হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। এ তীর্থে প্রত্যহই যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে, কিন্তু শনি ও মঙ্গলবার এবং অমাবস্যার দিন আর দুর্গোৎসব ও পৌষ মাসে যাত্রীদিগের অধিক সমাগম হইয়া থাকে।

নকুলেশ্বরদেব

এই পীঠ স্থানের অনতিদূরে মন্দিরের ঈশানকোণে শ্রীশ্রীনকুলেশ্বর মহাদেবের পূজার্চ্চনা করিতে যাইতে হয়। পথিমধ্যে দুই পার্শ্বেই কত অন্ধ, খঞ্জ, গরীব, দুঃখী লোকদিগকে ভিক্ষা করিতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সকল ভিক্ষুকদিগকে কেহ কখন দান দিয়া সন্তুষ্ট করিতে পারেন না। এই নিমিত্ত সাধারণে অনেকের ব্যবহারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহাদিগকে "কালীঘাটের কাঙ্গালী" বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।

যাত্রীগণ এ তীর্থের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র স্থানীয় পূজারী পাণ্ডা-দিগের নিযুক্ত লোক সকল তাঁহাদিগকে বিশ্রাম স্থান দিবার নিমিত্ত ব্যস্ত করিতে থাকেন। এখানে প্রত্যেক বাসার অধিকারীর একটী করিয়া দেবীর পূজা দিবার ডালার নিমিত্ত—ডাব,চিনি,ফুল ও সন্দেশের দোকান আছে দেখিতে পাওয়া যায়। যাত্রাগণ ইচ্ছানুযায়ী প্রথমে এখানে পাণ্ডা ঠিক করিয়া লইয়া থাকেন, তৎপরে তাঁহার নিকট হইতে যথানিয়মে সাধ্যমত দেবীর পূজা দিবার জন্য ডালা প্রভৃতি খরিদ করিয়া পাঠাইয়া থাকেন। এ তীর্থে বাসা ভাড়া বা পূজা দিবার কোন বাঁধা নিয়ম নাই। যাত্রীর সমাগম অনুসারে বাসা ভাড়ার কম বেশ হইয়া থাকে, তবে যিনি যে বাসায় আশ্রয় লইবেন, তাঁহাকে সেই বাসার অধিকারীর দোকান হইতে পূজার ডালাখানি খরিদ করিতে হয়। ইহাই নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। কালীঘাটে—সময় সময় দুই-একটী এমন সাধু সন্ন্যাসীকে অবস্থান করিতে দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহাদের ব্যবহার দর্শনে নাস্তিকেরও প্রাণে ভক্তির উদয় হইয়া থাকে।

এই পীঠ স্থান ও নকুলেশ্বর মহাদেব ব্যতীত এখানে শেঠদিগের সোণার কার্ত্তিকের দেবালয় এবং শ্মশানভূমি এই দুইটী দর্শনীয় স্থান আছে, অতএব ভক্তগণ এ তীর্থে উপস্থিত হইলে উপরোক্ত স্থানগুলি কর্ত্তব্যবোধে দর্শন করিবেন।
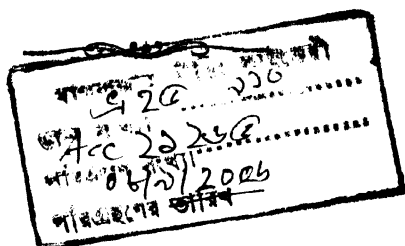
শ্রীশ্রীতারকেশ্বরদেব দর্শন যাত্রা

হাওড়া হইতে তারকেশ্বর ৩৬ মাইল দূরে অবস্থিত। ই, আই, রেলযোগে সেওড়াপুলী, তথা হইতে তারকেশ্বর লাইনের শেষ ষ্টেশন হইতে ভগবান তারকেশ্বরদেবকে দর্শন করিতে যাইতে হয়। ষ্টেশন হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল কাঁচা রাস্তা পদব্রজে গমন করিলে পর শ্রীমন্দিরের পাদদেশে পৌছান যায়। তারকেশ্বর হিন্দুদিগের একটী প্রাচীন ও বিখ্যাত পূজনীয় স্থান।

ভগবান তারকেশ্বরদেবের ষ্টেটের বিষয়-সম্পত্তি রক্ষিত ও পরিচালিত করিবার জন্য একজন মোহান্ত বর্ত্তমান আছেন। হিন্দু দেবমন্দিরের অধ্যক্ষই মোহান্ত নামে খ্যাত। প্রকৃতপক্ষে তিনিই এই সমস্ত বিষয়ের মালিক। নানাপ্রকার উপায়ে ও ভগবানের ষ্টেটের আয় হইতে এই দেবের অতুল সম্পত্তি হইয়াছে, এবং ইহারই সাহায্যে তিনি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট হইতে "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কাহারও উৎকট পীড়া হইলে, কাহারও পুত্র না হইলে, কাহারও বা পুত্র ভূমিষ্ট হইয়া নষ্ট হইলে অসংখ্য নরনারী ভগবান্ তারকেশ্বর

মহাদেবের নিকট হত্যা দিয়া সাধ্যমত মানত করিয়া থাকেন। ভক্তাধীন ভগবান তারকেশ্বরদেব যথাসময়ে ভক্তদিগের মনোরথ পুরণ করিলে পর, ঐ সকল লোক সন্তুষ্টচিত্তে দেব স্থানে তাঁহাদের মানতের পূজা দিয়া আপনাপন অঙ্গীকার পালন করেন। এইরূপে ভগবান তারকেশ্বরদেবের অতুল সম্পত্তি হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন দেবতার ষ্টেটের যে সমস্ত জমিদারীর আয় আছে, তাহা হইতেও বিস্তর খাজনা আদায় হইয়া থাকে। মন্দিরের আশে-পাশে যে সকল পূজারীদিগের ডালার দোকান বর্ত্তমান আছে,ঐ সকল দোকানের অধিকারী ব্রাহ্মণদিগের প্রত্যেকেরই অধীনে যাত্রীদিগের বিশ্রামের নিমিত্ত বাসাবাটী আছে, তন্নিমিত্ত উহাদিগকে মোহান্ত মহারাজকে উচ্চ হারে খাজনা দিতে হয়।

মোহান্ত মহারাজ স্বয়ং কোন কিছু বিষয় কর্ম্ম দেখিবার অবসর পান না, তিনি কেবল ভগবানের পূজার, যাহাতে কোনরূপ ত্রুটি না হয়, তাহারই উপর বিশেষ লক্ষ্য করিয়া থাকেন। মোহান্ত মহারাজের অধীনে যে দেওয়ান আছেন, তিনিই বিষয় কর্ম্ম সমস্ত পরিচালনা করিয়া থাকেন। দেব স্থানে দুইটী প্রকাণ্ড হস্তী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ এইরূপ—ভগবান্ তারকেশ্বর ঐ হস্তীগুলির পৃষ্ঠে আরোহণ-পূর্ব্বক রাত্রিযোগে সমস্ত নগরটী পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। এখানে বেলপুকুর নামে যে সুবৃহৎ বাঁধান পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়, চৈত্র মাসে তারকেশ্বর মহাদেবের যাবতীয় সন্ন্যাসীগণ যথাসময়ে যথানিয়মে ইহার তীরে একত্র হইয়া ঝাঁপ খান। যাত্রীগণ এখানে উপস্থিত হইলে প্রথমে এই পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া শুদ্ধকলেবরে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মন্দিরের সম্মুখেই নাটমন্দির, ভক্তগণ ঐ নাটমন্দিরে যথানিয়মে একচিত্তে ভগবানের শ্রীচরণ ধ্যান-পূর্ব্বক মানত করিয়া হত্যা দিয়া থাকেন। এই জাগ্রত দেব স্থানে সদা-

সর্ব্বদা উৎকট রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা তাহাদের কোন্ পাপে ঐ রোগ উৎপন্ন হইয়াছে এবং কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে উহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তাহা জানিবার জন্যই হন্না দিয়া থাকেন।

এখানকার এই পবিত্র স্থানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে ভক্তগণ পথি-মধ্যে "জয় ভগবান তারকেশ্বর কী জয়", "জয় হরপার্ব্বতী কী জয়"। শব্দে নগর কম্পান্বিত করিতে থাকেন, ইহাতে যাত্রীগণের আগমনবার্ত্তা জানিতে পারিয়া স্থানীয় ভিক্ষুকগণ চতুর্দ্দিক হইতে একত্রিত হয় এবং তাঁহাদিগকে বেষ্টনপূর্ব্বক ভগবানের মাহাত্ম্য প্রকাশ করতঃ ভক্তগণের অন্তঃকরণে ভক্তিরসের বীজ বপন করিতে থাকে, আরও আপনাপন জীবিকা নির্ব্বাহের সংস্থান করিয়া লইয়া থাকে। অধিকাংশ ভিক্ষুক-গণ খঞ্জনী বা এক তারার সাহায্যে নিম্নলিখিত দেব মাহাত্ম্যটী সুমধুর-স্বরে গান করিয়া থাকে ;—

শুন শুন ভক্তগণ হয়ে এক মন।
অপূর্ব্ব বাবার কথা করহ শ্রবণ ॥
বন্দিব জলার মধ্যে ক্ষেপা পশুপতি।
চারিদিকে উলু খাগড়া বেণার বসতি ॥
কৃষক কাটয়ে ধান্য, রাখালে কুড়ায়।
আনন্দে শম্ভুর শিরে ধান্য ভেনে খায় ॥
এইরূপে গেল দিন দ্বাদশ বৎসর।
মহা গর্ত্ত হৈল, হরের মস্তক উপর ॥
মাথার ব্যথায় শম্ভু হইয়ে কাতর।
কহিলেন মুকুন্দ ঘোষে আমি তারকেশ্বর ॥
তারকনাথ শিব আমি কাননে বসতি।
অবনী ভেদিয়ে বাছা আমার উৎপত্তি ॥

তারকেশ্বরে শিবরূপ কানন নিবাসী।
মোর পূজা কর ভক্ত হইয়া সন্ন্যাসী॥
কপিলা দিতেছে দুগ্ধ এক চিত্ত হয়ে।
দেখিলেন মুকুন্দ ঘোষ কাননে আসিয়ে॥
কপিলার দুগ্ধে তুষ্ট, ভোলা মহেশ্বর।
মৃত্তিকা খুঁড়িয়া দেখে অপূর্ব্ব পাথর॥
কেহ খোঁড়ে হস্তে, কেহ খোঁড়ে দিয়া বাড়ী।
পাথর দেখিয়া বলে হৈল ছেয়া গাড়ী॥
জটাধারী ত্রিপুরারী দেখিয়ে নিজে রড়ে।
রাজা বলে লয়ে রাখি রামনগরের গড়ে॥
শত কোড়া নিয়োজিল, কাটিবারে মাটি।
যত খোঁড়ে শম্ভু বাড়েন, যেন পুষ্করিণীর জাটি॥
খুঁড়িতে খুঁড়িতে শম্ভুর অন্ত নাহি পায়।
যত খোঁড়ে শম্ভু তত পাতাল দিকে ধায়॥
ভক্ত-দুঃখ পায়, শম্ভু জানিয়ে অন্তরে।
বসিলেন নিশি শেষে রাজার শিয়রে॥
সন্ন্যাসী হইয়া মূর্ত্তি কহেন তখন।
শুন রাজা ভারামাত্র আমার বচন॥
অকারণে দুঃখ পেয়ে মোরে কেন খোঁড়।
গয়া গঙ্গা বারাণসী আদি মোর জড়॥
শুনিয়া নৃপতি হইলা আনন্দে অস্থির।
জঙ্গল কাটায়ে দিল, এক অপূর্ব্ব মন্দির।
আম জাম রুহিলেন গোয়া নারিকেল।
ডানভাগে সরোবর সিদ্ধিমাখা জল॥

পাথরে বান্ধিয়া দিলেন মরীচির গড়া।
জলেতে কুম্ভীর ভাসে, ডাকে কড়া কড়া॥
নীল দিনে সরোবর গঙ্গার জোয়ার।
পাতকী তারিতে ভবে হৈলা অবতার॥
মধ্যিখানে তারকনাথ চারিদিকে জল।
ভক্তগণ দিবে পূজা কালাফুলে মালা॥
বালিগড়ি পশ্চিমেতে বিরাজে বিশ্রাম।
পাতকী তরাতে প্রভু তারকেশ্বর নাম॥
মনে হয় মৃত্যুঞ্জয় একচল্লিশ সালে।
বৃষধ্বজে পূজিলেন শ্রীফলের মূলে॥ ইত্যাদি।

বর্ত্তমানকালে যে স্থানে ভগবান তারকেশ্বরের মন্দিরটী বিরাজমান, পূর্ব্বে ঐ স্থানটী সিংহল দ্বীপ নামে কথিত ছিল। পুরাকালে ভোলা মহেশ্বর এই স্থানের জঙ্গলের মধ্যে এক প্রস্তর মূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেন। স্থানীয় গোপবালারা তাঁহাকে সামান্য প্রস্তরবোধে ভগবানের মস্তকের উপর ধান ভাঙ্গিয়া চাউল প্রস্তুত করিত, এই কারণে অদ্যাপি এই দেবের মস্তকে একটী গহ্বর দেখিতে পাওয়া যায়।

মুকুন্দ ঘোষ নামে কোন এক গোপ এখানে বাস করিত, সে আপন জাতীয় ব্যবসার দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। যতগুলি গাভী তাহার বাটীতে বর্ত্তমান ছিল, তন্মধ্যে একটী সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা গাভী নিত্য প্রাতে ঐ জঙ্গলের মধ্যে যাইয়া হৃষ্টচিত্তে ভগবানকে দুগ্ধ খাওয়াইয়া আপন গোয়াল ঘরে প্রত্যাগমন করিত। এদিকে ঘোষজা ঐ গাভীর দুগ্ধ না পাওয়াতে নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া অবশেষে ইহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। একদা প্রত্যুষে মুকুন্দ ঘোষ বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে, এমন সময় ঐ গাভীটী বাটী হইতে বাহির হইয়া

বরাবর এক জঙ্গল মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ভগবানকে দুগ্ধদানে তুষ্ট করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। বলাবাহুল্য,ঘোষজাও সেই সময় ঐ গাভীর পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শনপূর্ব্বক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ইহার নিগূঢ় রহস্য জানিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইল। তখন ভগবান্ তারকেশ্বর আপন লীলা প্রকাশ ছলে মুকুন্দের প্রতি সদয় হইয়া তাহাকে দর্শনদানে আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন, অধিকন্তু তাহাকে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহারই সেবা করিতে উপদেশ দান করিলেন।

মুকুন্দ ভগবানের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া জীবনের শেষাংশ সন্ন্যাসী হইয়া তাঁহারই সেবায় নিযুক্ত হইলেন। মায়াময়ের লীলা নরে কিরূপে ভেদ করিবে—একদিকে মুকুন্দ ঘোষকে সন্ন্যাসী করিলেন, অপরদিকে বর্দ্ধমানের মহারাজকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া আপন আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন।

বর্দ্ধমানাধিপতি অত্যন্ত ধার্ম্মিক ও পুণ্যাত্মা ছিলেন, তিনি স্বপ্নাদেশ অনুসারে যথা সময়ে সদলে এই জঙ্গলাবৃত স্থানে উপস্থিত হইয়া এক স্থানে এক লিঙ্গের সন্ধান পাইলেন। তখন ঐ লিঙ্গ মূর্ত্তি নিজালয়ে স্থাপন করিবার অভিলাষে অধীনস্থ লোকদিগকে মৃত্তিকা খনন করিতে আদেশ করিলেন। আজ্ঞাপ্রাপ্তে মজুরগণ দিবা রাত্র প্রাণপণে মৃত্তিকা খুঁড়িয়াও তাঁহার অন্ত পাইল না,এমন সময় মুকুন্দ ঘোষের নিকট তিনি জানিতে পারিলেন যে,এই দেব এক "অনাদিলিঙ্গ", ইঁহার অন্ত পাওয়া দুর্লভ। সুতরাং তিনি মুকুন্দ সন্ন্যাসীর উপদেশ মত এই স্থানে দেবতার একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন এবং দেবসেবার নিমিত্ত সন্ন্যাসীর নিকট এরূপ বিষয়াদি দান করিলেন, যদ্দ্বারা তাঁহার সেবা নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পারে।

মুকুন্দ ঘোষ দেবসেবায় রত হইলে ভগবান্ তারকেশ্বরের আদেশ মত তিনি প্রচার করিলেন যে, যাহার উৎকট পীড়া হইয়াছে, যে সকল রোগী চিকিৎসায় হতাশ হইয়াছেন, যিনি অপুত্রক, যাহার যাগযজ্ঞে কোনও ফলোদয় হয় নাই, এই প্রকার লোক সকল ভগবান্ তারকেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করুন। মুকুন্দ সন্ন্যাসী প্রমুখাৎ এইরূপ আশ্বাস-বাণী শুনিয়া অসংখ্য রোগক্লিষ্ট নরনারী কাতারে কাতারে ব্যাধির যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশে তারকেশ্বরের শরণাপন্ন হইতে লাগিলেন, এবং এই জাগ্রত দেবতার কৃপায় তাহারা সকলেই আসন্ন বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিতে লাগিলেন। ভারতের ঘরে ঘরে এই সুসমাচার প্রচারিত হইলে পর ক্রমে ভক্তগণের সমাগম বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এইরূপে যে সকল ভক্ত তথায় আশ্রয় লন, তাহারা সাধ্যমত মানতপূর্ব্বক দেব স্থানে হত্যা দিতে থাকেন এবং মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইলে আপনাপন মানসিক পূজা দিতে থাকায় ক্রমশঃ এই দেবের অতুল ঐশ্বর্য্য হইয়াছে।

কালের গতি কে রোধ করিতে পারে? যথাসময়ে পরম বৈষ্ণব মুকুন্দ ঘোষ দেহ রাখিলে ঐ শূন্য স্থানে এক মোহান্ত পদের সৃষ্টি হইল, মোহান্ত পদ অতি কঠিন ব্যাপার। কারণ পিতা, মাতা বিষয়-সম্পত্তি সমস্তই জলাঞ্জলি দিয়া ব্রহ্মচারী ব্রত অবলম্বন করিতে হয়। এইরূপ আবার কোন স্থানের কোন মোহান্তের মৃত্যু ঘটিলে যিনি তাঁহার প্রধান চেলা থাকেন, তিনিই ঐ শূন্যপদে অধিষ্ঠিত হন। কোন নূতন ব্যক্তি মোহান্ত পদের গদী প্রাপ্তির দিন অন্য স্থানের বিখ্যাত দশ-জন উপাধিধারী মোহান্তেরা তথায় একত্রিত হইয়া বিচারপূর্ব্বক যাহাকে প্রধান চেলা হইবার যোগ্য সাব্যস্ত করেন, তিনিই ঐ শূন্য পদে অভিষিক্ত হন। ইহার ফলে পরে আর কোনরূপ গোলযোগ হই-

বার সম্ভাবনা থাকে না। নচেৎ তাঁহার চেলাদিগের মধ্যে সকলেই প্রধান চেলা স্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়া গোলযোগ উপস্থিত করিতে পারেন। এই সকল মোহান্তদিগের আবার নানাপ্রকার উপাধি আছে, যথা ;—কেহ ভারতী, কেহ গিরি ইত্যাদি। প্রমাণস্বরূপ দেখুন, তারকেশ্বরের মোহান্তের উপাধি গিরি, আর ইহার সন্নিকটেই বৈদ্য-বাটীস্থ কালীবাটীর মোহান্তের উপাধি ভারতী।

বর্ত্তমানকালে এখানকার শ্রীমন্দিরের পার্শ্বে যে একটী সমাজ দেখিতে পাওয়া যায়, কথিত আছে—ঐ সমাজটীই মুকুন্দ সন্ন্যাসীর। স্থানীয় পূজারীদিগের নিকট উপদেশ পাইলাম, কোন যাত্রী এ তীর্থে উপস্থিত হইয়া যদি তিনি পরম বৈষ্ণব স্বর্গীয় মুকুন্দ সন্ন্যাসীর সমাজের উপর দুগ্ধ ও গঙ্গাজল প্রদানপূর্ব্বক ভক্তি প্রদর্শন না করেন,তাহা হইলে তারকেশ্বরদেব তাহার প্রদত্ত কোন পূজাই গ্রহণ করেন না। এই নিমিত্ত ভক্তগণ এখানে আসিয়া পূজারীদিগের উপদেশানুসারে সর্ব্ব-প্রথমেই বৈষ্ণব চূড়ামণি মুকুন্দ সন্ন্যাসীর সমাজের উপর দুগ্ধ ও গঙ্গা-বারি প্রদান করিয়া থাকেন।

এখানে শিবগঙ্গা নামে যে হ্রদ আছে, তাহার পশ্চিমকোণে যে সুন্দর অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়, উহার মধ্যেই মোহান্ত মহারাজ বাস করিয়া থাকেন। এই বাস ভবনটীর মধ্যভাগ যেরূপভাবে সুসজ্জিত আছে, উহার শোভা দেখিলে কখনই ইহা মোহান্তের বাস ভবন বলিয়া অনুমান হয় না। কেন না মোহান্ত যে ব্রহ্মচারী মন্ত্রে দীক্ষিত।

তারকেশ্বরদেব—একটী অনাদি শিবলিঙ্গ। সকলেই তাঁহাকে আশুতোষ বলিয়া সম্বোধন করেন, কেন না এ দেব এত অল্পতে সন্তুষ্ট হন, অপর কোন দেবতা সেরূপ হন না। তারকেশ্বরের অপর নাম ভোলানাথ, কারণ তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া যে সকল কর্ম্ম করেন, উহা

তৎক্ষণাৎ ভুলিয়া যান। এই জাগ্রত দেবতার যিনি মোহান্ত, তিনি অনেকটা সেইরূপ আদান প্রদান অনুসরণ করিবার চেষ্টা করি থাকেন।

শ্রীমন্দিরের মধ্যস্থলে একটী গহ্বর আছে। ঐ গহ্বর মধ্যে ভগবা তারকেশ্বর পুরাকাল হইতে বিরাজ করিতেছেন। গহ্বরের উপরি ভাগটী রৌপ্য নির্ম্মিত একটী ঢেকের দ্বারা আবৃত থাকে, যদি কো ভক্ত এই দেবের পূজারী ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে পূজার দক্ষিণা ব্যতীত পৃথক ভাবে কিছু অর্থ প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি ঐ ভক্তকে গহ্বর মধ্যে হস্ত প্রবেশ করিতে দিয়া ভগবানের পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করিতে অধিকার দেন।

মোহান্ত মহারাজ প্রত্যহই যথানিয়মে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া তারকেশ্বরকে পূজার্চ্চনা করিয়া থাকেন। যে সময় তিনি মন্দির মধ্যে পূজার্চ্চনায় ব্যস্ত থাকেন, সে সময় অপর কোন যাত্রী ইহার ভিতর থাকিতে পান না। ইহার প্রধান কারণ স্থানীয় পূজারীদিগের নিকট উপদেশ পাইলাম যে, পূজার্চ্চনার পর মোহান্তের সহিত ভগবান্ তারকনাথের বিষয়াদি সম্বন্ধে অনেক গুপ্ত পরামর্শ হইয়া থাকে।

প্রত্যহ বেলা দেড় ঘটিকার সময় ভগবানের যথানিয়মে পায়স্ ভোগ হয়। এইরূপ আবার আড়াই ঘটিকার সময় চিরপ্রথানুসারে লুচি-মোণ্ডার ভোগ হইয়া থাকে, তৎপরে শৃঙ্গার বেশ হইয়া মন্দির দ্বার বন্ধ হয়। শৃঙ্গার বেশ অর্থাৎ দেবতার শ্রীঅঙ্গ চন্দন ও পুষ্পাদির দ্বারা সুশোভিত হইয়া ভক্তদিগকে দেখান হয়, তাহার পর সন্ধ্যা আরতি। এই সন্ধ্যা আরতির পর পূজা সমাপনান্তে রজনীকালে তারকেশ্বর-দেবকে গাঁজা মিশ্রিত সুগন্ধ তামাকু খাইবার অবসর দেওয়া হয়। এই তামাকু সেবন ব্যাপার—এক অদ্ভুত ঘটনা! কারণ মন্দিরদ্বার বন্ধ

রিয়া পূজারীগণ বাহিরে আসিবামাত্র গুড়গুড়িতে টানের শব্দ শুনা
। মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ ভক্তগণ এই শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পান।

এ তীর্থে সপ্তাহ মধ্যে প্রতি সোমবারে যাত্রীদিগের সমাগম অধিক
। চৈত্র মাসে গাজন উপলক্ষে এবং শিবচতুর্দ্দশীর রাত্রিতে ভক্ত-
ণর এত অধিক সমাগম হয় যে, তখন এখানে তিলার্দ্ধ স্থান থাকে
। চৈত্র মাসে কিম্বা শিবরাত্রির এই ভিরের সময়ও ভক্তগণ এখানে
৷ দিয়া থাকেন। এই সকল ভক্তদিগের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রীলোক-
াকে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই জনতাপূর্ণ রজনীতে অনেক কুচরিত্র
য এখানে উপস্থিত থাকে, তাহারা সুন্দরী যুবতী দেখিলেই সুবিধা
নানা বেশে নানা ছলে তাহাদিগকে ভুলাইয়া আপনাপন গন্তব্য
নে লইয়া যায়। এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, ঐ সকল পাষণ্ডেরা
রুয়া বসন পরিধানপূর্ব্বক সেই নিঃসহায়া অবলাদিগের নিকট মধুর
নে বলিয়া থাকে, তোমাদের অচলা ভক্তিতে ভগবান সন্তুষ্ট হইয়া-
ন এবং তোমাদের ভাগ্যও সুপ্রসন্ন হইয়াছে; সুতরাং আমি চেলা-
সহ তোমাদের নিকট আসিয়াছি, আমার সহিত আসিলে আবশ্যক
তোমাদের অভাব পূরণ হইবে। এইরূপ ছলনা করিয়া তাহা-
গকে ভুলাইয়া আয়ত্ত করে।

এ স্থলে মোহান্তই সর্ব্বেসর্ব্বা। বলাবাহুল্য, তাঁহার কৃপা ব্যতীত
খানে কেহ সুখে থাকিতে পারেন না। যে মোহান্ত ব্রহ্মচারী, যিনি
ক্ষাৎ তারকেশ্বরদেবের সহিত প্রয়োজনীয় বিষয়ের পরামর্শ করিয়া
কেন। সেই মোহান্তের এখানে ধনৈশ্বর্য্যই কালস্বরূপ হইয়াছে,
মাণস্বরূপ মাধবগিরির রাজত্বকালে এলোকেশীর বিষয় স্মরণ হইলে
দ্যাপি প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। এই সকল পাষণ্ডদিগের কথায়,
শ্বাস করিয়া একা এলোকেশীর ন্যায়, সময় মত কত আটির পর্য্যন্ত

ভাগ্য প্রসন্ন হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। ভোলা মহেশ্বর! তোমার পবিত্র স্থানে তোমার চেলারূপ ধরিয়া তোমারই ভক্তগণের উপর না জানি পাষণ্ডেরা কত অত্যাচার করিতেছে, আর তুমি কেবল গাঁজার দমে বিভোর হইয়া থাক, এই সকল উপদ্রব নিবারণের নিমিত্ত একবার কৃপা দৃষ্টি কর প্রভু!

বর্দ্ধমানের অধিপতিই এই দেবের মন্দির এবং দেবসেবার বন্দোবস্ত করিয়া আপন মহত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। এই নিমিত্ত সেই পবিত্র রাজবংশের বিষয় এথানে কিছু পরিচয় দিব।

ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রায় দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে আবুরাম ও বাবুরাম নামে পঞ্জাব প্রদেশস্থ দুইজন প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় মহাজন, বর্দ্ধমানে ব্যবসা করিতে আসেন। এই দুই সহোদরে মিলিত হইয়া বঙ্গদেশের নানা স্থানে বস্ত্রাদি বিক্রয় করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং কালক্রমে বর্দ্ধমানে প্রতিষ্ঠিত হন। বর্দ্ধমানের রাজারা উপরোক্ত এই দুই সহোদরের বংশধর। সম্পদ ও সম্ভ্রমে বর্দ্ধমানের রাজারা বাঙ্গলা দেশের সর্ব্বপ্রধান। পাণ্ডিত্য ও বীরত্বে এবং দয়া, দাক্ষিণ্য, দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি বরণীয় গুণপুঞ্জে যে সকল মহানুভব পুরুষ ও রমণীরত্ন এই বংশের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে মহারাজ প্রতাপচাঁদ রায় ও মহারাণী নারায়ণকুমারী এই দুইজনই সর্ব্বপ্রধান। মহারাজ প্রতাপচাঁদ রায়ই সর্ব্বপ্রথমেই ভারত গভর্ণর কর্ত্তৃক দেশীয় সভা নির্ব্বাচিত হন। মহাতাপ বাহাদুরের কীর্ত্তিপুঞ্জের মধ্যে গোলাপ-বাগ, মহাতাপ-মঞ্জিল নামে বিদ্যালয়, দেলখোস, ইংরাজি-বিদ্যালয়, দাতব্য-চিকিৎসালয়, মতি-ঝিল, মাত্রাশা প্রভৃতি এই কয়টীই উল্লেখযোগ্য। এই মহাত্মার অনুমত্যানুসারে এবং প্রভূত ব্যয়ে সংস্কৃত মহাভারত ও রামায়ণ আরও বহুবিধ হিন্দুশাস্ত্র বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত হইয়া সাধা-

রণকে বিনা মূল্যে বিতরণ করেন। এই মহাত্মার অসংখ্য কীর্ত্তি ও বদান্যতার বিষয় যাহা আছে, উহা লিখিয়া কত জানাইব।

কালক্রমে মহাতাপ বাহাদুরের মৃত্যু হইলে মহারাজ আফতাপচাঁদ বাহাদুরের রাজত্বকালে পবলিক লাইব্রেরী, রাজকলেজ, অন্নছত্র, ছাত্রাশ্রম এবং বহু সংখ্যক দেবালয় বর্দ্ধমানে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ছাব্বিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া যথাসময়ে পরলোক গমন করেন। তৎপরে রাজবংশের কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় মহারাজ বিজয়চাঁদ পোষ্য পুত্ররূপে গৃহীত হন। বর্ত্তমান মহারাজ বঙ্গদেশের লেপ্টনাণ্ট গভর্ণর বাহাদুরের সুযোগ্য সদস্য লালা বনবিহারী কপূর বাহাদুরের পুত্র। ইনিও পূর্ব্ব পুরুষদিগের ন্যায় দয়া ও দাক্ষিণ্যাদিগুণে ভূষিত। গোঁসাইগ্রামে তাঁহার জন্ম হয়, তীক্ষ্ণদর্শী এবং রাজকার্য্যে তিনি অতিশয় পটু, বাঙ্গলা সাহিত্যে ইনি বিশেষ অনুরাগী এবং দরিদ্রের দুঃখ মোচন করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র মহাব্রত ছিল, এই মহাত্মার স্বভাবও অতি নির্ম্মল। মোট কথা, এই বংশ ক্রমান্বয়ে ধর্ম্মে মতি রাখিয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের মান রক্ষা করিতেছেন।

যুক্ত-ত্রিবেণী

তারকেশ্বর ষ্টেশন হইতে যে বেঃ প্রঃ রেল লাইন প্রসারিত হইয়াছে, ঐ লাইনের সাহায্যে মগরা যাইতে হয়, কিম্বা হাওড়া ষ্টেশন হইতে ই, আই, রেলযোগে বরাবর মগরা ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীর সঙ্গম স্থানকে ত্রিবেণী বলে। ভারতবর্ষ মধ্যে দুই স্থানে ত্রিবেণী আছে, অর্থাৎ এই মগরা ষ্টেশনের অনতিদূরে এবং যুক্তরাজ্য অর্থাৎ আলাহাবাদ সহরের অন্তর্গত প্রয়াগ তীর্থের সঙ্গম স্থান—এই দুই স্থানে ত্রিবেণীর দর্শন পাওয়া যায়। কথিত আছে, এই ত্রিবেণী গঙ্গার জলে ভক্তিসহকারে অবগাহন বা স্পর্শ করিলে নরহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, গুরুহত্যা, মিথ্যা কথা কথন প্রভৃতি মহাপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যোগ সময়ে যথানিয়মে ইহাতে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। হিন্দুদিগের চিরগত বিশ্বাস মতে গঙ্গা ও যমুনা নদীদ্বয়ের সঙ্গম স্থল, প্রয়াগ তীর্থে—সরস্বতী নদী অন্তঃসলিলা হইয়া মিলিতা হইয়াছেন। সেই কারণে ঐ স্থানের নাম "ত্রিবেণী"। এই নদীত্রয় সংযুক্তভাবে দক্ষিণ পূর্ব্বে প্রবাহিতা হইয়া নানা গ্রাম জনপদ ও নগরীকে ধৌত ও পবিত্র করতঃ মুর্শিদাবাদের উত্তরে সুতি-নগরের অদূরে পদ্মা নামে একটী পূর্ব্ববাহিনী শাখা বিস্তার করিয়া ভাগীরথী নামে দক্ষিণবাহিনী হইয়া মগরার সন্নিকট পুনরায়

ধারায় বিভক্ত হইয়াছেন, তজ্জন্য এই স্থানের নাম "যুক্ত-ত্রিবেণী"। যুক্ত-ত্রিবেণী মধ্যে গঙ্গা বা ভাগীরথী, পশ্চিমে সরস্বতী, পূর্ব্বে যমুনা, আবার স্বতন্ত্রভাবে স্রোতস্বতী হইয়া সাগরাভিমুখে পতিত হইয়াছেন।

মগরার সন্নিকট ত্রিবেণীতে দুইটী বাঁধা ঘাট দেখিতে পাওয়া যায়। একটী চাঁদনীযুক্ত অপরটী ছাদহীন। চাঁদনীযুক্ত ঘাটটী স্থানীয় মহাত্মা হরিমোহন মজুমদার নামক এক ব্যক্তি ভক্তদিগের স্নানের সুবিধার্থে নিৰ্ম্মাণ করাইয়া দিয়া কত উপকার এবং তৎসঙ্গে কত পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন, উহা লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। আর চাঁদনী-বিহীন এখানকার স্নানঘাট ও একটী শিবমন্দির, উড়িষ্যার শেষ হিন্দু রাজা মুকুন্দদেব বাহাদুর প্রতিষ্ঠা করিয়া আপন কীৰ্ত্তি স্থাপিত করেন। এই মুকুন্দদেব বাহাদুর প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন—ঘাটটী বহুকাল বেমেরামতি অবস্থায় ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইলে, ভাস্তারার বিখ্যাত জমিদার গভর্ণমেণ্ট উপাধি প্রাপ্ত মহারাজ ছকুলাল সিংহ বাহাদুর নিজ ব্যয়ে ইহার সংস্কার করিয়া আপন মহত্ত্ব প্রকাশ করেন। কথিত আছে, সাধ্বীসতী "বেহুলা" মনসাদেবীর রোষে পতিহীনা হইলে, তিনি সেই মৃতপতির জীবনদানের অভিলাষে কদলি-ভেলায় আরোহণ করাইয়া যখন ত্রিবেণীর এই চাঁদনীবিহীন ঘাটে উপস্থিত হন, তখন তিনি স্বচক্ষে দেখিলেন যে, এখানে নেতানামা কোন রজকপত্নী রোষভরে আপন পুত্রকে এক চপেটাঘাতে হত্যা করিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে পুনরায় তাহার জীবন দান করিলেন। এই অদ্ভুত ঘটনা দর্শনে বেহুলা তাহাকে নীচ জাতি জানিয়া-শুনিয়াও স্বীয় মৃতপতির জীবনের আশায় ঐ রজক পত্নীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ত্রিবেণীর আশে-পাশের অধিবাসীরা মৃতের উদ্ধারকল্পে বহু দূর হইতে বিবিধ প্রকার কষ্ট

স্বীকার করিয়া এখানকার এই পবিত্র তীরে তাহাদের সৎকার করিয়া থাকেন।

সঙ্গম স্থানের অনতিদূরে মহারাজ মুকুন্দদেব বাহাদুর স্থাপিত শিবেশ্বর মহাদেবের যে লিঙ্গ মূর্ত্তি এক মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাহার সন্নিকটে ভাগীরথীর একটী "দহ" কালীদহ নামে প্রসিদ্ধ। প্রবাদ আছে, মনসাদেবীর আজ্ঞাপ্রাপ্তে মহাবীর হনুমান ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানে চাঁদ-সওদাগরের সপ্তডিঙ্গী জলমগ্ন করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত ঐ স্থানটী "কালীদহ" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

কালীদহ ঘাটের সন্নিকটে ডুমুরদহ নামে একটী স্থান আছে। কথিত আছে, এখানকার আবালবৃদ্ধ সকলেই ডাকাতি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, এমন কি স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত পুরুষদিগের পাপ কার্য্যে সহায়তা করিত। অর্থাৎ এই পল্লীর অধিবাসীরা দিনমানে যাত্রীদিগকে মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিয়া নানাপ্রকার উপদেশদানে তথায় রাত্রি যাপন করিবার স্থান দিয়া সুবিধামত রজনীযোগে তাহাদের প্রাণসংহারপূর্ব্বক যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিত। এই স্থানের পুরুষেরা দিবাভাগে মৎস্য জীবিকার ভাণ করিয়া মৎস্য ধরিত এবং রাত্রিকালে নিজ মূর্ত্তিতে চতুর্দ্দিকে বোম্বেটেগিরি করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিত। ফলতঃ বলিতে হইবে, কি জলপথ কি স্থলপথ ডুমুরদহের কোন স্থানই নিরাপদ ছিল না।

আমরা সংসারমাঝে বুড়াবুড়ির নিকট যে আশানন্দ ঢেঁকীর গল্প শুনিতে পাই, সেই বীর চৌকীদার এই স্থান হইতে ঐ "ঢেঁকী" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রবাদ—একদা এই আশানন্দ আপন প্রভুর জমিদারী হইতে খাজনা আদায় করিয়া যখন সদলে এই স্থানে জঠরানল নিবারণের উদ্যোগ করিতেছিল, তখন আশানন্দ ও তাহার সঙ্গীরা স্থানীয় ডাকাত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। আশানন্দ এই আসন্ন বিপদ

হইতে উদ্ধার হইবার অভিলাষে স্থানীয় এক গৃহস্থের দুইটী ঢেঁকী সংগ্রহ করিয়া তাহাদেরই সাহায্যে স্বীয় বাহুবলের পরিচয় দিয়া ডাকাত দলকে সমূলে নির্ম্মূল করিল, অধিকন্তু তাহাদের প্রধান দলপতি বিশ্বনাথ বাবুকে আপন বগলে চাপিয়া ধরিয়া নির্ব্বিঘ্নে দশ ক্রোশ পথ অতিক্রমপূর্ব্বক শ্রীরামপুরে স্বীয় প্রভুর নিকট হাজির হইয়াছিল। সেই অবধি আশানন্দ সাধারণের নিকট "ঢেঁকী" নামে প্রসিদ্ধ হয়।

বিশ্বনাথ বাবু এখানে এক দ্বিতল পাকা বাটীতে স্ত্রী পুত্র লইয়া ভদ্রবেশধারী জমিদারের ন্যায় বাস করিতেন, তাহার বাড়ীখানি গঙ্গার তীরের উপর স্থাপিত থাকায় ঐ উচ্চ ছাদের উপর হইতে গঙ্গাতীরে বহু দূর পর্য্যন্ত লোকের গতিবিধির উপর লক্ষ্য করিতে পারিতেন। তাহার অধীনস্থ ডাকাতগণ মগরা তীর হইতে যশোহর পর্য্যন্ত নৌকাযোগে অবাধে ইংরাজরাজের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া বোম্বেটেগিরি করিয়া বেড়াইত। যে বিষয় উল্লেখ হইতেছে, উহা প্রায় ৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বের কথা। বিশ্বনাথ বাবু জনসমাজে জমিদাররূপে অবস্থান করিয়া শেষ এই আশানন্দ ঢেঁকীর নিকট ধরা পড়িলেন এবং ইংরাজ রাজপুরুষের বিচারে অবশেষে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এক সময় এই ত্রিবেণী-তীর জনাকীর্ণ সহরে পরিণত ছিল, তখন ইহার শোভা সমৃদ্ধির পরিসীমা ছিল না। সেই প্রাচীনকালে এখানে অনেকগুলি চতুষ্পাটী টোল থাকায় লোকজনের শিক্ষারও অভাব ছিল না। যতগুলি টোল এখানে বর্ত্তমান ছিল, তন্মধ্যে রুদ্রদেব তর্কবাগীশের পুত্র স্বর্গীয় জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের টোলটীই প্রসিদ্ধ ছিল। সেই মহাত্মা এমন স্মরণশক্তি সম্পন্ন ছিলেন যে, কথিত আছে, একদা যখন তিনি স্নান সমাপনান্তে এই ত্রিবেণী ঘাটে বসিয়া আহ্নিক করিতে-

ছিলেন, ঠিক সেই সময় ইংলণ্ড ও ফ্রান্স দেশীয় দুইজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নৌকাযোগে এই ঘাটে উত্তীর্ণ হন এবং নানাপ্রকার তর্কবিতর্কের প… তাহারা কথান্তর সূত্রে উভয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন; শেষে সুপ্রিমকো… তাঁহারা অভিযোগ আনয়ন করিয়া এখানকার এই তর্কপঞ্চানন মহা… শয়কে সাক্ষীস্বরূপ হাজির করান। তর্কপঞ্চানন মহাশয় বিচারাল… হাজির হইয়া সরল অন্তঃকরণে বিচারপতির নিকট বলিলেন, "হুজুর, ইঁহারা কলহে প্রবৃত্ত হইয়া যিনি যাহার পর যাহা তর্ক করিয়াছিলে… তাহা আমি যথাযথ প্রকাশ করিতে পারিব, কিন্তু ঐ সকল তর্কের অ… কিছুই বলিতে পারিব না—এই কথা বলিয়া তিনি আদ্যোপান্ত সমস্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিচারপতি তাঁহার মুখে সমস্ত অবগত হইয়া সহজেই রায় লিখিয়াছিলেন। কথিত আছে, এই মহাত্মা এক শত ত্রয়োদশ বৎসর জীবিত থাকিয়া অধীনস্থ শিষ্যদিগকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহার জীবদ্দশায় কলিকাতা ও হুগলী হইতে বড় বড় সাহেবেরা তাঁহার নিকট ত্রিবেণীতে আসিয়া নানা বিষয়ের পরামর্শ লইতেন।

পুরাকালে এখানকার জল হাওয়া বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল। সেই সময় অনেক ধনী ব্যক্তিরা বহু দূর দেশ হইতে এখানে বায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত আসিয়া সদলে বাস করিতেন এবং প্রত্যাগমনকালে এই স্থান হইতে এখানকার এই বিখ্যাত নদীর পানীয় জল যত্নের সহিত সংগ্রহ করিয়া স্বীয় পুরে লইয়া গিয়া পান করিতেন। এ বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে কবিকঙ্কণ স্বরচিত কাব্য মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশিত আছে, যথা;—

সপ্ত গ্রামের বেণে সব কোথাও না যায়।
ঘরে বসে সুখে মোক্ষ নানা ধন পায়॥

তীর্থ মধ্যে পুণ্য তীর্থ অতি অনুপম।
সপ্ত ঋষি শাসনে বলয়ে সপ্তগ্রাম॥
কাণ্ডারীর বচনে করিয়া অবগতি।
ত্রিবেণীতে স্নান করেন, সাধু ধনপতি॥
নায়ে তুলে সওদাগর নিল মিঠা পানী।
বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন ফরমানী॥

কিন্তু হায়! কালের কুটীল পরিবর্ত্তনে সেই জনপাদপূর্ণ স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানটী এক্ষণে অরণ্যপূর্ণ এবং মানববিহীন অবস্থায় অবস্থান করিতেছে। আবার উপরোক্ত বচন এবং মহাবীর হনুমান, যে এই স্থানেই সপ্ততরী ডুবাইয়াছিলেন, তাহা প্রমাণ করাইবার নিমিত্ত অদ্যাপি এখানকার সরস্বতী খালের তীরস্থ মৃত্তিকা খনন করিবার সময় সেই পুরাকালের বিস্তর গুণবৃক্ষ, জীর্ণ নৌকার খণ্ড কাষ্ঠ, ভাঙ্গা তক্তা ও শৃঙ্খলাদি প্রভৃতির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকলগুলিরই দ্বারা সেই প্রাচীনকালের ঘটনার বিষয় প্রমাণ পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, এইরূপে ত্রিবেণী গঙ্গাতে স্নান এবং শিবেশ্বর মহাদেবের দর্শন আরও দর্শনীয় স্থানগুলির শোভা সন্দর্শনপূর্ব্বক এখান হইতে বৰ্দ্ধমান সহরের শ্রীশ্রীসর্ব্বমঙ্গলাদেবীর দর্শনের জন্য প্রস্তুত হইলাম।

বৰ্দ্ধমান

বৰ্দ্ধমান—ই, আই, রেল কোম্পানীর একটী প্রধান ষ্টেশন। এখানে বর্দ্ধমানাধিপতির প্রাচীন কীর্ত্তি বিস্তর দেখিবার আছে, হাওড়া হইতে বর্দ্ধমান ৫৭ মাইল দূরে অবস্থিত। সহরটী বাঁকানদীর উপরি-ভাগে আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে। এখানকার রাজাদিগের যতগুলি কীর্ত্তি বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীসর্ব্ব-মঙ্গলাদেবী ও শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীউর পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন যোগ্য। বর্দ্ধমানে কলের জল, আলোকমালা, পুলিসকোর্ট, জজকোর্ট, দাওয়ানীকোর্ট, দেবমন্দির, মসজিদ, গির্জ্জা এবং নানা ধরণের বিবিধ প্রকার উদ্যান ও পুষ্করিণী, অশ্ব-শালা, গো-শালা, গোলাপ-বাগ প্রভৃতির সৌন্দর্য্য দেখিলে আনন্দে অধীর হইতে হয়। ভারতবর্ষ মধ্যে অতি অল্প স্থানই আছে, যথায় তাঁহাদের জমীদারী নাই।

এ সহরে গাড়ী, ঘোড়া বা আহারীয় কোন দ্রব্যের অভাব নাই। বর্দ্ধমানে যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় হয়, উহা ৬০৲ টাকা ওজনের সের। সম্প্রতি কলিকাতা সহরের ন্যায় ৮০ টাকা সেরের ওজন প্রচলিত হইবার ব্যবস্থা হইতেছে। আমরা বর্দ্ধমানে সদলে উপস্থিত হইয়া ষ্টেশনের অনতিদূরে এক পান্থশালায় বিশ্রাম স্থান ঠিক করিয়া লইয়া তথায় আপনাপন পোটলা-পুঁটলীগুলি রাখিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর

সহর পরিভ্রমণ করিবার অভিলাষে একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিলাম; গাড়ীতে উঠিবামাত্র গাড়োয়ানেরা আমাদিগকে লইয়া এখানকার লালবর্ণের প্রশস্ত রাজপথের উপর দিয়া প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রমপূর্ব্বক পরে এক পল্লীপথের মধ্যে শ্রীশ্রীসর্ব্বমঙ্গলাদেবীর পাঁচ চূড়াবিশিষ্ট মন্দিরের পাদদেশে উপস্থিত হইল। এখানে প্রাতঃকাল হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত চিরপ্রথানুসারে দেবীর পূজার্চ্চনার নিমিত্ত দেবালয়টী খোলা থাকে, তৎপরে অপরাহ্ণ তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত মন্দির দ্বার বন্ধ থাকে। এই নির্দ্ধারিত সময় অতীত হইলে ভক্তদিগের দর্শনের সুবিধার জন্য পুনরায় দেবালয়ের দ্বার খোলা হয়।

এখানে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া আমরা দেবালয়ের সিংহদ্বারের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র একটী বাগানবাটীতে উপস্থিত হইলাম এবং তথায় কতকগুলি শিবমন্দির দর্শন পাইয়া ভক্তিভরে ঐ স্থান হইতে শিবোদ্দেশে প্রণাম করিলাম। এই স্থান হইতে আরও কিঞ্চিৎ ভিতর দিকে অগ্রসর হইলে দেখা যায়, এক মন্দির মধ্যে জগজ্জননী সর্ব্বমঙ্গলাদেবী নানা অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া বিরাজ করিতেছেন। সেই দেবী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নয়ন ও জীবন সার্থক করিলাম। মন্দির সম্মুখেই নাটমন্দির শোভা পাইতেছে, তথায় দেবীর উদ্দেশে ছাগ বলি হয়। এইরূপে সর্ব্বমঙ্গলাদেবীর দর্শনান্তে স্থানীয় রাজকুমারীর প্রতিষ্ঠিতা নবদুর্গাদেবীর পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করিয়া এখান হইতে বহির্ভাগে রাজার দুর্গোৎসব ও সরস্বতী পূজার বাটীতে উপস্থিত হইলাম। স্থানীয় অধিবাসীদিগের নিকট উপদেশ পাইলাম, প্রতি বৎসর এখানে রাজার এই দুইটী পূজা অতি সমারোহে সম্পন্ন হয়। বর্দ্ধমানে যে দুর্গোৎসব হয়, উহা অপর স্থানের ন্যায় প্রতিমা সাজাইয়া পূজার পরিবর্ত্তে কেবল শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর প্রতিমূর্ত্তি—পটে চিত্রিত হইয়া যথানিয়মে ঐ চিত্র-পট-

খানির পূজার্চ্চনা হয় এবং ঐ সময় দেবী স্থানে ছাগবলির পরিবর্ত্তে চিরপ্রথানুসারে মহাষ্টমীর দিন কেবল একটী নারিকেল বলি দেওয়া হয়। ইহার পর গো-শালা ও মহিষ-শালায় প্রবেশ করিয়া "ছোট লালাজীউ" নামক বিগ্রহ মূর্ত্তির দর্শন করিলাম। ছোট লালাজীউর ন্যায় বৃহদাকার দেব মূর্ত্তি বৰ্দ্ধমান সহর মধ্যে আর দ্বিতীয় নাই। তাহার পর পূর্ব্বাভিমুখে সর্ব্বমঙ্গলাদেবীর ঘাটে উপস্থিত হইলাম। এই ঘাটের পশ্চিম পার্শ্বে একটী কামান পাতা আছে। অবগত হইলাম, প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের সময় মহাষ্টমীর দিন সন্ধিপূজার নির্দ্ধারিত সময় পূজারীদিগকে জানাইবার জন্য একবার এই কামানটী দাগা হয়।

এই স্থান হইতে ক্রমে অগ্রসর হইবার সময় পথিমধ্যে রাণীসায়েরের প্রকাণ্ড ঘাট নয়নপথে পতিত হইল। এই পুষ্করিণীর চারিদিকে সুসজ্জিত বাগান, তাহার অপরদিকে আর একটী সুন্দর পুষ্করিণী শ্যামসায়ের নামে আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে। এই শ্যামসায়ের নামক পুষ্করিণীটীও রাণীসায়েরের ঘাটের ন্যায় আয়তনে বৃহৎ এবং তাহারও চতুর্দ্দিকে অতি কম কুড়িটী বাঁধান ঘাট, অধিকন্তু তাহাদের আশে-পাশে সুন্দর সুন্দর লতাগুল্ম ও বাগান দ্বারা সজ্জীকৃত। এই দুইটী পুষ্করিণীর শোভা সন্দর্শন শেষ হইলে এখান হইতে শ্যামসায়েরর সৌন্দর্য্য দেখাইবার নিমিত্ত শ্যামসায়ের নামক পল্লীতে আসিয়া গাড়ীগুলি উপস্থিত হইল।

শ্যামসায়ের পল্লী

এই পল্লীটীতে অনেকগুলি পাকা বাড়ী বর্ত্তমান এবং স্থানে স্থানে বারাঙ্গনাদিগের বাসস্থান থাকায় এই স্থানটী বেশ সরগরম অবস্থায়

অবস্থান করিতেছে। এ সহরের অধিকাংশ স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ লজ্জাহীনা, বোধহয়—তাহাদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া লজ্জাদেবী দূরে অবস্থান করিতেছেন। বলাবাহুল্য, শ্যামসায়ের নামক পল্লীতে সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি, আদালতের উকীল, মোক্তার ও স্থানীয় উচ্চ পদস্থ কেরাণীগণ বাস করিয়া থাকেন। ইহার সন্নিকটেই জেলখানা—দুষ্ট লোকদিগকে সৎপথে চলিবার উপদেশ দিবার নিমিত্ত মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। জেলখানার অনতিদূরে সর্ব্বমঙ্গলার পুষ্করিণী নামে একটা ক্ষুদ্রাকারের জলাশয় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার জল অতি স্বচ্ছ, পাছে পুষ্করিণীর জল অপরিষ্কার হয়, এই আশঙ্কায় রাজাদেশে কাহাকেও ইহার মধ্যে স্নান বা বস্ত্রাদি ধৌত করিতে দেওয়া হয় না। অবগত হইলাম, স্থানীয় অধিবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকই কলের জল সত্ত্বেও আগ্রহের সহিত এই পুষ্করিণীর জল পান করিয়া থাকেন।

এই স্বচ্ছসলিলা সর্ব্বমঙ্গলার পুষ্করিণী স্থানে গাড়োয়ানেরা আমাদিগকে বলিল,"হুজুর! এবার আমরা আপনাদিগকে রাজার হাতীশালা এবং কৃষ্ণসায়ের নামক পুষ্করিণীর শোভা দেখাইয়া তৎপরে গোলাপবাগের সৌন্দর্য্য—তাহার পর রাজপ্রাসাদের শোভা দেখাইব, আপনাদের কি অনুমতি হয়।" কোন্‌টীর পর কোন্‌টী দেখিলে সুবিধা হয়, এ বিষয় আমাদের জানা না থাকায় অগত্যা তাহাদের প্রস্তাবেই সম্মত হইলাম। তখন গাড়ীগুলি রাজার হাতীশালার দ্বারদেশে উপস্থিত হইবামাত্র আমরা দূর হইতে কতকগুলি হস্তীকে দেখিয়াই সন্তুষ্ট হইলাম, অল্প সময়বশতঃ ইহার ভিতর প্রবেশ না করিয়া বরাবর কৃষ্ণসায়ের নামক পুষ্করিণীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

কৃষ্ণসায়ের পুষ্করিণী

কৃষ্ণসায়েরের ন্যায় সুন্দর ও বৃহদাকার পুষ্করিণী এখানকার সমস্ত সহর মধ্যে আর দ্বিতীয় দেখিতে পাওয়া যায় না। এই পুষ্করিণীটী এত বৃহৎ যে, ইহার এক পার হইতে অপর পারে কোন ব্যক্তি দণ্ডায়মান থাকিলে তাহাকে অতি ক্ষুদ্র বলিয়া অনুমান হয়। কৃষ্ণসায়ের তীরের চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ সকল নানাবিধ ফলফুলে শোভা পাইতেছে। আবার ইহার তীরপথের উপরিভাগে এক স্থানে গুটি কত বৃহদাকার কামান পাতা আছে। উপদেশ পাইলাম, এই সকল কামান হইতে প্রত্যহ প্রাতে চারিটার সময় এবং রাত্রি এক প্রহরে স্থানীয় অধিবাসীদিগকে নির্দ্ধারিত সময় জানাইবার নিমিত্ত যথা-সময়ে যথানিয়মে এই সকল কামান হইতে তোপ দাগা হয়। এই কামান স্থানের দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইবামাত্র একটী ত্রিতল চাঁদনী-যুক্ত বৈঠকখানা বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। সেই বৈঠকখানা বাড়ীটীতে যে সকল গৃহ বিরাজিত, উহা নানা সাজে সজ্জিত হইয়া আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে। স্থানীয় প্রহরীদিগের নিকট অবগত হইলাম কোন বিদেশী রাজা কিম্বা মাননীয় জমিদার ব্যক্তি বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইলে আমাদের মহারাজ যত্নসহকারে তাঁহাদিগকে এই স্থানে বিশ্রাম স্থান দান করিয়া থাকেন। প্রতি বৎসর শ্রীপঞ্চমীর সময় এবং রাজা রাণীর শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে এই কৃষ্ণসায়ের তীরে অনেক টাকার বাজী পোড়ান হয়। এখানকার এই বৈঠকখানা বাটীটীর সুবন্দোবস্ত দেখিলে অনুমান হয় যে, ইহাতে অনেকগুলি কর্ম্মচারীর অন্নের সংস্থান হইয়াছে। কোন হিন্দুবেশধারী বিদেশী যাত্রী এই বৈঠকখানার শোভা দেখিতে ইচ্ছা করিলে—স্থানীয় কর্ম্মচারীরা অতি যত্নের সহিত তাহা-

দিগকে ইহার সৌন্দর্য্য দেখাইয়া থাকে, এইরূপ সংবাদ পাইয়া আমরা তথায় অনুরোধ করিলে স্থানীয় কর্ম্মচারীরা আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া উপরে উঠাইয়া লইলেন। ইহার উপর তালার সুশোভিত কক্ষগুলির দৃশ্য দেখিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। আবার ইহার ভিতর—মহারাজের যে একটী মৃণ্ময় প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, প্রথমতঃ সেই মূর্ত্তিটী নয়নপথে পতিত হইলে যেন যথার্থ মহারাজ জীবিতাবস্থায় বসিয়া আছেন বলিয়া ভ্রম হয়। এইরূপে কৃষ্ণসায়ের শোভা সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া এখান হইতে গোলাপ-বাগের শোভা দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

গোলাপ-বাগ

কৃষ্ণসায়ের হইতে বহির্গত হইয়া সহরের প্রশস্ত রাজপথের উপর প্রায় এক ক্রোশ রাস্তা অতিক্রম করিলে পর, স্থানীয় গোলাপ-বাগের ফটকের নিকট গাড়ীগুলি ধীরে ধীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। গোলাপ-বাগের অপর নাম "দেলখোস-বাগ", ইহা দীর্ঘে অন্যূন এক মাইল এবং চারিদিকে পরিখা দ্বারা বেষ্টিত। এই বাগের ভিতরে প্রবেশ করিবার এক পূর্ব্বদিক ব্যতীত আর অপর কোনদিকে দ্বিতীয় পথ নাই। সেই পূর্ব্বদিকেই আবার দুইদিকে দুইটী ফটক শোভা পাইতেছে। প্রত্যেক ফটক দ্বারে—শান্তি পাহারা নিযুক্ত থাকিয়া রাজার মহিমা প্রকাশ করিতেছে। সে যাহা হউক, আমরা সদলে এই পূর্ব্ব দিকের একটী ফটক দ্বারের মধ্য পথ দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র কত রং বেরংএর পত্র পুষ্প, কত জীবজন্তু, কত পশুপক্ষী দেখিতে পাইলাম, তাহার ইয়ত্তা নাই। অর্থাৎ এই গোলাপ-বাগের মধ্যে নেকৃড়ে বাঘ হইতে পশুরাজ সিংহ পর্য্যন্ত, এমন কি শৃগাল, কুকুর, নানা ধরণের

লাল, নীল, সাদা বানর, বনমানুষ, ভল্লুক, তালষাঁড়, রাজহংস, পাতি-হংস, বালি হংস, সর্প প্রভৃতির একত্র সমাবেশ দেখিলে আনন্দে অধীর হইতে হয়। ইহার মধ্যে একটী স্থান আবার গোলকধাঁধাঁ নামে খ্যাত, সেই গোলকধাঁধাঁর নির্দ্দিষ্ট স্থানে একটী সুসজ্জিত বৈঠকখানা বাটী—তাহার সম্মুখে একটী স্বচ্ছসলিলা পুষ্করিণী,ঐ পুষ্করিণীতে বড় বড় মৎস্য-গণ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া করুণাময় পরমেশ্বরের নিকট মহারাজার দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিতেছে। গোলকধাঁধাঁ নামক স্থানটী অতি সামান্যমাত্র (এক কাটা জমীর উপর প্রতিষ্ঠিত)। এই নির্দ্দিষ্ট স্থানে যে সকল লাল বর্ণের কাষ্ঠের রেলিং—যাহা পুষ্পপত্র দ্বারা আচ্ছাদিত আছে এবং তাহার চতুর্দ্দিকের গৃহ বা রাস্তাগুলি পুষ্প টবে এরূপভাবে সজ্জী-কৃত আছে যে, সে সমস্তেরই দৃশ্য এক রূপ। সুতরাং এইমাত্র যে পথে পরিভ্রমণ করিলাম, ঘুরিয়া ফিরিয়া ভুলক্রমে আবার ঠিক সেই স্থানেই আসিতে হয়। এই স্থানটীর আকৃতি ঠিক জিলিপীর প্যাঁচের ন্যায়; ফলতঃ ইহার গোলকধাঁধাঁ নাম সার্থক হইয়াছে বলিতে হয়।

গোলাপ-বাগের ভিতর এক স্থানে একটী পাতাল গৃহ আছে। অব-গত হইলাম, স্বয়ং মহারাজ গ্রীষ্মকালে সদলে বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত ঐ গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক রৌদ্রের প্রখর উত্তাপ হইতে শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। এই পাতালগৃহটীও উত্তমরূপে সজ্জীকৃত দেখিতে পাওয়া যায়। দেলখোসের এক ধারে একটী লম্বাকৃতি দীঘি আছে, তাহার তীরে কতকগুলি জালিবোট দেখিতে পাওয়া যায়। সময় মত মহারাজা সদলে ঐ সকল বোটে আরোহণপূর্ব্বক জলবিহার করিয়া আমোদ অনু-ভব করেন। আবার এই দীঘি হইতে পাইপের সাহায্যে পম্পিং মেসিন দ্বারা জল সংগ্রহ করাইয়া চতুর্দ্দিকস্থ বৃক্ষগুলিতে জল সিঞ্চন করার ব্যবস্থা আছে। সে যাহা হউক, এইরূপে আমরা সকলে

গোলাপবাগের শোভা সন্দর্শনপূর্ব্বক এখান হইতে রাজপ্রাসাদের শোভা দর্শনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলাম।

রাজপ্রাসাদ

এই ত্রিতল প্রাসাদটী প্রশস্ত রাজপথের উপরিভাগে বহু দূর বিস্তৃত থাকিয়া শোভা পাইতেছে। রাজভবনে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত দক্ষিণদিকে একটী বড় খিলানযুক্ত ফটক, এতদ্ভিন্ন অন্যদিকেও ভিতরে যাইবার পথ বর্ত্তমান আছে। আমরা এই দক্ষিণদিকের ফটকের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিবার সময় প্রাঙ্গণের স্থানে স্থানে নানাবিধ মারবেল প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। ঐ সকল মূর্ত্তি-গুলির মধ্যে অধিকাংশ ইংরাজ বীর রাজপুরুষদিগের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, এই বিস্তৃত প্রাঙ্গণভূমি পার হইলে পর প্রাসাদ ভবনের সুন্দর দেওয়ালগুলি যেন আগ্রা সহরের দ্বিতীয় শীষমহল, অর্থাৎ চতু-র্দ্দিকে বৃহদাকার আয়না দ্বারা সজ্জীকৃত দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। প্রত্যেক গৃহে বর্দ্ধমান রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষদিগের এবং খ্যাতনামা ইংরাজ রাজপুরুষ, আরও কলিকাতার বিখ্যাত ভাগ্যবান ব্যক্তিগণের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে গৃহগুলি এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে। আবার এই সমস্ত কক্ষগুলি এরূপ সুন্দরভাবে বহু মূল্য দ্রব্য-সামগ্রী দ্বারা সজ্জীকৃত যে উহার সৌন্দর্য্য একবার দেখিয়া কিছুতেই নয়ন পরি-তৃপ্ত হয় না।

মহাতাপ মঞ্জিল—একটী সুশোভিত কাছারী বাটী। প্রাতঃ-স্মরণীয় মহারাজ মহাতাপচাঁদ বাহাদুর এই সুন্দর মঞ্জিলটী নির্ম্মাণ করাইয়া আপন নামানুসারে ইহাকে “মহাতাপ মঞ্জিল” নামে খ্যাত

করেন। স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগের নিকট উপদেশ পাইলাম, মহারাজ মহাতাপচাঁদ বাহাদুর জীবিতাবস্থায় এই মঞ্জিলটী প্রস্তুত হইলে, ইহাকে চিরস্মরণীয় করিবার অভিলাষে বহু অর্থ ব্যয়সহকারে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত-দিগকে বশীভূত করেন এবং তাঁহাদের দ্বারা এই স্থানে প্রাচীন সংস্কৃত মহাভারতখানি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করাইয়া দেশ বিদেশে বিনা মূল্যে বিতরণপূর্ব্বক অমরত্বলাভ করিয়াছেন। মঞ্জিলের সন্নিকটে বারদ্বারী নামক প্রকাণ্ড বৈঠকখানা বাড়ী আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে। এই বৈঠকখানা বাটীটীর সৌন্দর্য্য দর্শনপূর্ব্বক বাহির হইতে ব্রহ্মসমাজ দেখিলাম। স্থানীয় সমাজটীর দ্বার জানালা এমন কি মেজেটী পর্য্যন্ত রাজার আদেশ মত লালবর্ণে প্রস্তুত হইয়াছে। এই সমাজ বাটীটী বৃন্দা-বনের শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর প্রাচীন মন্দিরের অনুকরণীয়। তাহার পর "নারায়ণ মঞ্জিল" অর্থাৎ অন্দর মহল। এদিকে কোন অপরিচিত লোকের প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। নারায়ণ মঞ্জিলের পরই আবার একটী কাছারী বাড়ী। এই কাছাড়ী মধ্যে রাজসরকারের যাবতীয় আয় ব্যয়ের হিসাব হইয়া থাকে।

সরকারী কাছারী বাড়ীর পর শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজীউর দেবা-লয়ে উপস্থিত হইলাম। এই দেব—রাজবংশের কুলদেবতারূপে অবস্থান করিয়া ভক্তগণের পূজা গ্রহণ করিতেছেন। ভগবান লক্ষ্মীনারায়ণজীউর যেমন রূপ, তেমনি বেশভূষা, দর্শনে নয়ন আর ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না, তাঁহার প্রথম দর্শনে মনে হয়—যেন ভগবান্ সাক্ষাৎ রাজবেশে বৈকুণ্ঠ হইতে এই স্থানে ভক্তগণকে দর্শনদানে উদ্ধার করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। এ মূর্ত্তি যিনিই দর্শন করিবেন, তাহাকেই মোহিত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই, আবার এই দেবের—সেবার সুবন্দোবস্ত দেখিলে দিব্যজ্ঞান উদয় হয়। ভগবান লক্ষ্মীনারায়ণজীউর মন্দিরের চারিদিকে

লান, মধ্যে নাটমন্দির। নাটমন্দিরের এক দিকে রাসমঞ্চ ও এক-খানি প্রকাণ্ড পিত্তলের রথ শোভা পাইতেছে। প্রত্যহ এখানে যথা-নিয়মে ব্রাহ্মণদিগকে পরিতোষের সহিত ভোজন করাইবার ব্যবস্থা আছে। সে যাহা হউক, এইরূপে রাজভবন এবং শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ-জীউর পবিত্র মূর্ত্তিদর্শনপূর্ব্বক মনের আনন্দে এবার এখান হইতে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা ও রাধাবল্লভজীউর শ্রীচরণ বন্দনা করিবার অভি-লাষে বহির্ভাগে আপনাপন গাড়ীতে আরোহণ করিয়া গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিলাম।

পথিমধ্যে এক স্থানে রেভারেণ্ট জে, ওয়েব্রেট সাহেবের স্থাপিত একটী বিখ্যাত গির্জ্জা, তিনি নিজে ইহা এখানে অকাতরে দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই গির্জ্জার শোভা দেখিয়া আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে যে পল্লীতে উপস্থিত হইলাম, উহা পুরা-তন বর্দ্ধমান নামে খ্যাত। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ১৬২১ খৃঃ মুসলমান সম্রাটদিগের প্রাদুর্ভাবকালে তাঁহারা সসৈন্যে আসিয়া এই স্থানটী আক্রমণপূর্ব্বক সহর মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আবার ইহার কিছুকাল পর ১৬৯৫ খৃঃ সর্ব্বাসিং নামে এক দুর্দ্দান্ত জমিদার ইংরাজ বলে বলীয়ান হইয়া কোন সূত্রে বর্দ্ধমানে বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়া মহারাজকে হত্যা করেন এবং অবসর মত তাঁহার অন্দর মহলে প্রবেশপূর্ব্বক রাজপরিবারবর্গকে রুদ্ধ করিয়া হুগলী নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইহারই ফলে ইংরাজেরা নবাবের আদেশে বিনা করে কলিকাতার পুরাতন কেল্লাটী মেরামত ও তাহার চতুর্দ্দিকে খাত খনন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। কথিত আছে, বিদ্রোহকারী সর্ব্বাসিং এদিকে হুগলি হইতে বর্দ্ধমানে প্রত্যা-বর্ত্তন পূর্ব্বক এখানে যথায় রাজপরিবারস্থ লোকদিগকে রুদ্ধ করিয়া-

ছিলেন, তন্মধ্যে যুবতী রাজকুমারীর অপরূপরূপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তিনি স্বশস্ত্র অবস্থায় তাঁহার সতীত্ব নষ্ট করিবার চেষ্টা করিলে রাজকন্যা—সতীকুলরাণী দুর্গাদেবীর শ্রীচরণ ধ্যান করিয়া সেই পাপিষ্ঠের কটিদেশ তরবারির সাহায্যে তাহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন, অবশেষে নরহত্যা মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনি স্বীয় জীবন বিসর্জ্জনপূর্ব্বক—বিপদ কালে সতী রমণীগণকে কিরূপে প্রাণ অপেক্ষাও মহৎ "সতীত্ব রত্ন" রক্ষা করিতে হয়, তাহারই শিক্ষা দান করিয়াছিলেন।

পুরাতন বর্দ্ধমানের এক স্থানে শ্মশানকালীর পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন পাওয়া যায়। কথিত আছে, বর্দ্ধমান সহরে বিদ্যাসুন্দরের অভিনয়কালে রাজাজ্ঞায় সুন্দরের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইবামাত্র, ঘাতকেরা তাহাকে শ্মশানভূমিতে লইয়া যায়। সুন্দর অন্তিম সময় তথায় তাঁহার অধিষ্ঠাত্রী কালীকাদেবীর স্তব করিলে দেবী হৃষ্টচিত্তে এই স্থানে মূর্ত্তিমতী হইয়া সুন্দরকে রক্ষা করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ঐ কালীমূর্ত্তি এখানে শ্মশান-কালী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। এইরূপে এখানকার শ্মশানকালীর দর্শন করাইয়া গাড়োয়ানেরা আমাদিগকে মালিনীপোতার সুরঙ্গ স্থান দেখাইবার জন্য তাহাদের ঘোড়াগুলিকে কসাঘাত করিল।

মালিনীপোতা

মালিনীপোতা অর্থাৎ রাজভবনের মালিনীর বাড়ী। যে মালিনীর আশ্রয়ে ও সাহায্যে শ্রীমতী বিদ্যাসুন্দরীর সহিত শ্রীমান সুন্দরের মিলন হইয়াছিল, উক্ত মালিনীর বাড়ীর এক স্থানে একটী সুরঙ্গ পথ আছে। প্রবাদ—ঐ সুরঙ্গ পথ দিয়া রাজকুমার সুন্দর, যুবতী সুন্দরী বিদ্যার কক্ষে গুপ্তভাবে যাতায়াত করিতেন; শেষে করুণাময়ী কালিকাদেবীর

কৃপায় তাঁহাদের উভয়ের মিলন হইলে পর, রাজাজ্ঞায় ঐ সুরঙ্গ পথটী যত্নের সহিত রক্ষিত হওয়াতে অদ্যাপি সেই অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এইরূপে এখানকার উপরোক্ত স্থানগুলির শোভা সন্দর্শন করিয়া সহর ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে স্থানীয় বিখ্যাত সীতাভোগ, মিহীদানা, খাজা ও সামান্য তামাক খাইবার জন্য টিকা সংগ্রহপূর্ব্বক ভগবান বৈদ্যনাথদেবের দর্শনের জন্য প্রস্তুত হইলাম।

শ্রীশ্রী৺বৈদ্যনাথজীউর দর্শন যাত্রা

কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলযোগে কর্ড লাইনের সাহায্যে বৈদ্যনাথ নামক ষ্টেশনে নামিতে হয়, তথা হইতে পৃথক্ ছোট ব্রাঞ্চ লাইনের গাড়ীতে আরোহণপূর্ব্বক অক্লেশে দেওঘর নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হওয়া যায়। হাওড়া হইতে দেওঘর ২০৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ষ্টেশন হইতে ভারতবিখ্যাত বৈদ্যনাথদেবজীউর মন্দির অন্যূন দেড় মাইল পাকা রাস্তার উপর দিয়া অগ্রসর হইতে হয়।

দেওঘর ষ্টেশনের অনতিদূরে ক্যাষ্টারটাউন নামে এক স্বাস্থ্যপ্রদ নগর আছে। নগরটী রাঢ়দেশ অর্থাৎ বীরভূম-সিউড়ির অন্তর্গত এবং গভর্ণমেণ্ট হইতে উপাধি প্রাপ্ত রাজা সুরথমল কর্ত্তৃক সংস্থাপিত। এখানে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় এবং কয়েকটী ডিস্পেন্সারী আছে। অনেক স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তি এই স্থানে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য আসিয়া থাকেন। ক্যাষ্টার টাউনটী-সিস্থিয়া ময়ূরাক্ষী নামক নদীর তীরে অবস্থিত। বৈদ্যনাথ নামক ষ্টেশনের ২১টী ষ্টেশনের পর কানুজংশন নামে একটী বিখ্যাত স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ স্থান হইতেই ই, আই, রেল কোম্পানীর দুইটী শাখা লাইন দুইদিকে পৃথক্‌ভাবে প্রসারিত হইয়া কর্ড ও লুপ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

দেবালয়ের চতুর্দ্দিকে যাত্রীদিগের বিশ্রামের জন্য বিস্তর বাসাবাটী আছে। আমরা এখানে উপস্থিত হইবামাত্র আমাদের পাণ্ডা সূর্য্য-নারায়ণ ঠাকুরের আদেশে শিবগঙ্গার উপরিভাগে একখানি দোতালা কক্ষমধ্যে বিশ্রাম স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। পশ্চিম তীর্থে পাণ্ডাদিগের মধ্যে একটী নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদ্যপি কোন যাত্রীর কোন পূর্ব্ব পুরুষ তথায় গমন করিয়া কোন পাণ্ডাকে তীর্থ গুরু বলিয়া মান্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার বংশধরদিগকে সেই পাণ্ডা বা উক্ত পাণ্ডার অবর্ত্তমানে তাঁহারই বংশধর—যিনি তথায় পাণ্ডাপদে নিযুক্ত আছেন, সেই ব্যক্তিকে পাণ্ডাপদে মান্য করিতে হয়। তীর্থ স্থানের প্রত্যেক পাণ্ডার খতিয়ান খাতা থাকে, যিনি একবার যাঁহাকে গুরু-পদে মান্য করেন, প্রত্যাবর্ত্তনকালে পাণ্ডারা উক্ত যাত্রীর নাম, ধাম, বেশীর ভাগ তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা থাকেন, তাঁহাদের পর্য্যন্ত নাম স্বয়ং লিখিয়া বা স্বাক্ষর করাইয়া লইয়া থাকেন। ইহার ফলে যাত্রীদিগের পরিচয় লইয়া তাঁহাদের সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত ঐ সকল স্বাক্ষর দেখা-ইয়া নূতন যাত্রীকে আপন শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করেন।

ভগবান বৈদ্যনাথজীউ—দ্বাদশ মহালিঙ্গের মধ্যে একটী বিখ্যাত লিঙ্গ। রাত্রিকালে এই দেবের সন্ধ্যা আরতি দর্শন করিলে ভক্তির সঞ্চয় হইয়া থাকে। এই স্থান ৫১ পীঠের মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ। বিষ্ণুচক্রে বিচ্ছিন্ন সতীর হৃদয় এখানে পতিত হওয়ায়, জগজ্জননী জয়-দুর্গা নামে এই তীর্থে ভগবান বৈদ্যনাথের সহিত প্রসন্ন মনে বিরাজ করিতেছেন। এই মহালিঙ্গ ও জয়দুর্গাদেবী ব্যতীত এখানে আরও কুড়িটী দেবদেবীর মন্দির স্থাপিত আছে। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত স্থানীয় মন্দির গুলির একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল।

এ তীর্থে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে শিবগঙ্গা নামে যে দীঘি আছে,

উহাতে যথানিয়মে ভক্তিপূর্ব্বক সঙ্কল্প ও স্নান করিতে হয়। ঐ সময় পৈতা, শুপারি ও একটী পয়সা দানে, তীর্থ গুরু পাণ্ডার সাহায্যে মন্ত্র উচ্চারণ করিবার নিয়ম আছে। তৎপরে শুদ্ধচিত্তে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া যে দেবের দর্শনের নিমিত্ত এখানে আসিয়া থাকেন, সেই দেবের শ্রীমন্দিরে সিদ্ধি, গাঁজা, রক্তচন্দন, আতপ-তণ্ডুল, দুগ্ধ, ধুতুরা ফল ও ফুল, গঙ্গাজল ইত্যাদি আরও সাধ্যমত স্বর্ণ বা রৌপ্যের বিল্বপত্র থাকিলে এই সমস্ত পূজার দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহপূর্ব্বক লিঙ্গরাজকে ভক্তিসহকারে পূজার্চ্চনা করিয়া তুষ্ট করিতে হয়। শেষ স্বহস্তে দেব অঙ্গ স্পর্শ ও সহস্র বিল্বপত্র দ্বারা সঙ্কল্প করিয়া দেবাদিদেবকে ভক্তিদান করা কর্ত্তব্য—কেন না বিল্বপত্রে এই দেব যত সন্তুষ্ট হন, জগতের অপর কোন দ্রব্যে তাঁহাকে এত অধিক তুষ্ট করিতে পারা যায় না। এই তীর্থ স্থানটী কর্ম্মনাশা নামক নদীর উপরিভাগে অবস্থিত। বলা-বাহুল্য, কর্ম্মনাশা নদীর জলে কোন দেবদেবীর পূজা হয় না; কারণ কথিত আছে, ঐ নদীটা লঙ্কেশ্বর রাজা দশাননের প্রস্রাব হইতে উৎ-পন্ন। শিবগঙ্গা নামে এখানে যে নদী আছে, উহাই কর্ম্মনাশা নামে খ্যাত।

যে নদী রাবণের প্রস্রাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই অন্তজ নদীতে সঙ্কল্প করিবার কারণ প্রকাশিত হইল;—

রাজা দশানন ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হইলে একদা পুষ্পক রথে আরোহণপূর্ব্বক দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন, পথিমধ্যে কৈলাস পর্ব্বতের নিকটস্থ হইয়া তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "ভূতনাথ মহেশ্বরকে কিরূপে তুষ্ট করিব," তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই আমার সকল আশা পূর্ণ হয়। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া রাজা

রের তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। এইরূপে বহুকাল তপস্যায় ত থাকিয়া যখন তাঁহার কামনা সিদ্ধ হইল না দেখিলেন, তখন স্তব তি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে কোন ফলোদয় না দেখিয়া বশেষে নানাবিধ সুগন্ধ পুষ্প দ্বারা তাঁহার পূজার্চ্চনা করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু ভাগ্যক্রমে তিনি কোনরূপেই তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলেন না; ফলতঃ তাঁহার হৃদয় সর্ব্বস্ব একমাত্র ব্রহ্মাকে স্মরণপূর্ব্বক দুঃখে ও অভিমানে হতাশপ্রাণে—যে গিরিতে ভগবান অবস্থান করিতেছিলেন, সেই গিরিরাজকে বাহুবেষ্টিত করিয়া কম্পান্বিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঠিক এই সময় এক আকাশবাণী শ্রুত হইল, "রাজন! তোমার সকল চেষ্টাই বৃথা হইবে, ভক্তিপূর্ব্বক সহস্র বিল্বপত্র দ্বারা আশুতোষের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে।"

লঙ্কেশ্বর ঐ দৈববাণী অনুসারে সহস্র বিল্বপত্র দ্বারা ভোলানাথের অর্চ্চনায় রত হইলেন। তখন ভগবান মহেশ্বর তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া প্রসন্নমনে রাবণের সম্মুখে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক মধুর বচনে বলিলেন, "দশানন! তোমার স্তবে আমি তুষ্ট হইয়াছি, আর তপস্যায় প্রয়োজন নাই, এক্ষণে অভিলাষত বর প্রার্থনা কর।"

রাজা দশানন সেই পূর্ণকান্তি তেজোময় মহাপুরুষকে সম্মুখে দর্শন করিয়া করযোড়ে গদ্গদস্বরে স্তবস্তুতি করিতে করিতে বলিলেন, "দেব! আপনি লিঙ্গসমূহের মধ্যে সর্ব্বপ্রদ বিশ্বেশ্বর! অন্তর্যামিন! কৃপা করিয়া যদি সদয় হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আশ্রিতজনকে এই বর প্রদান করুন, যেন সহজে আমি আপনাকে স্বীয় আবাসে লিঙ্গরূপে স্থাপনা করিতে সক্ষম হই এবং তথায় আপনাকে পুরী রক্ষার ভারার্পণ করিয়া সকল বিঘ্ন হইতে পরিত্রাণ পাই।"

ভক্তবৎসল ভগবান রাজার করুণ প্রার্থনায় এই চুক্তিতে সম্মত হইলেন যে, "যদি তুমি সরাসর এখান হইতে আমার স্কন্ধে করিয়া নিজ পুরে লইয়া যাইতে পার, তাহা হইলে তোমার বাসনা পূর্ণ করিব। কিন্তু পথিমধ্যে যদি কোন স্থানে চুক্তি ভঙ্গ কর, তাহা হইলে ঐ স্থান হইতে আমি আর এক পদও অগ্রসর হইব না।"

লঙ্কেশ্বর মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, আজ আমার সৌভাগ্যের সীমা নাই, কারণ যাঁহাকে কত শত বৎসর কত মহা ঋষি তপস্যাপূর্ব্বক সন্তুষ্ট করিতে সক্ষম হন না, আজ আমি অক্লেশে সেই দেবাদিদেব মহেশ্বরের দর্শন লাভ করিলাম। ব্রহ্মা ও মহেশ এই উভয় দেবের কৃপায় আমি এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে ত্রিভুবন জয় করিতে সমর্থ হইব, সন্দেহ নাই। এই সকল চিন্তা করিয়া গর্ব্বিত রাবণ তাঁহারই চুক্তিতে সম্মত হইলেন এবং নিজ স্কন্ধে ভগবানকে স্থাপন করতঃ স্বীয় পুরাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এদিকে দেবগণ এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া মহা চিন্তান্বিত হইলেন, সুতরাং সকলে পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিলেন, বরুণদেবের সাহায্য ব্যতীত ইহার অন্য গতি নাই। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া দেবগণ বরুণকে মধুর বচনে বলিলেন, "দেব! তুমি সত্বর দশাননের উদর মধ্যে বায়ুরূপে প্রবেশ কর এবং নিজ প্রভাবে তাহাকে বিচলিত করিয়া আমাদিগকে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার কর।"

দেবগণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বরুণ মুহূর্ত্ত মধ্যে দশাননের উদরের ভিতর মায়াপ্রভাবে প্রবিষ্ট হইয়া রাবণকে অস্থির করিলেন। লঙ্কেশ্বর দেহচক্র ভেদ করিতে না পারিয়া সহসা প্রস্রাব পীড়ায় কাতর হইয়া পূর্ব্ব অঙ্গীকার বিস্মৃত হইলেন এবং চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবার সময় নিকটেই এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন, পাঠক মহোদয়-

গণ স্থির জানিবেন—এই ব্রাহ্মণ অপর কেহই নয়, তিনি ছদ্মবেশধারী একজন দেবতামাত্র। রাবণ তাঁহাকে সম্মুখে পাইয়া অতি অল্প সময়ের জন্য তাঁহার স্কন্ধস্থিত ভগবানকে বৃদ্ধের মস্তকে স্থাপন করিতে অনুরোধ করিলেন, ব্রাহ্মণ তাঁহার মিনতিতে এই চুক্তিতে স্বীকৃত হইলেন যে, যদি তিনি অল্প সময়ের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন না করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি তাঁহার দেবতাকে ভূমে স্থাপিত করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিবেন; কেন না, তিনি বার্দ্ধক্যবশতঃ শক্তিহীন হইয়াছেন। রাজা দশানন তখন প্রস্রাব পীড়ায় এত কাতর হইয়াছিলেন যে, তিনি কাল-বিলম্ব না করিয়া বৃদ্ধের প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন এবং তাঁহার আরাধ্য-দেবকে উক্ত ব্রাহ্মণের মস্তকে রাখিয়া যথাস্থানে গমন করিলেন।

মলমূত্র ত্যাগের নিয়ম—গ্রামে বা বাসস্থানে দেড় শত হস্ত দূরে এবং নগরে তাহার চতুর্গুণ দূরে নৈঋতকোণে মলমূত্র ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। দিবাভাগে ও সন্ধ্যাদ্বয়ে উত্তরাস্যে এবং রাত্রিতে দক্ষিণাস্যে মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক মলমূত্র ত্যাগ করিতে হয়। পাদুকা পরিধান করিয়া জলপাত্র স্পর্শনপূর্ব্বক প্রাণীসংশ্লিষ্ট পদার্থোপরি উপ-বেশন করিয়া, দণ্ডায়মান হইয়া কিম্বা চলিতে চলিতে মলমূত্র ত্যাগ করিতে নাই; এইরূপ আবার—পথে, ঘাটে, গোষ্ঠে, কৃষ্টভূমিতে, চিতাতে, ভস্মোপরি, দেবালয়ে, বল্মীকে, জলে এবং পূজ্য পদার্থের অভিমুখীন হইয়া মলমূত্র ত্যাগ করিতে নাই।

এদিকে বরুণদেবের প্রভাবে তাঁহার প্রস্রাব আর শেষ হয় না, এমন কি রাবণের প্রস্রাবের স্রোতে নদী প্রস্তুত হইয়া তাহাতে ঢেউ খেলিতে লাগিল, তথাপি উহার বিরাম নাই। বৃদ্ধ সুযোগ পাইয়া বার-ম্বার তাঁহাকে ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন, তাঁহার বাক্য দশাননের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলেও তিনি অচৈতন্য অবস্থায় প্রস্রাব-সুখ অনুভব

করিতে লাগিলেন, ইত্যবসরে বৃদ্ধ দেবকার্য্যসাধনের উপযুক্ত সময় পাইয়া রাবণের সম্মতিক্রমে ঐ স্থানে তাঁহার দেবতাকে স্থাপন করিয়া অদৃশ্য হইলেন। এইরূপে দশানন বহু সময় অপব্যয় করিয়া নিজের ধৃষ্টতা বুঝিতে পারিলেন, সুতরাং ত্রুটি মার্জ্জনার নিমিত্ত শিব স্থানে উপস্থিত হইয়া যুক্ত করে ভগবানের স্তব করিতে করিতে বলিলেন, "দেব! আপনি যজ্ঞসমূহের মধ্যে অশ্বমেধ, দানের মধ্যে অভয়দান, লাভের মধ্যে পুত্রলাভ, ঋতুসমূহের মধ্যে বসন্ত ঋতু, যুগ সমূহের মধ্যে সত্যযুগ, তিথি সমূহের মধ্যে অমাবস্যা, নক্ষত্রবৃন্দের মধ্যে পুষ্যা, পর্ব্ব সমূহের মধ্যে সংক্রান্তি, এক্ষণে নিজগুণে কৃপা করিয়া অধীনের প্রতি সদয় হন।"

ভগবান মহেশ্বর তখন জলদগম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, "দশানন! তুমি পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর। আমি এই স্থান হইতে আর একপদও অগ্রসর হইব না, যদি আমার উপদেশ অমান্য কর, তাহা হইলে তোমার সকল চেষ্টাই বিফল হইবে।"

রাবণ রাজা তথাপি বিবিধ প্রকার চেষ্টা করিবার পর যখন নিরাশ হইয়া লিঙ্গরাজকে উঠাইতে সম্মত করিতে পারিলেন না, তখন মর্ম্মাহত হইয়া ঐ শিবলিঙ্গের মস্তকোপরি এক বজ্র মুষ্টাঘাত পূর্ব্বক এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন, "যদি একান্ত না যাইবেন, তবে এই জঙ্গলাবৃত স্থানে অনাহারে অবস্থান করুন।" যাত্রীগণ এই তীর্থে আসিয়া অদ্যাপি লিঙ্গরাজের মস্তকে যে ক্ষত চিহ্ন দেখিতে পান, উহাই দশাননের মুষ্টাঘাতের চিহ্ন বলিয়া কথিত।

ভক্তগণ যে হ্রদে সঙ্কল্প করেন, সাধারণে উহাকে রাবণের প্রস্রাব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, বস্তুতঃ ইহা তাহা নহে—সাক্ষাৎ বরুণদেব দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য সলিলরূপে এখানে অবস্থান করিতেছেন। তিনি মায়াপ্রভাবে প্রস্রাবরূপে রাবণের উদর হইতে বহির্গত

হইয়াছিলেন বলিয়া এই জল কোন দেবকার্য্যে ব্যবহার হয় না। সে যাহা হউক, রাবণ কর্ত্তৃক ভগবান কৈলাসপতি এইরূপে মর্ত্ত্যধামে উপস্থিত হইয়া ভক্তগণকে দর্শনদানে উদ্ধার করিতেছেন।

বহুকাল হইতে এক সাধু পুরুষ ঐ জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে বসিয়া ভগবান মহেশ্বরেরই শ্রীচরণ ধ্যান করিতেছিলেন, এই অবসরে ভগবান তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া নিজ আগমনবার্ত্তা প্রকাশ করিলেন। যে সাধু পুরুষ মহেশ্বরের দর্শন-আশে এতাবৎকাল তপস্যা করিতেছিলেন, এক্ষণে সৌভাগ্যক্রমে সেই দেবের সাক্ষাৎ প্রাপ্তে আনন্দে অধীর হইলেন এবং দিবারাত্র তাঁহার পূজার্চ্চনায় রত থাকিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে জনসমাজে মহেশ্বরের আগমনবার্ত্তা প্রচারিত হইলে এক ধর্ম্মাত্মা নিজ ব্যয়ে ভগবানের মন্দির ও সন্নিকটস্থ মন্দিরসমূহ নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে দেবতাদিগকে প্রতিষ্ঠা, এবং নিত্য পূজার সুবন্দোবস্ত করিয়া আপন কীর্ত্তি স্থাপন করেন। শিবচতুর্দ্দশীর রাত্রিতে এখানে এত জনতা হয় যে, ঐ সময় এখানে এক মহামেলায় পরিণত হয়। এ তীর্থে—প্রভুর ঢাকিকে সাধ্যমত কিছু দানে সন্তুষ্ট করিতে হয় এবং স্থানীয় নিয়ম সকল সমাপনান্তে দক্ষিণাসহ ব্রাহ্মণ ভোজন, শেষে স্বীয় পাণ্ডার নিকট সুফল লইয়া ইচ্ছামত স্থানে যাত্রা করিতে হয়।

এখানকার এই মন্দির স্থান হইতে পূর্ব্বদিকে—প্রায় তিন ক্রোশ দূরে তপোবন বা পঞ্চকূট নামে একটী বন আছে। পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বনবাসকালে এই পঞ্চকূট বনে সীতাদেবী ও লক্ষ্মণসহ কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। অদ্যাপি যাত্রীগণ এই পবিত্র স্থানে আসিয়া পাষাণময় সেই পবিত্র মূর্ত্তিত্রয়ের দর্শন করিয়া নয়ন ও জীবন সার্থকবোধ করিয়া থাকেন। তপোবনের চতুর্দ্দিকের পাহাড়বেষ্টিত

প্রাকৃতিক শোভা এবং ভগবানের সদলে সেতু পার হইয়া আশ্র
প্রবেশের দৃশ্য অবলোকন করিলে ভক্তমাত্রেরই এক স্বর্গীয় ভা
উদয় হইতে থাকে। এইরূপে এখানকার শোভা দর্শন করিয়া আম
গয়াধামে গদাধরের পাদপদ্ম দর্শনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলাম।

সহর কলিকাতা হইতে দূর-দেশস্থ তীর্থ স্থানে ট্রেণের সাহায্য ভিন্ন গমনাগমনের সুবিধা নাই। আরোহীদিগের সুবিধার্থে এই স্থানে এই কারণে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানীর কয়েকটী প্রয়োজনীয় নিয়ম লিপিবদ্ধ হইল ;—

সময়—সকল ষ্টেশনেই ষ্টাণ্ডার্ড সময়ানুরূপ সময় ধরা হয় ও তদনুসারে ঘড়ি মেলান থাকে। উক্ত সময় কলিকাতার সময়াপেক্ষা ২৪ মিনিট কম, এলাহাবাদের অপেক্ষা ২ মিনিট ও দিল্লীর অপেক্ষা ২২ মিনিট, আগ্রার অপেক্ষা ১৯ মিনিট, বোম্বে অপেক্ষা ৩৯ মিনিট ও মান্দ্রাজ অপেক্ষা ৯ মিনিট বেশী পরিলক্ষিত হয়।

ভাড়া—প্রথম শ্রেণীর ভাড়া প্রতি মাইল ⁄১০ হিসাবে ৩০০ শত মাইল পর্য্যন্ত, তদূর্দ্ধে প্রতি অতিরিক্ত মাইল ⁄০ হিঃ ধার্য্য আছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া—প্রথম শ্রেণীর ভাড়ার ঠিক অর্দ্ধেক।

মধ্যম শ্রেণীর ভাড়া—প্রথম ৩০০ শত মাইল পর্য্যন্ত ইংরাজী ৩॥ সাড়ে তিন পাই হিঃ, তদতিরিক্ত প্রতি মাইল ইংরাজী ৩ পাই হিঃ দিতে হয়।

তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া—প্রথম ১০০ শত মাইল পর্য্যন্ত ইংরাজী ২॥ আড়াই পাই হিঃ, তদতিরিক্ত ৩০০ শত মাইল পর্য্যন্ত প্রতি মাইল ইংরাজী দুই পাই, এইরূপ আবার ৩০০ শত মাইলের উর্দ্ধ হইলে প্রতি মাইল ইংরাজী ১॥ দেড় পাই হিসাবে প্রত্যেক যাত্রীকে দিতে হয়।

হাওড়া হইতে যে মেলট্রেণ কর্ড লাইন দিয়া যাত্রা করে, তাহাতে বর্দ্ধমানের মধ্যবর্ত্তী কোন ষ্টেশনের তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট দেওয়া হয় না।

যাতায়াত (রিটরণ) টিকিটের মূল্য সাধারণ একবারের ভাড়ার

উপর তিন ভাগের এক ভাগ বেশী। বলাবাহুল্য যে, তৃতীয় শ্রেণী রিটরণ টিকিট দেওয়া হয় না।

কন্‌সেসন টিকিট—হাওড়া হইতে ১৫ মাইলের অধিক দূর যদি শুক্রবারের মধ্যাহ্নে টিকিট খরিদ করিয়া সোমবার রাত্রি ১২টার মধ্যে ফিরিতে পারেন, তাহা হইলে সকল শ্রেণীতেই কম ভাড়ায় যাতায়াত হয়। এইরূপ যাতায়াত টিকিটের নাম "উইক-য়েণ্ড-টিকিট"। এই টিকিট আবার শনিবার খরিদ করিলে রবিবারে ফিরিয়া আসিতে পারা যায়। এই স্থানে একটী কথা বলিবার আছে—মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণী ভিন্ন এবং কোলিয়ারি ছাড়া প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় শ্রেণীর এরূপ কনসেসন টিকিট পাওয়া যায় না।

অর্ডিনারী রিটরণ (যাতায়াতের) টিকিট—পঁচিশ মাইলের ন্যূন হইলে দুদিনের মধ্যে ১০০ শত মাইলের ন্যূন দূর হইলে ৪ দিনের মধ্যে, ৩০০ মাইলের ন্যূন দূর হইলে ৬ দিনের মধ্যে, ৪৫০ মাইলের ন্যূন দূর হইলে ১২ দিনের মধ্যে, ৭৫০ মাইলের ন্যূন দূর হইলে ১৫ দিন, তদূর্দ্ধে ১৮ দিনের মধ্যে ফিরিতে পারা যায়। রিটারণ টিকিট ক্রেতা ভিন্ন অপর কেহ ব্যবহার করিতে পারেন না, এমন কি উহার ক্রয় বিক্রয়ও দণ্ডনীয়।

(Break journey) বা দূরের টিকিট লইয়া মধ্যে নামিয়া বিশ্রামপূর্ব্বক অপর ট্রেণে যাওয়া যায়। (Single journey) বা একবার যাইবার টিকিটে প্রত্যেক এক শত মাইলে একদিন করিয়া বিশ্রামের সময় পাওয়া যায়। যে স্থানে ইচ্ছা ট্রেণ হইতে নামিতে ও থাকিতে পারা যায়, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ের বেশী বিলম্ব হইতে পারে না, কেবলমাত্র গয়া যাত্রীরা স্নানার্থে পুনপুনে বা পামারগঞ্জ নামক ষ্টেশনে ২৪ ঘণ্টা বিলম্ব করিতে পারেন।

আরোহীরা আবেদন করিলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহী-দিগকে গার্ড সাহেব নিদ্রা হইতে জাগাইয়া দিতে পারেন।

টিকিট খরিদ করিয়া স্থানাভাব অথবা বিশেষ কারণবশতঃ যদি কেহ সেই ট্রেণে যাইতে না পারেন, তাহা হইলে ষ্টেশন মাষ্টারকে জানাইলে তিনি তাহার টিকিট ফেরৎ লইয়া মূল্য ফেরৎ দেন। যদি স্থানাভাব বশতঃ উচ্চ শ্রেণীর টিকিট লইয়া নিম্ন শ্রেণীর গাড়ীতে যাইতে বাধ্য হইতে হয়, তাহা হইলে ট্রেণ ছাড়িবার পূর্ব্বে সেই ট্রেণের গার্ডকে জানাইলে, তাহার রিপোর্ট অনুযায়ী নামিবার সময় ঐ শ্রেণীর ভাড়া বাদে বাকি দাম ফেরৎ পাওয়া যায়। উপরোক্ত কারণ ব্যতীত বিশেষ কোন কারণের জন্য যদি সিঙ্গেল (single) টিকিট ফেরৎ দেওয়া হয়, তবে ন্যায্য দামের উপর শত করা ১০৲ টাকা বাদ যায়।

বিনা টিকিটে রেলগাড়ীতে গমনাগমন নিষিদ্ধ। রেলওয়ে কোম্পানীর নিয়মানুসারে পথিমধ্যে যদি কোন টিকিট চেকার বা টিকিট কলেক্টর বা ফ্লাইংচেকার কোন আরোহীর টিকিট দেখিবার আবশ্যক বিবেচনা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে তাহার টিকিটখানি দেখাইতে হয়, কিন্তু যদ্যপি তিনি উহা না দেখাইতে পারেন, তবে কোম্পানীর নিয়মানুসারে তাহাকে প্রথম যে স্থান হইতে ট্রেণখানি ছাড়া হইয়াছে, সেই নির্দ্দিষ্ট স্থান কিম্বা পূর্ব্ববর্ত্তী টিকিট পরীক্ষা করিবার ষ্টেশন হইতে পূর্ণ ভাড়া ধরিয়া দিতে হয় এবং প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কিছু অর্থ দণ্ডও দিতে হয়; এইরূপ আবার যদি কেহ টিকিট দেখাইতে না পারেন, কিম্বা প্রদত্ত ভাড়া ব্যতীত উচ্চ শ্রেণীর কামরাতে ভ্রমণ করেন, তাহা হইলে তাহাকে প্রথম শ্রেণীতে ৬৲, দ্বিতীয় কিম্বা মধ্যম শ্রেণীতে ৩৲ এবং তৃতীয় শ্রেণীর নিমিত্ত ১৲ ন্যায্য ভাড়া বাদে জরিমানা দিতে হয়। যদি দৈবাৎ উপরোক্ত কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটে, তখন

আরোহীমাত্রেরই তৎক্ষণাৎ উক্ত ট্রেণের গার্ড কিম্বা স্থানীয় ষ্টেশন মাষ্টারকে জানাইতে হয়, অধিকন্তু তিনি যে কোন কুঅভিপ্রায়ে রেল কোম্পানীকে ফাঁকী দিতেছেন না, তৎসঙ্গে উহাও প্রমাণ করাইতে হয়—ইহার ফলে রেলওয়ে কোম্পানীর ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ইচ্ছা করিলে জরিমানার টাকা ছাড়িয়া দিতে পারেন কিম্বা সামান্যমাত্র দণ্ডও করিতে পারেন, ইহা তাঁহার ইচ্ছাধীন।

এক শ্রেণীর টিকিট খরিদ করিয়া তাহার উপরের শ্রেণীর সহিত বদল করা যাইতে পারে, যদি অবশিষ্ট অতিরিক্ত ভাড়া ধরিয়া দেওয়া যায়।

রিজার্ভ একমোডেসন—হাওড়া হইতে আসানসোল, গয়া, মোগলসরাই, দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর, টুণ্ডলা, দিল্লী, আম্বালা, হাতরস কিম্বা কালকা প্রভৃতির গাড়ী ছাড়িবার ৪৮ ঘণ্টা পূর্ব্বে ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট আবেদন করিলে যে কোন শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ পাওয়া যায়, কিন্তু মেলা সময় কিম্বা বিশেষ কারণবশতঃ যাত্রীসমাগম অধিক হইলে অর্থাৎ ট্রেণে স্থানাভাব হইলে এরূপ রিজার্ভ কামরা ভাড়া পাওয়া যায় না।

রিজার্ভ গাড়ীতে ৩ বৎসরের কম বয়স্ক বালক বালিকাদিগের ভাড়া লাগে না, তদুপরি ১২ বৎসর পর্য্যন্ত অর্দ্ধ মূল্য দিতে হয়।

ফ্যামিলী ক্যারেজ—ছয়জন প্রথম শ্রেণীর যাত্রী এবং ৪ জন ভৃত্যের বসিবার স্থান ও স্নানাগারসহ প্রত্যেক প্রথম শ্রেণীর পারিবারিক গাড়ীর জন্য ৭ জনের পুরা প্রথম শ্রেণীর ভাড়া দিতে হয়। সাধারণ প্রথম শ্রেণীতে সমস্ত গাড়ীর জন্য ৮ জনের ও এক কামরার জন্য ৪ জনের এবং সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর সমস্ত গাড়ীর জন্য ১০ জনের ও এক কামরার নিমিত্ত ৫ জনের ভাড়া দিতে হয়; এইরূপ আবার

্রত্যেক মধ্যবর্ত্তী ও তৃতীয় শ্রেণীর এক কামরার জন্ম ৮ জনের সম্পূর্ণ ভাড়া দিতে হয়।

আজকাল যাত্রীদিগের সুবিধার্থে রেলওয়ে কোম্পানী তৃতীয় শ্রেণীতে উপরোক্ত নিয়ম ব্যতীত "বগীক্যারেজ" নামে এক প্রকার ১৬ জন বসিবার কামরা প্রস্তুত করিয়াছেন, ইহারই মধ্যে একটী পাইখানা আছে। এইরূপ একখানি বগীক্যারেজ ১৩ জনের পূর্ণ ভাড়া দিলেই রিজার্ভ পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য,যদি কোন যাত্রীর দল মধ্যে ১৩ জনের পরিবর্ত্তে ১৪।১৫ জন লোক থাকেন, আর যদি তিনি ঐ রিজার্ভ কামরার মধ্যে তাহাদিগকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তবে উক্ত ১৩ জন বাদে বেশী আরোহীর পৃথক্ টিকিট খরিদ করিতে হয়।

রেল কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের অমনোযোগীতা অথবা অভদ্র ব্যবহার দেখিলে ট্রাফিক ম্যানেজার কিম্বা ডিষ্ট্রীক্ট ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে জানাইলে উহার প্রতীকার হয়।

যদি কোন যাত্রী রেল কোম্পানীকে প্রতারণা করিবার অভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক টিকিটের তারিখ কিম্বা নম্বর বদল বা কোন প্রকারে অস্পষ্ট করেন, উহা প্রমাণ হইলে তাহার ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারে।

চলন্ত ট্রেণে যদি কেহ উহার দরজা খুলিয়া দেয়, অথবা উঠা নামা করিবার চেষ্টা করে, তাহার ২০৲ পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারে।

গাড়ীর মধ্যে যদি কেহ সহযাত্রীগণকে বিরক্ত করেন, কিম্বা কামরার ভিতরকার আলো নিবাইয়া দেন, অথবা যাহাতে অপরাপর আরোহীগণের শান্তি ভঙ্গ হয়, এরূপ প্রমাণ হইলে তাহার ২০৲ টাকা, কিন্তু মাতলামী করিলে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারে।

যদি কেহ বিশেষ কারণ ব্যতীত স্ত্রীলোকদিগের কামরাতে বা

ষ্টেশনে স্ত্রীলোকদিগের বিশ্রাম গৃহে অনধিকার প্রবেশ করেন, তাহা হইলে কোম্পানীর আইনানুসারে তাহার এক শত টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হয়, বেশীর ভাগ রেলকর্ম্মচারী তাহাকে তথা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।

যে কামরায় পুরা লোক হইয়াছে, জোরপূর্ব্বক তথায় থাকা অথবা যে ঘরে কম লোক আছে, সেখানে কোন আরোহীকে প্রবেশ করিতে বাধা দেওয়া, উভয় পক্ষেই ২০৲ টাকা জরিমানা হইতে পারে, এইরূপ আবার "রিজার্ভ" করা গাড়ীতে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিলে উক্ত দণ্ড হইয়া থাকে।

রেল কোম্পানীর আদেশ মত তিন বৎসরের ন্যূন বয়স্ক শিশুদিগের ভাড়া লাগে না এবং দ্বাদশ বৎসরের ন্যূন হইলে তাহার অৰ্দ্ধেক ভাড়া দিতে হয়।

ট্রেণের কামরাতে স্থান না থাকায় যদি কেহ উঠিতে না পারেন, তাহা হইলে তিন ঘণ্টার মধ্যে ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট আবেদন করিলে উক্ত টিকিটের মূল্য ফেরৎ পাওয়া যায়।

যদি কেহ সংক্রামক রোগাক্রান্ত হইয়া ষ্টেশন মাষ্টারেরর বিনানুমতিতে ট্রেণে আরোহণ করেন, তাহা হইলে তাহার ২০৲ টাকা অর্থ দণ্ড হয়, এবং তাহাকে গাড়ী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়, বেশীর ভাগ তাহার প্রদত্ত টিকিটের মূল্য ফেরৎ দেওয়া হয় না।

ট্রেণের প্রতি কামরাতে যে সঙ্কেতসূচক সিকল আছে, তাহার অপব্যয় করিলে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারে।

রেল কোম্পানীর কোন কর্ম্মচারীর কর্ম্মে যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক বাধা দেয়,তাহা হইলে তাহার ১০০৲ শত টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কলিকাতার উন্নতিকল্পে (Calcutta Improvement Scheme) গভর্ণমেণ্ট হাউস হইতে ৩০ মাইলের দূরবর্ত্তী ষ্টেশনগুলিতে যাতায়াত নিমিত্ত প্রতিবার প্রতি যাত্রীর নিকট ৵১০ হিঃ আদায় হইয়া থাকে। ই, আই ও বি, এন্, রেলওয়ের নিম্নলিখিত ষ্টেশনে যাতায়াতের উক্ত ৵১০ পয়সা দিতে হয় না।

(ক) ই-আই-আরের মেন লাইনে তাণ্ডুলা পর্য্যন্ত।

(খ) নৈহাটী এবং তারকেশ্বর শাখা লাইনের ষ্টেশন সকল।

(গ) বি-পি-রেলওয়ের ত্রিবেণী, সুলতানগাছা, হালুসাই, মহানদ, হারবাসিনী, গোয়াই-আমরা, রুদ্রানী ও তারকেশ্বর।

(ঘ) বি, এন, রেলে—হাওড়া হইতে দিউলতি পর্য্যন্ত।

(ঙ) ই-বি-রেলওয়ের ইষ্টারণ সেক্সনে—কাঁচড়াপাড়া পর্য্যন্ত, সেণ্ট্রাল সেক্সনে—শিয়ালদহ হইতে হাওড়া পর্য্যন্ত এবং নৈহাটী হইয়া তালাণ্ডু পর্য্যন্ত। বলাবাহুল্য, তিন হইতে বার বৎসর পর্য্যন্ত ছেলে-দের অর্দ্ধেক ট্যাক্স দিতে হয়।

লগেজ বা মালের ভাড়ার নিয়মাবলী

লগেজ—প্রথম শ্রেণীর আরোহীরা ১॥০ মণ, দ্বিতীয় শ্রেণীর ৸০ ত্রিশ সের, মধ্যম শ্রেণীর ॥/০ অর্দ্ধ মণ, তৃতীয় শ্রেণীর ।৫ সের পর্য্যন্ত লগেজ বিনা মাশুলে ট্রেণে লইয়া যাইতে পারেন, তৎপরে মধ্য ও তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীদিগের ॥/ মণ পর্য্যন্ত মালের ভাড়া প্রতি ১৫ মাইল পর্য্যন্ত /০ আনা, তদূর্দ্ধে ২৫ মাইল পর্য্যন্ত ৵০ আনা, অর্দ্ধ মণের উপর ১/ মণ পর্য্যন্ত প্রতি ১৫ মাইল ৵০ আনা, তদূর্দ্ধে ২৫ মাইল পর্য্যন্ত ।০ ,

আনা, এক মণের উপর প্রতি ॥/ মণ প্রতি মাইলে আধ পয়সা, ৫০ মাইল অবধি /৫ সের বা এক ফিউবিক ফুট ।০ আনা, দশ সের বা দুই কিউবিক ফিটে ।/০ আনা, অতিরিক্ত প্রতি /৫ সের /০ আনা, ৫০ মাইলের উর্দ্ধে প্রতি ৫০ মাইলের ভাড়া চারি আনা হিসাবে ধার্য্য আছে।

(১) ছেলেদের অর্দ্ধ মাশুলের টিকিট উক্ত অর্দ্ধ হার বাদ পাওয়া যায়।

(২) লগেজ ভাড়া অগ্রিম দিতে হয়।

(৩) আরোহীর সহিত বিড়াল, খরগোস, পক্ষী প্রভৃতি থাকিলে পার্শেলের হিসাবে ভাড়া লাগে।

(৪) দূরের যাত্রীরা যে যে ষ্টেশনে নামিবেন, একেবারে সেই সেই ষ্টেশনে লগেজ পাঠাইতে পারেন। তাহাদের টিকিটানুসারে যে কয় দিবস থাকিতে পারেন,মাল রাখিয়া পরে প্রতিদিন অথবা আংশিক দিনে প্রতি লগেজ ।০ আনা হিসাবে ভাড়া দিতে হয়।

(৫) দূরের যাত্রীরা নামিয়া যদি কোন মধ্যম ষ্টেশনে তাহাদের লগেজ আবশ্যক বিবেচনা করেন, তাহা হইলে উক্ত লগেজটী বুক করিবার সময় ষ্টেশন মাষ্টার কিম্বা লগেজ ক্লার্ককে বলিবেন, নচেৎ প্রত্যেক দূরের লগেজ গাড়ীতে চাবি বন্ধ থাকে, হঠাৎ পাইবার কোন আশা নাই।

(৬) যে সমস্ত লগেজের ভাড়া দেওয়া হয়, তাহা স্বতন্ত্রভাবে ব্রেকভ্যানে পাঠান হয়, সুতরাং যাহা এলাউন্স বা বিনা মূল্যে লইয়া যাওয়া যায়, উহা সঙ্গে লওয়াই সুবিধা বিবেচনা করিবেন।

পার্শেলের ভাড়া দিবার নিয়ম

যদি কোন পার্শেল ভাঙ্গিবার বা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা না থাকে, অথবা কোন বিপদজনক দ্রব্য উক্ত পার্শেলে না থাকে, তাহা হইলে ভাড়া অগ্রিম দেওয়া না দেওয়া গ্রাহকের সুবিধার উপর নির্ভর করে।

ডেমারেজ—ই-আই-রেলের কোন ষ্টেশনে পার্শেল পৌছিলে উক্ত তারিখ বাদে ৭ দিন ষ্টেশনে পড়িয়া থাকিতে পারে, তৎপরে প্রতি প্যাকেজে প্রথম দিনের অথবা আংশিক সময়ের জন্য ৵০ আনা, তাহার পর ।০ হিসাবে ডেমারেজ দিতে হয়।

অনুক্লেম—যে ষ্টেশন হইতে মাল পাঠান যায়, যদি কেহ এক মাসের মধ্যে উহা ডিলিভারি না লন, তাহা হইলে কোম্পানীর নিয়মানুসারে উহা হাওড়া বা এলাহাবাদে চালান দেওয়া হয়। তথা হইতে তিন মাস পরে উহা প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইয়া থাকে। যাহার মাল এরূপ অবস্থায় তিন মাস পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকে, আর মালিক যদি এই তিন মাস মধ্যে উহা লইতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহাকে প্রতি মাসে বা কম দিনের জন্যও প্রতি প্যাকেজে ।০ আনা হিসাবে স্বতন্ত্র ভাড়া দিতে হয়।

পার্শেল অথবা লগেজ হারাইলে কিম্বা কোন প্রকারে নষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ ষ্টেশনের কেরাণীকে জানাইতে হয় এবং কোন্ জিনিস হারাইল বা কি ক্ষতি হইল, তাহার বিশেষ বিবরণ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ডিষ্ট্রীক্ট ট্রাফিক সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে অথবা কলিকাতায় জেনারেল ট্রাফিক ম্যানেজারকে লেখা আবশ্যক, নচেৎ রেল কোম্পানী দায়ী হন না।

সহর কলিকাতাবাসী—দূরস্থ তীর্থ স্থানে উপস্থিত হইয়া স্থানীয়

ঘড়ির সহিত নিজের ভাল ঘড়িটীর সময় মিলাইবার কালে চমৎকৃত হইয়া থাকেন এবং মনে মনে স্থির করেন যে তাঁহার নিজের ঘড়ীটী ট্রেণে উঠা নামার জন্য খারাপ হইয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। ভ্রমণকারীদিগের বিবেচনা করা উচিত—দেশান্তর ভেদে লোকের আচার-ব্যবহার যেরূপ বিভিন্নরূপ পরিলক্ষিত হয়, সময় ও সেইরূপ ভিন্ন ভাব ধারণ করে, তাঁহাদের সুবিধার্থে আমার ভ্রমণ-কাহিনীর লিখিত নিম্নে কয়েকটী স্থানের সময় তালিকা প্রদত্ত হইল।

কলিকাতা দিবা ইংরাজী ১২টার সময়ে অপর স্থানে যে সময় হয়, তাহাই লিখিত হইল ;—

স্থান				ঘণ্টা—মি—সে
কটক	...	...	...	১১—৫০—৪
কাঞ্চী	...	...	...	১১—২৪—২৪
গয়া	...	...	...	১১—৪৬—৩২
গৌহাটী	...	...	...	১২—১৩—৪৪
গাজীপুর	...	...	...	১১—৪০—৫৩
চট্টগ্রাম	...	...	...	১২—১৪—০
জয়পুর	...	...	...	১১—৯—৫২
তাঞ্জোর	...	...	...	১১—১২—২৪
ত্রিচিনাপলী	...	...	...	১১—২০—২৪
থানেশ্বর (কুরুক্ষেত্র)		...	...	১১—১৩—৫২
দিল্লী	...	...	...	১১—৫৩—২৪
দেওঘর	...	...	...	১১—১৫—৩২
দ্বারকা	...	...	...	১০—৪০—১৩
দার্জ্জিলিং ষ্টেশন	...	...	...	১১—৫৯—৪৫

পাটনা	…	…	…	১১—৪৭—২৪
পুরী	…	…	…	১১—৪৯—৫২
মান্দ্রাজ	…	…	…	১১—২৭—২৪
মথুরা	…	…	…	১১—১৭—২০
মহীশূর	…	…	…	১১—১৩—১২
রামেশ্বর	…	…	…	১১—২৩—১২
লক্ষ্ণৌ	…	…	…	১১—৩০—১৬
বর্দ্ধমান	…	…	…	১১—৫৮—০
বালেশ্বর	…	…	…	১১—৫৪—০
বাকীপুর	…	…	…	১১—৪৭—৮
বারাণসী	…	…	…	১১—৩৮—৪০
বোম্বাই	…	…	…	১০—৫৭—২৯
হরিদ্বার	…	…	…	১১—১৯—১২
সোমনাথ	…	…	…	১০—৫১—৩৮
অযোধ্যা	…	…	…	১১—৩৫—২৪
আগ্রা	…	…	…	১১—১৮—৩১

প্রকাশক

গয়া

কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলের গ্রাণ্ড কর্ড লাইনে গয়া যাত্রা করিলে পথিমধ্যে যাত্রীদিগকে আর কোথাও ট্রেণ বদল করিতে হয় না, নতুবা বাঁকিপুর জংশনে গাড়ী বদল করিয়া গয়া নামক ষ্টেশনে যাইতে হয়। বাঁকিপুর হইতে ২৮ ক্রোশ এবং হাওড়া হইতে ২৯২ মাইল দূরে গয়া ষ্টেশনটী অবস্থিত।

গ্রাণ্ড কর্ড লাইন প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে—তীর্থযাত্রীদিগকে কর্ড লাইন দিয়া প্রথমে বাঁকীপুর, তৎপরে পাটনা, তথা হইতে ভিন্ন ট্রেণে আরোহণ করিয়া গয়া যাইতে হইত। ইহাতে কত সময় এবং কত কষ্টভোগ করিতে হইত, উহা ভুক্তভোগীমাত্রেই অবগত আছেন।

বাঁকীপুর, পাটনা ও দানাপুর—এই কয়টী নগর পরস্পর সংলগ্ন। এই নিমিত্ত এই তিন স্থানকে একটী সহর বলা যাইতে পারে। বাঁকী-পুরের পশ্চিমাংশ, দানাপুর এবং পূর্ব্বাংশ পাটনা নামে প্রসিদ্ধ। এই পাটনা আবার দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—নূতন ও পুরাতন পাটনা। পাটনা সহরের আদি নাম পাটলিপুত্র। কথিত আছে, পাটলিপুত্রতে মগধের রাজগণ—মহারাজ নন্দ, পুরুরাজ চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি বংশানুসারে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই পাটলিপুত্র নামক স্থানেই মহারাজ নন্দ বংশের অভিনয় হয়; অর্থাৎ এই স্থানেই সুপ্রসিদ্ধ চাণক্য পণ্ডিত

তাঁহার রাজনীতিজ্ঞতার ও অধ্যবসায়তার পরিচয় প্রদান করিয়া মহারাজ নন্দের বিখ্যাত মন্ত্রীকে বাকযুদ্ধে পরাস্ত করেন। এক সময় এই স্থানে বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাব হয়, কালের কুটিলগতিতে আবার মুসলমান রাজত্বকালে সেকেন্দর সাহার আমলে এই পাটলিপুত্রই পাটনা নামে খ্যাত হইয়া বেহারের রাজধানীরূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছে; অধিকন্তু এই সময় হইতেই হিন্দু ও মুসলমান ভাষা এক হইয়া উর্দ্দু ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। কাহার কাহারও নিকট এই স্থানটী আজিমাবাদ নামে শুনিতে পাওয়া যায়।

পাটনা সহরের অনতিদূরে হাজিপুর নামে একটী বিখ্যাত স্থান আছে। কথিত আছে, পক্ষীরাজ মহাবীর গরুড় এই স্থান হইতে গজ-কচ্ছপকে শূন্যে লইয়া গিয়া বহু দূর নৈমিষারণ্যে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। এই হাজিপুরের সন্নিকট স্থানে যথায় সেই গজকচ্ছপের মহা যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাদের ঐ যুদ্ধক্ষেত্রটী এক্ষণে "হরিহরছত্র" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এখানে হরিহরদেবের পবিত্র মূর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া ভক্তদিগকে দর্শনদানে উদ্ধার করিতেছেন। প্রতি বৎসর এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে এই ছত্রে একটী মেলা হইয়া থাকে, সেই মেলা সময়—এখানে বিস্তর হাতী, উট, অশ্ব, বকরী প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ আনীত হয়।

গয়া—একটী জেলা মাত্র। এখানে ঘোড়ার বা এক্কা গাড়ী প্রচুর পরিমাণে ভাড়া পাওয়া যায়। সহরটী দুই ভাগে বিভক্ত, যথা সিটিগয়া ও সাহেবগঞ্জ। গয়া নামক ষ্টেশন হইতে গদাধরের পাদপদ্মের মন্দিরে পৌঁছিতে হইলে সাহেবগঞ্জের মধ্যপথ দিয়া যাত্রীদিগকে তিন মাইল পথ অগ্রসর হইতে হয়। কার্য্যোপলক্ষে অনেক বাঙ্গালীকে এখানে বাস করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার অধিকাংশ হিন্দু বসতি ফল্গু-তীরে, আর মুসলমানগণ—সাহেবগঞ্জ অঞ্চলেই বাস করিয়া থাকেন।

গয়ার লোক সংখ্যা অন্যূন এক লক্ষ। সাহেবগঞ্জ একটী জনপাদপূর্ণ পল্লী—এখানে হাট, বাজার, পুলিস, ষ্টেশন, হাঁসপাতাল এবং বিবিধ প্রকার পণ্য দ্রব্য সমস্তই পাওয়া যায়। গয়ার পাথরবাটি এবং তামাক চিরবিখ্যাত।

পূর্ব্বে এই গয়ায় বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাব ছিল, সুতরাং যে সকল দেবালয় ছিল, উহা তাঁহাদেরই আমলের—কিন্তু শাক্যমুনির ধর্ম্মের স্রোত অন্তর্হিত হইলে পর, গয়ালী ব্রাহ্মণদিগের ঐ সমস্ত দেবালয়গুলি অধিকারে আসে,ফলতঃ এক্ষণে গয়া তীর্থে যে সমস্ত দেবালয় বা মন্দির দৃষ্টিগোচর হয়, সে সমস্তই গয়ালীদিগের দ্বারা নূতন কলেবরে প্রতি- ষ্ঠিত হইয়াছে। গয়া তীর্থে চাঁদচৌড়া নামক স্থানটী অতি বিখ্যাত। গয়ালীদিগের এই স্থানে বিস্তর ঘর বাড়ী আছে। বলাবাহুল্য, যাত্রীগণ এখানে উপস্থিত হইবামাত্র ষ্টেশন হইতে গয়ালী নিযুক্ত গোমস্তারা তাঁহাদের পরিচয় লইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত করিতে থাকেন, এমন কি ট্রেণখানি যদি অর্দ্ধ রাত্রিতে তথায় উপস্থিত হয়, যে সময় সকলেই নিদ্রাভিভূত থাকেন, সেই নির্জ্জন সময়েও সারা রাত্রি এই সকল গোমস্তারা আলোক হস্তে যাত্রী ধরিবার জন্য পথের দুই ধারে সারি সারি দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে থাকেন। এই সকল লোকদিগের মধ্যে সকলকার মুখে একই বুলি শুনিতে পাইবেন, "আপনার নাম কি, নিবাস কোথায়, কোন্ জাতি, পাণ্ডা কে?" সুতরাং ইহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে যাত্রীগণকে হায়রাণ হইতে হয়। যাত্রীগণ তীর্থ স্থানে উপস্থিত হইলে এই সমস্ত গোমস্তারা যে সকল যাত্রী সংগ্রহ করেন, প্রায়ই তাঁহাদিগকে চাঁদচৌড়ার বাজারের উপর তাহাদের আপনাপন গয়ালীদিগের যে সমস্ত বাড়ী আছে, উহাতেই বিশ্রাম স্থান দান করেন, ইহাতে যাত্রীদিগকে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হয়, কারণ গয়া

র্থ শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত, এ হেন গয়াতে ভক্তগণের অন্ততঃ ত্রিরাত্রি াস করিতে হয়।

সিটিগয়াতেও এইরূপ গয়ালীদিগের অনেকগুলি প্রধান প্রধান আড্ডা আছে, যাত্রীগণ এখানে আসিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত ঐ সকল আড্ডায় আশ্রয় পাইয়া থাকেন। এই স্থান হইতে প্রত্যহ ফল্গুনদে স্নান ও দেবমন্দির সকল দর্শন করিতে হইলে অনেক দূর বৃথা হাঁটিতে হয়, এই নিমিত্ত আমরা আমাদের গয়ালী—স্বর্গীয় কানাইলাল ঢেড়ির দেওয়ানের নিকট অনুরোধ করিয়া চাঁদচৌড়ার পরিবর্ত্তে ফল্গুতীরে তাঁহাদের যে বাসাবাটী আছে, সেই স্থানে সুবিধামত একটী বিশ্রাম স্থান ঠিক করিলাম—কেন না, এই স্থান হইতে দেবদর্শন ও নিত্যস্নানের পক্ষে অনেক সুবিধা হয়, বিশেষতঃ এখানে বাজার ও পসারীদিগের দোকানগুলি নিকটে থাকায়, যাত্রীদিগের সকল বিষয়েই সুবিধা হইয়া থাকে। গয়ার সমতল রাস্তা হইতে বিষ্ণু পাদপদ্মের মন্দিরে যাত্রাকালীন ক্রমে উপরে উঠিতেছি এইরূপ মনে হয়।

গয়াপ্রদেশ—পাহাড়ের উপর অবস্থিত। ইহার পূর্ব্বে একমাত্র ফল্গুনদ, পশ্চিমে প্রেতশিলা, উত্তরে রামশিলা ও দক্ষিণে ব্রহ্মযোহন পাহাড় বিরাজমান। এই সমস্ত অত্যুচ্চ পাহাড়ের উপর আরোহণ করিলে সমস্ত সহরটীর সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, গয়ার চতুর্দ্দিক্‌ই প্রায় পাহাড়ে বেষ্টিত। এখানে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৫টী তীর্থ স্থান আছে, ইহার সকল স্থানেই পিণ্ডদান করিতে হয়, কিন্তু অধিকাংশ যাত্রী বিশেষতঃ বাঙ্গালী এই ৪৫টী তীর্থের পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র কয়েকটী প্রসিদ্ধ তীর্থেরই সেবা করিয়া থাকেন।

যাত্রীরা গয়াতে উপস্থিত হইয়া প্রথমে এখানকার পদ্ধতি অনুসারে ফল্গুনদে সঙ্কল্প ও পূজার্চ্চনা করিয়া পরে যথানিয়মে স্নান ও তর্পণ

করেন। বলাবাহুল্য, স্নানের পর—শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামনায় সর্ব্বত্র দীক্ষিত ব্যক্তিকে আপন অঙ্গে চন্দনলেপন এবং তিলকধারী হইয়া স্ব ইষ্টদেব প্রীতি কামনায় পুনশ্চ স্নান করিতে হয়। তৎপরে মনে ম হে কেশব, হে অনন্ত, হে গোবিন্দ, হে বরাহ, হে পুরুষোত্তম, হে শঙ্খ হে আয়ু ও আনন্দবর্দ্ধক! এই তিলক আমার প্রতি প্রসন্ন হউক-আমি যে চন্দন ফোটা ধারণ করিতেছি, ইহাই আমাকে কান্তি, লক্ষ্মী সন্তোষ, সুখ ও অতুল সৌভাগ্য দান করুক বলিয়া প্রার্থনা করিতে হয়।

বাসাবাটী হইতে ফল্গুতে যাইবার পথে তীরের উপরিভাগে সারি সারি বিস্তর নারিকেল, পুষ্প-তুলসী, তিল ও যবের ছাতু এবং ছোল ভাজার দোকান সকল সজ্জীকৃত দেখিতে পাওয়া যায়। এই ফল্গুতীরে উপরিভাগে যথায় একটী বাঁধা ঘাট প্রতিষ্ঠিত আছে, স্নানান্তে ভক্তগণ সেই স্থানে পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে এই স্থানটী অনাবৃত ছিল, উহাতে পিণ্ডদানের সময় সকলকে নানা প্রকার কষ্টভোগ করিতে হইত; সম্প্রতি এই ঘাটটী পিণ্ডদানের সুবিধার্থে প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাষ্ট্রীয়া মহারাণী অহল্যা বাঈ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া ভক্তগণের কত উপকার হইয়াছে, উহা লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। তৎপরে অক্ষয় বটবৃক্ষতলে, সর্ব্বশেষে—গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ড-দান করিয়াই বাঙ্গালীগণ নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। উপরোক্ত বিখ্যাত স্থান কয়টী ব্যতীত ফল্গুনদের পরপারে অর্থাৎ সীতাকুণ্ডের তীরে—বালির পিণ্ডদান করিবার ব্যবস্থা আছে।

অক্ষয় বটবৃক্ষতলে পিণ্ডদানকালে স্থানীয় নিয়মানুসারে মনোমত কামনা করিয়া একটী ফল দান করিতে হয় এবং জন্মের মত ঐ ফলটী ত্যাগ করিতে হয়, অর্থাৎ এই তীর্থে মনের মত মানত প্রার্থনা করিয়া

ফলটী দান করিবেন, যতদিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন উহার আস্বাদ লইতে পারিবেন না। মহর্ষি গৌতম এখানকার এই বটবৃক্ষতলে বসিয়া ৬০ হাজার বৎসর মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, এই বটবৃক্ষতলে শ্রাদ্ধান্তে দক্ষিণাসহ একটী ব্রাহ্মণকে ভোজনে তুষ্ট করিতে পারিলে বহু পুণ্য উপার্জ্জন হয়।

গদাধরের পাদপদ্মের মন্দির

এই প্রস্তরময় সুন্দর মন্দির ও নাটমন্দিরটী ইন্দোরের মহারাণী অহল্যা বাঈ কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে। দূর হইতে এই মন্দিরটীর দৃশ্য যেন ঠিক একখানি কৃষ্ণবর্ণ পাথর দণ্ডায়মান রহিয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। মন্দিরের শিখরদেশে একটী স্বর্ণ নির্ম্মিত চূড়া ও ধ্বজা শোভা পাইতেছে, ইহার সম্মুখেই নাটমন্দির আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে। নাটমন্দিরের চতুর্দ্দিকই প্রস্তরে বাঁধান, মধ্যে একটী বৃহৎ ঘণ্টা দোদুল্যমান থাকিয়া যেন ভক্তবৃন্দকে ভিতরে প্রবেশ করিয়া গদাধরের পাদপদ্মে ভক্তিদান করিতে আহ্বান করিতেছে। এই মন্দির ও নাটমন্দিরটী কত কাল পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু দেখিলেই যেন নূতন বলিয়া মনে হয়। মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীশ্রীগদাধরের পাদপদ্ম দেদীপ্যমান। ভক্তগণ তথায় পিতৃপুরুষগণের পিণ্ডদান করিয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করেন এবং তৎসঙ্গে নিজে পূর্ব্ব ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। এই পবিত্র পাদপদ্ম—যিনি একবার হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, তিনিই ধন্য, তাঁহার জন্ম এবং ক্রিয়াকর্ম সমস্তই ধন্য বলিতে হইবে; বলাবাহুল্য, ভগবান গদাধরের কৃপা ব্যতীত কেহই ইহা হৃদয়ে ধারণ করিতে সক্ষম হন না। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত গদাধরের সেই প্রাচীন মন্দিরের একটী চিত্র প্রদত্ত হইল।

শ্রীমন্দিরের চতুঃসীমার আশে-পাশে নানা দেবদেবীর দেবালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। তন্মধ্যে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণজীউ ও মহীরাবণের কালী বাড়ীর সম্মুখে মহাবীর হনুমানের স্কন্ধে রাম লক্ষ্মণ মূর্ত্তি দর্শনে এক অনির্ব্বচনীয়ভাবের উদয় হয়। শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণজীউর দেবালয়টী শ্রীমন্দিরের বহির্ভাগে সূর্য্যকুণ্ডের সন্নিকটে অর্থাৎ স্নানঘাটের পার্শ্বে অবস্থিত। বাসাবাটী হইতে গদাধরের মন্দিরে যাইবার সময় পথিমধ্যে যে প্রাচীরবেষ্টিত একটী বৃহৎ কুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, উহাই সূর্য্য-কুণ্ড নামে খ্যাত। বহু উত্তর-পশ্চিম দেশীয় যাত্রী এই কুণ্ডতীরে পিতৃ-পুরুষদিগের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিয়া থাকেন, এই কুণ্ডের উত্তরদিকে শ্রীশ্রীসূর্য্যদেবের একটী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কথিত আছে, ভক্তি-সহকারে এই দেবের পূজার্চ্চনা করিলে তাঁহার কৃপায় যাবতীয় ব্যাধি দূরে পলায়ন করে। সূর্য্যকুণ্ডটী সমতল পথ হইতে অনেক নীচে অবস্থিত।

সীতাকুণ্ড বা সীতাতীর্থ

গয়ার ফল্গুনদের তীর্থঘাটের পরপারে এক উচ্চ পাহাড়ের উপরি-ভাগে যে দেবালয় প্রতিষ্ঠিত আছে, যথায় রামচন্দ্রের শোকে মৃত দশরথ ক্ষোভে ভরতের পিণ্ড গ্রহণ না করিয়া ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়াছিলেন এবং শ্রীরামচন্দ্রের অবর্ত্তমানে সীতাদেবীর নিকট যেরূপ প্রকারে বালির পিণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ একটী মূর্ত্তি যথায় স্থাপিত আছে, ঐ স্থানটীই সীতাতীর্থ নামে খ্যাত।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্যপালন করিবার জন্য বনগমন করিলে অন্ধপুত্র রাজা দশরথ ঐ পুত্রের অদর্শনে ক্ষোভে দেহত্যাগ করিয়া-

ছিলেন, শ্রী ভরত মাতুলালয় হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক এই সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া স্বর্গীয় পিতৃদেব ও শ্রীরাম শোকে অধীর হইলেন, তৎপরে পুরোহিত বশিষ্ঠদেব ও গুরুজনের উপদেশ মত যথানিয়মে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডাদি সমাপনান্তে তীর্থে তীর্থে শ্রীরাম উদ্দেশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এদিকে দশরথ রোষভরে কৈকেয়ীর কুব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া যথাসময়ে কৈকেয়ী-পুত্র ভরতের পিণ্ড গ্রহণ করিলেন না, অধিকন্তু পিশাচরূপিণী মধ্যম মহিষী কৈকেয়ীর কুব্যবহার স্মরণ করিয়া আন্তরিক দুঃখে, ক্রুদ্ধ মনে ধরায় মধ্যম পুত্রের এই কথা বলিয়া পিণ্ডদান রহিত করিলেন যে, "অতঃপর আমার মনস্তাপের জন্য ধরায় কখন যেন কোন পিতৃপুরুষ কোন মধ্যম পুত্রের পিণ্ড গ্রহণ না করেন।" সেই স্বর্গীয় দশরথ বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া অদ্যাপি কোন পিতৃপুরুষ, কোন মধ্যম পুত্র পিণ্ডদান করিলেও তাঁহারা উহা গ্রহণ করেন না।

রামায়ণ পাঠে উপদেশ পাওয়া যায়, সীতাদেবী শ্রীরাম লক্ষ্মণের অনুপস্থিতিতে যখন খেলাচ্ছলে এই ফল্গুতীরে তাঁহার বাল্য সখিগণকে স্মরণ করিয়া কৃত্রিম রন্ধনপূর্ব্বক পরিবেশন করিতেছিলেন, সেই সময় দশরথ তাঁহার নিকট বালির পিণ্ড গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। দেবী স্বর্গীয় রাজাকে ভরতের পিণ্ডদানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি মধ্যম মহিষী পিশাচিনী কৈকেয়ীর অসম্ভব বর প্রার্থনায় আন্তরিক দুঃখিত হইয়া ধরায়—মধ্যম পুত্রের পিণ্ডদান অগ্রাহ্য করিয়াছি।" বলাবাহুল্য, তাঁহার আদেশ মত কোন জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্র ভিন্ন মধ্যম পুত্র পিণ্ডদানের অধিকারী হন না।

শ্রীভরত শ্রীরামচন্দ্রের অন্বেষণকালে যখন গয়াতে উপস্থিত হইয়া এই অদ্ভুত ঘটনা শ্রবণ করিলেন, তখন তিনি সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাদের আশ্রম স্থানের সন্নিকট অবিকল সেইরূপ একটী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত

করিয়া সীতাদেবীর সম্মান রক্ষা করিলেন। স্ত্রীলোকমাত্রেই অদ্যাপি এই তীর্থে আসিয়া সাধ্যমতে সীতাদেবীর উদ্দেশে পূজার্চ্চনা করিয়া ভরতের প্রতিষ্ঠিত সেই সীতা মূর্ত্তির কপালে সিন্দুর লেপন করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিয়া থাকেন। ইহার নিম্নভাগে ফল্গু তটে দশরথ উদ্দেশে বালির পিণ্ড দিবার প্রথা আছে। এই স্থানেই যে তাঁহাদের আশ্রম ছিল, উহা প্রমাণ করাইবার জন্য স্থানীয় পাণ্ডারা অদ্যাপি যাত্রীদিগকে সেই আশ্রমের নিম্নভাগে যথায় একটী গভীর খাদ আছে, সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে দেবী স্নান করিতেন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যাত্রীগণ ফল্গুকে অন্তঃসলিলা স্থির জানিয়াও যখন সীতাকুণ্ড নামক স্থানটীতে উপস্থিত হইবেন, তখন এই নির্দ্দিষ্ট কুণ্ড স্থানে সাবধানের সহিত পারাপার হইবেন। কেন না, বাস্তবিকই ঐ স্থানটীতে গভীর গহ্বর আছে।

ফল্গু

গয়া সহরের একমাত্র ভরসা এই ফল্গু নদ। বর্ষাকাল ভিন্ন সকল সময়ই ইহা প্রায় শুষ্ক থাকে। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে ইহা জলপূর্ণ হইয়া প্রবল স্রোতে নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহকে প্লাবিত করিয়া থাকে। হাজারিবাগের পাহাড় হইতে বহির্গত হইয়া ইহা মোকামার নিকট গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। পুরাকালে ব্রহ্মার প্রার্থনায় স্বয়ং হরি সলিলরূপে অবতীর্ণ হন। কথিত আছে, দক্ষিণাগ্নিতে যজ্ঞকার্য্যে ব্রহ্মা যে আহুতি প্রদান করেন, তাহাতেই ফল্গুর উৎপত্তি হইয়াছে। মহাভারত পাঠে উপদেশ পাওয়া যায়—যে গঙ্গা তীর্থের এত মহিমা, সেই গঙ্গা যে বিষ্ণুর চরণোদক, শ্রীহরি স্বয়ং দ্রব হইয়া ফল্গুরূপে গয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই হেতু গঙ্গা হইতে ফল্গুর মহিমা অধিক।

সাধ্বীসতী সীতাদেবী অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া এই ফল্গু অন্তঃসলিলা হইয়া অবস্থান করিতেছেন। কথিত আছে, একদা শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ সীতাসহ এখানে অবস্থান করিবার সময় যখন উভয় ভ্রাতায় ফলাহোরণে গিয়াছিলেন, বাল্যস্বভাববশতঃ সেই সময় সীতা-দেবী বিষ্ণু পাদপদ্মের দিকে সহচরীদিগের উদ্দেশে আপন মনে খেলা করিতেছিলেন, এমন সময়ে পরলোকগত দশরথ তাঁহার নিকট আসিয়া পিণ্ড চাহিলেন। দেবী মনে মনে ভাবিলেন, "প্রভু আমার নিকটে নাই, কি প্রকারে পূজনীয় শ্বশ্রুদেবকে আমি পিণ্ডদান করিব," দশরথ তাঁহাকে চিন্তান্বিতা অবলোকন এবং মনের ভাব অবগত হইয়া সীতাকে মধুর বচনে অনুমতি করিলেন, "বৎসে! এইমাত্র তুমি কৃত্রিম রন্ধন করিয়া যেরূপে তোমার সখিগণকে পরিবেশন করিতেছিলে, সেইরূপে ঐ বালির পিণ্ডই আমায় ব্রাহ্মণ দ্বারা মন্ত্রপূত করিয়া প্রদান কর, উহাতেই আমি পরিতৃপ্ত হইব, কারণ ভরতের পিণ্ড অগ্রাহ্য করিয়া আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি।" দেবী তৎশ্রবণে ভক্তিসহকারে বালির পিণ্ড প্রদান করিয়া তাঁহার আজ্ঞাপালন করিলেন। এদিকে যথাসময়ে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে,সীতাদেবী তাঁহাদের নিকট যথাযথ সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিলেন এবং নিকটবর্ত্তী ফল্গুনদ, বটবৃক্ষ ও যে ব্রাহ্মণ দ্বারা পিণ্ডদান করিয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মণকে ইহার সত্যা-সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে অনুমতি করিলেন। আজ্ঞাপ্রাপ্তে বটবৃক্ষ বালির পিণ্ডদানের বিষয় সমস্তই সত্য বলিল, ব্রাহ্মণটী পিণ্ডদান সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া কেবল মৌনাবলম্বন করিলেন, কিন্তু ফল্গু [illegible] ভাবে কোন্ ছলে বালির পিণ্ডদান, একেবারে মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ করিলেন—এই নিমিত্ত সাধ্বীসতী সীতাদেবী ক্রুদ্ধ হইয়া ফল্গুকে "[illegible] অন্তঃসলিলা হও" বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণের [illegible]

হারে অসন্তুষ্ট হইয়া আজ্ঞা করিলেন, "তুমি লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিলেও ভিখারী হইবে", আর বটবৃক্ষের প্রতি সন্তুষ্টচিত্তে—আমার বরে তুমি "অক্ষয় হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। এই নিমিত্ত অদ্যাপি বটবৃক্ষ সীতাদেবীর আশীর্ব্বাদে চিরজীবন লাভ করিয়া কেবল তাঁহারই শ্রীচরণ ধ্যান করিতেছে। যে ফল্গু—স্বয়ং শ্রীহরি বলিয়া খ্যাত, আজ সাধ্বী-সতী সীতাদেবীর শাপে তাঁহাকে অন্তঃসলিলা হইয়া অবস্থান করিতে হইল। মায়াময় হরির অনন্তলীলা—তিনি লীলাবশে নানা স্থানে নানা ভাবে নানা প্রকারে আপন লীলা প্রকাশ করিতেছেন, প্রমাণস্বরূপ সাধ্বীসতী গান্ধারী ও সীতাদেবীর অভিশাপ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া আপন মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

রামশিলা

রামশিলা—এই গিরিজাত নদীর সঙ্গম স্থলে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীসহ স্নান করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত ইহার নাম রামশিলা তীর্থ হইয়াছে। শ্রীভরত—নিরন্তর এই স্থানে পুণ্যবান লোক-দিগের সহিত বাস করিতেন এবং তৎকর্ত্তৃক এখানে শ্রীরাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও বহুতর ঋষি মূর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। পাহাড়ের উপরিভাগে একটী শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। পূর্ব্বে এই পাহাড়ে উঠিবার কোন সোপান ছিল না, একদা প্রাতঃস্মরণীয় টিকারীরাজ রণ বাহাদুর সিং এই স্থানে পাহাড়ে আরোহণ সময় যাত্রীদিগের কষ্ট দেখিয়া ব্যথিত হৃদয়ে তিনি নিজ ব্যয়ে ইহাতে তিন শত ধাপ সিঁড়ি প্রস্তুত করাইয়া সাধা-রণের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

ব্রহ্মযোনি পাহাড়

গয়া সহর মধ্যে যতগুলি পাহাড় আছে, তন্মধ্যে এই ব্রহ্মযোনি পাহাড়টী সর্ব্বোচ্চ। ব্রহ্মযোনি পাহাড়টী সমতলভূমি হইতে ইহার শিখরদেশ পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ৩৫০টী প্রশস্ত সিঁড়ি আছে। স্থানীয় পূজারীর নিকট উপদেশ পাইলাম, ধর্ম্মপ্রাণা মহারাষ্ট্রীয়া মহারাণী অহল্যা বাঈ কর্ত্তৃক এই প্রশস্ত সোপানগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই উচ্চ পাহাড়ের শিখরদেশে সাবিত্রী, গায়ত্রী ও সরস্বতী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহার মধ্যভাগে এক পার্শ্বে একটী কুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাকালে চতুরানন (ব্রহ্মা) ঐ স্থানে যজ্ঞ করিয়া যে গো-দান করিয়াছিলেন, অদ্যাপি যাত্রীরা সেই গোষ্পদ চিহ্ন এখানে দেখিতে পাইয়া থাকেন। পাহাড়ের অপর পার্শ্বে ব্রহ্মযোনি নামে আর একটী গুহা আছে, প্রবাদ এইরূপ যে—যদি কোন ভক্ত ঐ গুহায় প্রবেশ করিয়া তদভ্যন্তর হইতে বহির্গত হন, ইহার ফলে তাঁহাকে আর কখন জঠর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, অধিকন্তু অন্তিম সময় তাহার পরম পদ লাভ হয়।

ভীম পাহাড়

এখানে একটী পাহাড়ের উপর এক স্থানে একটী গভীর গহ্বর দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন পিতৃ-পুরুষদিগের উদ্দেশে যে সময় এই পাহাড়ের উপর বসিয়া পিণ্ড প্রদান করেন, সেই সময় তাঁহার বাম হাঁটুর ভরে পাহাড় স্থানটী এইরূপ গহ্বরে পরিণত হয়; সুতরাং এই পাহাড়টী ভীম পাহাড় নামে এখানে খ্যাত হইয়াছে।

গয়া তীর্থের উৎপত্তি

ত্রিপুরাসুরের—গয়া নামে এক মহা বৈষ্ণব ও পরাক্রমশালী পুত্র ছিলেন। তিনি পিতৃসিংহাসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া একদা অমাত্যগণের নিকট অবগত হইলেন যে, দেবতারা কৌশল বিস্তারপূর্ব্বক তাঁহার পিতৃদেবকে বিনাশ করিয়াছেন। এই ভয়াবহ সংবাদে তিনি ক্ষোভে অধীর হইলেন এবং ক্রোধান্বিতকলেবরে পিতৃঅরি দেবগণের বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। বলাবাহুল্য, অমর দেবগণকে তিনি বারম্বার যুদ্ধে পরাজিত করিয়া নানাপ্রকার কষ্ট প্রদান করিতে লাগিলেন; তখন দেবগণ গয়াসুরের অমিতবিক্রম দর্শনে ত্রাসিত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। চতুরানন তাঁহাদিগকে ভীতচিত্ত অবলোকন এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া বৈকুণ্ঠপতির আশ্রয় লইতে আদেশ করিলেন, অধিকন্তু তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া আরও বলিলেন যে, স্বয়ং আমিও তোমাদের পশ্চাদ্গামী হইব।

বৈকুণ্ঠ—সূর্য্যের নিকট হইতে লক্ষ যোজন উর্দ্ধে চন্দ্রমা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, চন্দ্রমা হইতে লক্ষ যোজন উপরে নক্ষত্রমণ্ডল, নক্ষত্রমণ্ডল হইতে দ্বিলক্ষ যোজন উপরে বুধ, বুধ হইতে দুই লক্ষ যোজন উর্দ্ধে শুক্র, শুক্র হইতে দুই লক্ষ উর্দ্ধে মঙ্গল, মঙ্গল হইতে নিযুতদ্বয় যোজন উর্দ্ধে বৃহস্পতি, দেবগুরু বৃহস্পতি হইতে দুই লক্ষ যোজন উর্দ্ধে শনি, শনি হইতে দুই লক্ষ যোজন উর্দ্ধে ধ্রুব অবস্থিত। ধ্রুব হইতে চতুষ্কোটি যোজন উর্দ্ধে সত্যলোক, সেই সত্যলোক হইতে এক যোজন উপরিভাগে বৈকুণ্ঠ শোভা পাইতেছে। দেবগণ কৃতাঞ্জলিপুটে তথায় সেই বৈকুণ্ঠপতির নিকট আপনাপন মনোবেদনা প্রকাশ করাতে, ভগবান তাঁহাদের সর্ব্বপশ্চাতে ব্রহ্মাকে অবলোকন করিয়া চতুরাননকে একটী

যজ্ঞ আহুতি করিতে আদেশ করিলেন এবং ঐ যজ্ঞ পূর্ণ হইবার সময় তিনি স্বয়ং বিশ্বম্ভর মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠান হইয়া দেবতাদিগের ক্লেশ দূর করিবেন বলিয়া সকলকে সান্ত্বনা করিলেন, অধিকন্তু গয়াসুরের পবিত্র শরীরটীকে ঐ যজ্ঞ স্থান নির্দ্দেশ করিবার জন্য ব্রহ্মাকে ইঙ্গিত করিয়া দিলেন। ব্রহ্মা এইরূপ উপদেশ পাইয়া তখন দেবগণসহ বৈকুণ্ঠ হইতে গয়াসুরের নিকট আতিথ্য স্বীকার করিলেন।

ব্রহ্মাকে দেবগণসহ অতিথিরূপে স্বীয় পুরে আগত দেখিয়া গয়াসুর প্রথমে নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে দৈত্যপতির অমাত্যগণ ব্রহ্মা যে নিশ্চয় কোন দুরভিসন্ধি সিদ্ধি করিবার জন্য এই উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, উহা গয়াসুরকে বারম্বার উপদেশ দিতে লাগিলেন। পরম বৈষ্ণব গয়া—তখন স্থির করিলেন যে, ব্রহ্মা ত্রিলোক-পূজ্য! যাঁহার আদেশ পালন করিবার জন্য কি দেব, কি দৈত্য, কি দানব সকলেই লালায়িত, আজ কিনা পূজ্যপদ সেই ব্রহ্মার আদেশ পালন করিবার জন্য আমি অমাত্যগণের পরামর্শে পরাঙ্মুখ হইব? ইহা আমার ন্যায় ব্যক্তির কখনই শোভা পায় না। এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া তিনি যুক্তকরে ব্রহ্মাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "হে ব্রাহ্মণ! যখন স্বয়ং আপনি অতিথিরূপে আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, উহাতেই আমার জন্ম সফল বোধ করিতেছি। এক্ষণে আপনার কোন্ আজ্ঞা পালন করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন?"

ব্রহ্মা গয়ার অচলা ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "বৎস গয়া! আমি একটী যজ্ঞ করিতে মনস্থ করিয়াছি, পৃথিবীতে যে সমস্ত স্থান দেখিয়াছি, উহাপেক্ষা তোমার শরীরই পবিত্র জ্ঞানে এখানে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছি, অতএব যজ্ঞার্থে তোমার পবিত্র শরীরটী দান করিয়া আমার এই শুভ কর্ম্মে সহায়তা কর।"

গয়াসুর তাঁহার সহায়তা করিবার মানসে তখন বিনা আপত্তিতে সম্মত হইয়া কোলহল পর্ব্বতের নৈঋত ভাগে শিরদেশ, যাজপুরে নাভি-দেশ এবং চন্দ্রভাগাতে পাদদ্বয় বিস্তার করিয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ব্রহ্মাকে বলিলেন, "ভগবান! আপনার শুভ যজ্ঞ কার্য্যের সহায়তা করিবার নিমিত্ত আমার এই প্রশস্ত শরীর আপনাকে দান করিলাম, এক্ষণে আপনি ইচ্ছানুরূপ ইহার উপর যজ্ঞ আরম্ভ করুন।"

বিধাতা—ইত্যাবসরে আপন মানস হইতে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের সৃষ্টি করিলেন এবং শুভ কার্য্যসিদ্ধির অভিলাষে তৎক্ষণাৎ দৈত্যপতিকে ঐ যজ্ঞে আবদ্ধ করিলেন। এইরূপে গয়াসুর তথায় আবদ্ধ হইলে পর ব্রহ্মা সেই যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া যজ্ঞীয় যূপকাষ্ঠগুলি ব্রহ্মসরোবরে স্থাপন করিবার সময়, যজ্ঞভূমে গয়াসুরকে চলিবার উপক্রম করিতেছে দেখিতে পাইলেন; সুতরাং চিন্তিতমনে ধর্ম্মরাজকে তদীয় গৃহস্থিত ক্রোশব্যাপী অতিভারশিলা (শাপভ্রষ্ট ধর্ম্মব্রতা) গয়ার মস্তকের উপর স্থাপন করিতে আদেশ করিলেন। বলাবাহুল্য, আদেশমাত্র ধর্ম্মরাজ উহা প্রতিপালন করিলেন। তদ্দর্শনে মহাপরাক্রমশালী গয়াসুর, ব্রহ্মার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া সেই অতিভারশিলা খণ্ডখানি মস্তকে স্থাপিত থাকিলেও চলিবার উপক্রম করিলেন, ফলতঃ বিধাতা সত্বর দেবগণকে স্ব স্ব বাহনে আরোহণপূর্ব্বক ঐ শিলাখণ্ডের উপর অবস্থান করিতে অনুমতি করিলেন। রুদ্রাদি দেবগণ অচলভাবে ঐ শিলার উপর অব-স্থান করিয়াও গয়াকে নিশ্চল করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন ব্রহ্মা—নিরুপায় হইয়া জগৎচিন্তামণি শ্রীহরিকে স্মরণ করিলেন। ধন্য গয়াসুর! ধন্য তোমার প্রেম ও ভক্তি! যে বিধাতার ইঙ্গিতমাত্র সৃষ্টিস্থিতিলয় হয়, আজ তাঁহাকে—তোমার ন্যায় ভক্তবীরের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া শ্রীহরির শরণাপন্ন হইতে হইল। ভক্তবৎসল ভগবান! এই-

রূপেই তুমি ভক্তের মান বৃদ্ধি করিয়া থাক। পুরাণে শুনিয়াছি, একদা আপনি উপদেশচ্ছলে আপনার ভক্ত নারদ ঋষিকে বলিয়াছিলেন, "সকলে আমায় শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন সত্য, কিন্তু স্থির জানিও, আমাপেক্ষা আমার ভক্ত শ্রেষ্ঠ।" ভগবান! এই নিমিত্ত তুমি অপর নাম "হরি" গ্রহণ করিয়াছ, কেন না তুমি সকল সময় সকল প্রাণীর সকল বিষয়ই সহজে হরণ করিয়া ভক্তের মান বৃদ্ধি করিয়া থাক—উদাহরণস্বরূপ "ব্রহ্মার এই যজ্ঞস্থল।" ব্রহ্মা যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরিকে স্মরণ করিবামাত্র তিনি বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মার যজ্ঞস্থলে ঐ শিলার উপর এক পদ স্থাপন করিলেন। সেই শ্রীপদ স্পর্শে গয়াসুর দিব্যজ্ঞানলাভে দেবতাদিগের ছলনা বুঝিতে পারিলেন এবং করুণস্বরে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "যজ্ঞেশ্বর! তুমি কৃপাপূর্ব্বক যে এক পদ আমার মস্তকোপরি স্থাপন করিয়াছ, উহাতেই আমি সৌভাগ্যবোধ করিতেছি। অন্তর্যামিন্! তুমি যার হৃদয়ে পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতেছ, তার আবার দ্বিতীয় পদের কিসের আবশ্যক? কিন্তু হে শ্রীহরি! "আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনার আদেশমাত্র কি আমি নিশ্চল হইতাম না, সুরগণ বৃথা যজ্ঞের আড়ম্বর দেখাইয়া আমার এরূপ কষ্ট দিতেছেন কি নিমিত্ত?"

যে দেব সর্ব্বসংহারকর্ত্তা, যাঁহার কৃপায় আমি সর্ব্বত্র পলকে প্রলয় ঘটাইতে পারি, সেই দেব যখন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় আমার হৃদয়ে বিরাজমান, তখন আমি কি কাহারও ছলনায় বশীভূত থাকিব? আপনার আদেশ পাইলে এই দণ্ডে আমি দেবগণকে ইহার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিতে পারি? ভক্তবীর গয়াসুরের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া গদাধর তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। বহু পূর্ব্ব হইতে গয়ার হৃদয়ে একটী উচ্চ আশা জাগিতেছিল, এক্ষণে সেই বাসনা

পূর্ণ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া তিনি যজ্ঞেশ্বরের নিকট এই বর প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "ভগবান! যদি আমার প্রতি সদয় হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন—যতদিন পৃথিবী, পর্ব্বত, নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য্য বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন আমার এই মস্তকস্থিত শিলার উপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং অন্যান্য দেবগণ যাঁহারা এক্ষণে বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদিগকে সদাসর্ব্বদা প্রসন্ন মনে উপস্থিত থাকিতে হইবে। এই যজ্ঞক্ষেত্রটী আমার নামানুসারে প্রসিদ্ধ করিতে হইবে এবং আমার অভিলাষ মত ইহাতে পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ সকল আসিয়া লোকহিতার্থে অবস্থান করুন, শ্রীচরণে আরও নিবেদন করিতেছি—এই তীর্থে আপনার বরপ্রভাবে লোকে স্নান ও তর্পণ করিলে যেন পিণ্ডদানের অধিক ফল প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হয়, শেষ প্রার্থনা এই—যাহারা পিণ্ডদান করিবে তাহারা সহস্রকুলের সহিত আপনি মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে। হে গদাধর! আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা স্বয়ং আপনাকে তাহাদের প্রদত্ত ঐ পূজা গ্রহণ করিতে হইবে, শেষ বক্তব্য এই—যাহারা এই স্থানে পিণ্ডদান করিবে, প্রাণান্তে তাহাদিগকে ব্রহ্মলোকে স্থান দিতে হইবে. যে ভক্ত এই ক্ষেত্রে আসিয়া শুদ্ধচিত্তে ত্রিরাত্রি বাস করিবে, সে ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক হইলেও আমার এই বরপ্রভাবে যেন মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। হে যজ্ঞেশ্বর! আমার আর একটী বাসনা বলবতী হইতেছে, যেদিন আমার মস্তকোপরি কাহারও পিণ্ডদান না হইবে বা উপরোক্ত প্রার্থনার কোনরূপ ত্রুটি পরিলক্ষিত হইবে, সেইদিনই আমি আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গপূর্ব্বক যেন পিতৃঋষি দেবগণকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিতে সমর্থ হই।" ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীহরি "তথাস্তু" বলিয়া ভক্তের সকল প্রার্থনাই পূর্ণ করিলেন। এইরূপে পরোপকারী মহাবীর বৈষ্ণব প্রধান গয়া

সুরের মহতী ইচ্ছার গুণে এবং শ্রীহরির কৃপায় তীর্থশ্রেষ্ঠ "গয়াক্ষেত্রের" উৎপত্তি হইয়াছে। কথিত আছে, গয়ার পাণ্ডাগণ এই বিষয়ের সত্যতা প্রমাণ করিবার অভিপ্রায়ে একদিন এখানে পিণ্ডদান করেন নাই; ঠিক সন্ধ্যার সময় শিলা বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল, তখন পাণ্ডারা পিণ্ড প্রদান করিয়া নির্ভরচিত্তে অবস্থান করিলেন। বিষ্ণুপাদপদ্মের বাঁধান বেদীমধ্যে যে দীর্ঘাকৃতি পদচিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, উহাই গদাধরের শ্রীপদচিহ্ন বলিয়া কথিত।

যে সকল ভক্ত এই তীর্থে আসিয়া গদাধরের শ্রীপদচিহ্ন নিজালয়ে লইয়া আসিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা স্বীয় গয়ালীর নিকট পূর্ব্ব দিবস দুই আনা পয়সা জমা দিলেই নূতন কাপড়ের উপর গদাধরের চন্দনে অঙ্কিত শ্রীপদচিহ্ন প্রাপ্ত হইবেন। প্রত্যহ দিবাভাগে এখানে ভক্তগণের পিণ্ডদান লইয়া অত্যন্ত জনতা হয়, সুতরাং সুস্পষ্টরূপে ঐ পবিত্র পাদপদ্ম দর্শনে অত্যন্ত ব্যাঘাত হয়; কিন্তু প্রতি রাত্রিতে যখন এই শ্রীপাদপদ্মের শৃঙ্গার বেশ হইয়া আরতি হয়, তখন ঐ পবিত্র পাদপদ্ম চিহ্নটী চন্দন লিপ্ত হইয়া এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে, অতএব ভক্তগণ! সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এই সন্ধ্যা আরতি দর্শন করিতে অবহেলা করিবেন না।

গয়াতীর্থে গয়ালীদের আদি বৃত্তান্ত

যজ্ঞকালে ব্রহ্মা আপন মানস হইতে যে সকল যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ এখানে সৃজন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকে এই তীর্থ স্থানে বাস করিতে আজ্ঞা করিয়া পঞ্চাশখানি গ্রাম, পঞ্চক্রোশী গয়াতে যথেষ্ট উপকরণ, সুন্দর সুন্দর গৃহ, কামধেনু, ঘৃতপূর্ণ নদী, দধিপূর্ণ সরোবর, অন্ন-

পূর্ণ পাহাড় প্রভৃতি এইরূপ নানাপ্রকার দ্রব্যাদি দান করিয়া তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দিলেন এবং তাঁহাদিগকে উপদেশ দিলেন যে, আমি তোমাদের যাহা দান করিলাম, উহাতে তোমাদের ভরণপোষণের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। অতএব আমার আদেশ মত তোমরা আর কাহারও নিকট কখন কিছু প্রার্থনা না করিয়া ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকিও, এইরূপ আদেশ করিয়া তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। কিছুকাল অতীত হইবার পর এক সময় ধর্ম্মারণ্য নামে এক মহৎ যজ্ঞ আরম্ভ হইল। বলাবাহুল্য, ঐ যজ্ঞে এই সকল ব্রাহ্মণগণও নিমন্ত্রিত হইলেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রহ্মার পূর্ব্ব আদেশ বিস্মরণ হইলেন এবং যজ্ঞস্থিত ধন-রত্ন সকল দানস্বরূপ গ্রহণ করিয়া স্বীয় পুরে উপস্থিত হইলেন। অন্তর্যামিন্ ব্রহ্মা তখন তাহাদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, হে ব্রাহ্মণগণ! তোমরা আমার বাক্য অমান্য করিয়াছ, সুতরাং আমার আদেশে তোমাদের বিষয়-তৃষ্ণা বলবত হইবে, বিদ্যাহীন হইবে, এ স্থানে অন্নাদির পর্ব্বত সকল পাষাণময় হইবে, নদী সকল জলমগ্ন হইবে, গৃহ সকল মৃত্তিকাময় হইবে এবং আমার ইচ্ছানুসারে কামধেনু সকল স্বর্গে গমন করুক। কোপান্বিত ব্রহ্মার ঈদৃশ কঠোর আদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহারা করুণ স্বরে বিলাপ করিতে করিতে চতুরাননকে তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় স্থির করিতে অনুরোধ করিলেন, তখন তাঁহাদের কাতর অনুরোধে তিনি কৃপাপরবশ হইয়া এই অনুমতি করিলেন যে—বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ গয়াসুরের প্রার্থনায় এবং শ্রীহরির কৃপায় এই ক্ষেত্র এক্ষণে তীর্থশ্রেষ্ঠ হইয়াছে; সুতরাং যতদিন চন্দ্র সূর্য্য বর্ত্তমান থাকিবে; ততদিন ভক্তগণ এখানে পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিতে আসিবে, যে ব্যক্তি এখানে শ্রাদ্ধাদি সম্পাদনপূর্ব্বক শেষে

তোমাদের পূজা করিবে, আমার বরপ্রভাবে সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে ব্রহ্মলোকে স্থান পাইবে। বলাবাহুল্য, সেই সকল শাপগ্রস্ত ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণ এক্ষণে এখানে গয়ালী নামে খ্যাত হইয়াছেন, এই কারণে যাত্রীগণ গয়া তীর্থে শ্রাদ্ধাদি সমাপনান্তে শেষে ইঁহাদের নারিকেল, পৈতা, সুপারি ও টাকা দিয়া চরণ পূজা করিয়া থাকেন এবং সাধ্যমতে প্রণামীদানে সুফল গ্রহণ করেন। চৈত্র মাসে মধুগয়া ও ভাদ্র মাসে সিংহগয়া করিবার জন্য বিস্তর যাত্রী এই তীর্থে আসিয়া থাকেন।

বুদ্ধগয়া

ফল্গুতীর হইতে প্রায় ছয় মাইল পাকা বাঁধা রাস্তার উপর দিয়া ঘোড়ার গাড়ী বা একা গাড়ীর সাহায্যে বুদ্ধগয়াতে যাইতে হয়, কিম্বা পদব্রজেও গমন করা যায়। এই স্থান পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের তপস্যাশ্রম ছিল, এই কারণে ইহার নাম বুদ্ধগয়া হইয়াছে। দেশপূজ্য মহাত্মা শাক্য-সিংহ—যিনি ধরায় বুদ্ধ অবতার নামে খ্যাত, সেই দেব এখানে সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন ; এই কারণে এই স্থানটী বুদ্ধগয়া নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

এখানকার বুদ্ধদেবের প্রাচীন মন্দিরটী পুরীর শ্রীমন্দির অপেক্ষা উচ্চ ; আবার এই বুদ্ধ মন্দিরটীর কারুকার্য্য দর্শন করিলে দর্শকবৃন্দকে চমৎকৃত হইতে হয়। মন্দিরের চতুঃসীমার মধ্যে নানাবিধ দেবদেবীর মূর্ত্তি, প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী অহল্যা বাঈয়ের প্রতিমূর্ত্তি এবং পঞ্চপাণ্ডব, মাতা কুন্তীদেবীসহ এক মন্দির মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাদের দর্শন পাইবেন। অহল্যা বাঈয়ের কার্য্যকলাপ দর্শনে সাধারণে তাঁহাকে দেবীর ন্যায় ভক্তি ও পূজা করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত এই পবিত্র

স্থানে তাঁহার একটী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এখানে বিস্তর প্রাচীনকালের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের বহির্ভাগে একটী দ্বিতল প্রশস্ত মঠ আছে—উহাতে যে সকল সাধু, সন্ন্যাসী বাস করেন, তাঁহাদিগকে দর্শন করিলে ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। বুদ্ধগয়ার মন্দির সীমানা ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পশ্চিম পার্শ্বে এক কক্ষমধ্যে বুদ্ধ অবতারের যে একটী সুন্দর মর্ম্মরপ্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি ও অপর কক্ষে কাচমধ্যস্থ যে সুবর্ণময় প্রতিমূর্ত্তির দর্শন পাওয়া যায়, উহাতে চিত্তে পরম ভক্তির উদ্রেক হয়। বুদ্ধগয়ার বিখ্যাত মন্দির পশ্চাতে পদ্ম নামে এক পুণ্য পুষ্করিণী আছে। কথিত আছে, যদি কোন অপুত্রক ইহার পবিত্রবারি স্পর্শ করিলে ভগবান্ বুদ্ধদেবের কৃপায় তিনি পদ্মের ন্যায় পুত্র বা কন্যা লাভ করিতে সমর্থ হন। এই স্থানে একটী কথা বলিবার আছে, কি গয়া কি বুদ্ধগয়া সকল স্থানেই দোকানীরা ৭২৲ টাকা ওজনের সের ব্যবহার করিয়া থাকেন। অর্থাৎ এখানে একটী সের কলিকাতার সের অপেক্ষা ৮৲ ভরি ওজনে কম। গয়াতীর্থ স্থানের চতুঃসীমার মধ্যে যে সকল হালুইকরের দোকান আছে, ঐ সকল দোকানে ছানার পাকের মিষ্টান্নের পরিবর্ত্তে কেবল ক্ষীরের মিষ্টান্ন পাওয়া যায়, এইরূপ দোকান এখানে অনেক থাকায় যাত্রী যত বেশী হউক না কেন, কাহাকেও খাদ্য-সামগ্রীর জন্য কোনরূপ কষ্ট পাইতে হয় না, আর এক কথা—সকল দোকানেই সচরাচর আটার লুচি বিক্রয় হইয়া থাকে, কিন্তু যদ্যপি কোন গ্রাহক সেই সকল দোকানে ময়দার লুচির জন্য আদেশ করেন, তাহা হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ ময়দার লুচি ভাজিয়া দিয়া থাকেন। অনেকের এখানকার ব্যবস্থা জানা না থাকায় তাহারা মনে করেন, গয়াতে বোধ হয় ময়দার লুচি পাওয়া যায় না। এইরূপ আর একটী বিষয় বলিব, গয়াতে পাই অর্থাৎ

ইংরাজি পাই, ঢেপুয়া ও কলিকাতার পয়সা প্রচলিত আছে, কিন্তু কলিকাতার পয়সা এখানে "ডবল" বলিয়া প্রসিদ্ধ। কোন দ্রব্য-সামগ্রী খরিদ করিবার সময় দোকানীরা পাই হিসাবে দর চায়, কিন্তু বিদেশী সরল যাত্রীরা তাহাদের নিকট ইংরাজী পাইএর দ্রব্য লইয়া একটী কলিকাতার প্রচলিত পয়সা দিয়া থাকেন, ইহাতে তাহাদের অনেক ক্ষতি হয়, অতএব এক পয়সার দ্রব্য খরিদের সময় "ডবল" বলিয়া চাহিবেন, ইহার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না।

আমরা বুদ্ধগয়া হইতে তীর্থ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক এখানকার যাবতীয় নিয়মগুলি পালনসহকারে—ব্রাহ্মণ, গয়ালীভোজন, আরও গয়ালীদিগের [illegible] ও সুফল গ্রহণপূর্ব্বক গয়া হইতে কাশী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। গয়াতে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া তাঁহাদিগকে সাধ্যমত দক্ষিণা দানে সন্তুষ্ট করিতে পারা যায়, কিন্তু একটী গয়ালী ভোজন করাইলে তিনি অভাব পক্ষে ॥০ আনার কম দক্ষিণা গ্রহণ করেন না। সে যাহা হউক, আমরা এইরূপে তীর্থশ্রেষ্ঠ গয়ার নির্দ্দিষ্ট নিয়মগুলি পালন করিয়া এবার এখান হইতে কর্ড লাইনের সাহায্যে বক্সার ষ্টেশনের মধ্যপথ দিয়া কাশীর বিশ্বেশ্বরের শ্রীচরণ বন্দনার নিমিত্ত শুভ যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে একবার এই বক্সারের জগদ্বিখ্যাত কেল্লার নৈপুণ্য ও স্থাপত্য কৌশল দেখিবার জন্য অল্প সময় নষ্ট করিয়া বক্সার ষ্টেশনে অবতরণ করিয়াছিলাম।

বক্সার

বক্সার—ই-আই-রেল কোম্পানীর একটী বিখ্যাত জংশন ষ্টেশন পুরাকাল হইতে ইংরাজ রাজত্ব পর্য্যন্ত এখানে অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হওয়াতে ভারতবাসীর নিকট ইহার নাম আরও প্রসিদ্ধ হইয়াছে। হিন্দু রাজন্যবর্গের সহিত এই বক্সারে দ্বিতীয় যুদ্ধে যে সন্ধিস্থাপনা হয়, তাহাতে মোগল সম্রাট সা-আলমকোরা এলাহাবাদ ও দেয়ার। নবাব সুজাউদ্দৌলা অযোধ্যা এবং ইংরাজেরা বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যা ... লাভ করেন। তৎকালীন সেই প্রসিদ্ধ নবাব কাসিমআলি খাঁর প্রাচীন প্রাসাদ ভবনের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানেই ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রের তপোবন ছিল। কথিত আছে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করিয়া সীতাদেবীকে বিবাহ করিতে যাইবার সময় স্বেচ্ছায় তাঁহার তপোবনে অবস্থান করিয়া ঋষির মনো-বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন, তৎপরে এখান হইতে মিথিলায় যাইবার পথে ছাপরার সন্নিকট মহামুনি গৌতমের আশ্রমে পদার্পণ করিলে সেই পবিত্র পাদস্পর্শে শাপভ্রষ্টা গৌতম পত্নী "অহল্যাদেবী" আপন স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বক্সার ষ্টেশনের অনতিদূরে মহাকায়া মহা-মায়াবিনী তারকা রাক্ষসীর বিহার স্থান ছিল। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এক শরে তাহাকে বিনাশপূর্ব্বক উদ্ধার করিলে যে স্থানে তাহার মৃতদেহ পতিত হয়, সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানটী অদ্যাপি এখানে "তারকা নালা" নামে প্রসিদ্ধ হইয়া অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই মায়াবিনী তারকা রাক্ষসীকে বিনাশ করিবার পর রঘুবীর, নিকটস্থ স্রোতগামী গঙ্গাতে

ষ্ঠান করিয়া এখানে যে লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক পূজা করেন,সেই রামেশ্বরদেব অদ্যাপি বক্সারে বর্ত্তমান থাকিয়া ভক্তগণকে দর্শনদানে উদ্ধার করিতেছেন। যাত্রীগণ এ স্থানে এই রামেশ্বরদেবের দর্শনের কাঙ্গাল হইয়াই আসিয়া থাকেন। স্থানীয় পূজারীদিগের নিকট উপদেশ পাইলাম, যদি কোন স্ত্রীলোক ভক্তিসহকারে এই শ্রীরামচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের মস্তকে গঙ্গাবারি প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি অব্যর্থ তাঁহার কৃপায় শ্রীরাম-পত্নী সীতাদেবীর ন্যায় মনের মত পতি রত্নলাভ করিতে সমর্থ হন।

বক্সারে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের একটী প্রকাণ্ড অশ্বশালা স্থাপিত আছে। [illegible] অশিক্ষিত বন্য অশ্বগুলি যত্নের সহিত সুশিক্ষিত হইয়া বিবিধ দেশে যুদ্ধার্থে প্রেরিত হইয়া থাকে। বৎসরের মধ্যে দুই বার এখানে দুটী মেলা হয়, ইহার প্রথমটী মাঘীসংক্রান্তিতে অপরটী চৈত্র সংক্রান্তিতে মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। কর্ম্মোপলক্ষে বক্সারে বিস্তর বাঙ্গালীদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

কাশী

গয়া ষ্টেশন হইতে অবিমুক্ত ক্ষেত্র বা কাশী যাইতে হইলে ই-আই-রেলযোগে মোগল সরাই নামক ষ্টেশনে নামিয়া আউদ-রহিলখণ্ড রেলের পৃথক্ লাইনে কাশী বা বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। কলিকাতা হইতে কাশী ৪২৯ মাইল দূরে অবস্থিত, কিন্তু গয়া হইতে কাশীর দূরতা ১৩৭ মাইল মাত্র। আমরা গয়া হইতে বক্সার তৎপরে কাশী যাত্রা করিয়াছিলাম, কাশী সহরটী গঙ্গার উত্তরতীরে দুই ক্রোশ স্থান অধিকার করিয়া আছে, কিন্তু ইহার পরিধি পঞ্চ ক্রোশ, সহরের সম্মুখেই গঙ্গা অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি অবস্থায় অবস্থিত। এই স্থানের কূপ, মৃত্তিকা, নদ ও মন্দির এমন কি যে সকল ভক্ত এখানে বাস করেন, স্থান মাহাত্ম্যগুণে সে সমস্তই পবিত্র। এ তীর্থে গঙ্গাতীরবর্ত্তী ৭০ হাত উচ্চ একটী পাহাড়ের উপরিভাগে কাশী সহরটী প্রতিষ্ঠিত। যে সকল যাত্রী কাশী নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিবেন, তাঁহারা অশ্বযান বা জলযানে তীর্থতীরে উপস্থিত হইতে পারেন। জলযানে যাত্রাকালীন পাহাড়ের উপরিভাগ হইতে গঙ্গাতীর পর্যান্ত পাথরের ধাপযুক্ত বাঁধান ঘাটগুলির মনোহর দৃশ্যাবলি নয়নপথে পতিত হইলে আনন্দে অধীর হইবেন—আর যাঁহারা বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্টে নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিবেন, তাঁহারা তথা হইতে অশ্বযানে সহরের

মধ্য পথ দিয়া তীর্থতীরে যাত্রা করেন। এ সহরটী কেবল মন্দির, মসজিদ ও সুন্দর সুন্দর পাঁচতালা, ছয়তালা অট্টালিকা, এতদ্ভিন্ন ষাঁড় ও সিঁড়ীতে পরিপূর্ণ। যে সকল যাত্রী কাশী নামক ষ্টেশন হইতে গঙ্গার এক টানা স্রোতে নৌকায় উঠিয়া তীর্থতীরে যাইবেন, তাঁহারা সহরের প্রতি একবার দৃষ্টি করিলে প্রথমেই মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের অত্যুচ্চ সুন্দর স্তম্ভযুক্ত মসজিদটী দেখিতে পাইবেন। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত কাশীর একটী সাধারণ দৃশ্যের চিত্র প্রদত্ত হইল।

পুণ্য স্থান কাশী—পূর্ব্বে এত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ছিল না, ইহার অধিকাংশ স্থানই বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল,তথাপি ভক্তগণ কাশী মাহাত্ম্য অবগত হইয়া সেই দুর্গম পথে স্ত্রীপুত্র সমভিব্যাহারে দলে দলে উপস্থিত হইতেন এবং ভগবান বিশ্বেশ্বরের দর্শন ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মণি-কর্ণিকাতে স্নান করিয়া আপনাপন মুক্তিপথ পরিষ্কার করিতেন। তৎ-পরে ১৭৭৫ খৃঃ যখন নগরটী ইংরাজদিগের অধীন হয়, তদবধি ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। সেই প্রাচীন বনজঙ্গলাবৃত কাশী বর্ত্তমানকালে একটী বিখ্যাত সহরে পরিণত হইয়াছে। এখানে কলের জল, গ্যাসের আলো, পুলিস, আদালত, জজকোর্ট প্রভৃতি আরও অশ্বযান, গো-যান, একা গাড়ী বা আহারীয় কোন দ্রব্যেরই অভাব নাই। কাশীতে সকল ধর্ম্মাবলম্বীর লোকদিগকে অবস্থান করিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

কাশী—হিন্দুদিগের একটী প্রাচীন মহাতীর্থ স্থান। এখানে জীবগণ শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় করিয়া পরম ব্রহ্মে লীন হইতে সমর্থ হয় বলিয়া ইহার নাম কাশী হইয়াছে। কাশীতে হিন্দুদিগের প্রতিষ্ঠিত যত দেবালয় আছে, অপর কোন তীর্থ স্থানে এত অধিক নাই। কাশীর পথগুলি অতি বক্র এবং কতকগুলি রাস্তা এত সঙ্কীর্ণ যে গাড়ী চলে না, সে যাহা হউক, এখানকার গলিপথে প্রবেশ করিলে নূতন যাত্রীদিগকে

সহজেই ভ্রমে পতিত হইতে হয়, কারণ সমস্ত গলি পথগুলির আকৃতি প্রায় একই রূপ। অধিকাংশ বাটীগুলি প্রস্তর নির্ম্মিত, এই গলি পথের দুই পার্শ্বে যে সকল বাটী নির্ম্মিত আছে, তাহার অনেক স্থলে ছয়তালা উচ্চ অট্টালিকাগুলি পরস্পর সংযুক্ত থাকায় যেন একটী বাটী বলিয়াই অনুমান হয়। সকল প্রকার পণ্য দ্রব্য এখানে পাওয়া যায়, নানা ধরণের পিত্তলের বাসন, চুরি, জরির সাড়ী ও কিংখাপ এই সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী এখানকার বিখ্যাত।

যাত্রীগণ কাশীর তীর্থতীরে উপস্থিত হইয়া প্রথমে স্ব স্ব পাণ্ডা মনোনীত করিয়া লইবেন, তৎপরে তাঁহাদের প্রদত্ত বাসা বাটীতে আপন দ্রব্য-সামগ্রী স্থাপনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর যে দেবের দর্শনের কাঙ্গাল হইয়া কত কষ্ট কত অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়া এই পুণ্য স্থানে উপস্থিত হইলেন, এক্ষণে পাণ্ডার সাহায্যে ধুলা পায়ে সেই ভগবান বিশ্বেশ্বরজীউর পবিত্র লিঙ্গমূর্ত্তি একবার দর্শন করিবেন। আমরা কাশীতে উপস্থিত হইয়া রামঠনাঠন লক্ষ্মীনারায়ণ নামক এক ব্যক্তিকে পাণ্ডাপদে মান্য করিয়াছিলাম। তাঁহার ঠিকানা—দশাশ্বমেধ ঘাটের উপরিভাগে।

প্রথম দিবসেই চক্রতীর্থ বা মণিকর্ণিকাতে স্নান করিবার নিয়ম। কাশীতে এই প্রথম স্নানের সময় পৈতা, গুপারি বা হরিতকী, পঞ্চরত্ন, নারিকেল ও পুষ্পের আবশ্যক হইবে। সর্ব্বপ্রথমে যথানিয়মে এই চক্রতীর্থে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান, তর্পণ সমাপ্ত করিবার পর স্থানীয় তীর্থঘাটের উপরিভাগে ৬তারকব্রহ্ম তারকেশ্বর ও ঈশানেশ্বরদেবকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া দর্শন করিবেন। কেন না, এই প্রভু কাশীবাসীগণের অন্তিম সময় স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তারকব্রহ্ম নাম প্রদান করিয়া জীবগণকে ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন; প্রমাণস্বরূপ দেখিতে

পাওয়া যায় যে—কাশীস্থ জীবগণ মৃত্যুকালীন তাহাদের দক্ষিণ কর্ণ উত্তোলন করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। এ হেন কাশীতে কাহার না বাস করিতে ইচ্ছা হয়? তৎপরে ভগবান বিশ্বেশ্বরের দর্শন পথে ঢুণ্ডি-রাজ গণেশজীউ, দণ্ডপাণি, শূলপাণি, মহেশ্বর ও মহাবিষ্ণু প্রভৃতি দেব-গণকে দর্শন ও অর্চ্চনা করিবেন। এই সমস্ত পবিত্র বিগ্রহ মূর্ত্তির দর্শনান্তে দেবাদিদেব ভগবান বিশ্বেশ্বরের শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইয়া মনোমত মানত প্রার্থনা করিবেন এবং ভক্তিসহকারে ভক্তিদানপূর্ব্বক তাঁহার পূজার্চ্চনা করিবেন। পূজার সময় গঙ্গা জল, পুষ্প, বিল্বপত্র, আতপ-তণ্ডুল, গাঁজা, সিদ্ধি, দুগ্ধ, রক্তচন্দন, সাধ্যমতে স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্ম্মিত বিল্বপত্র দক্ষিণাসহ নৈবেদ্য প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক পূজার্চ্চনা করিতে হয়। পূজা সমাপনান্তে মন্দির প্রদক্ষিণ করিবার বিধি আছে।

মহাদেবের প্রণাম—নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্য চক্ষুষে নমঃ পিনাক হস্তায় বজ্র হস্তায় বৈ নমঃ। নমঃ ত্রিশূল হস্তায় দণ্ডপাণি পাণয়ে। নমঃ ত্রৈলোক্য নাথায় ভূতানাং পাতয়ে নমঃ। নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে, নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বংগতি পরমেশ্বর।

অস্যার্থঃ—হে পরমেশ্বর! তুমি মঙ্গলস্বরূপ, তুমি শান্তমূর্ত্তি, জগতের কারণ, যে সত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনের কারণ তুমি, আমি তোমাকে আত্মসমর্পণ করিতেছি, কেন না তুমিই জগতের একমাত্র গতি; হে দেবাদিদেব মহেশ্বর! তুমি সকল লোকের গুরু ও ঈশ্বর এবং যে সকল ব্যক্তির ইচ্ছা পূর্ণ হয় না, তাহাদের ইচ্ছা পূরণ করিতে তুমি কল্পতরুর ন্যায়, সুতরাং আমি তোমাকে অন্তরের সহিত প্রণাম করি।

তৎপরে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা দক্ষিণ গণ্ডে আঘাত করিয়া "বম্ বম্" শব্দে মুখবাদ্য করিতে হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—পূজান্তে দেবতাকে নির্ম্মাল্যে রাখিতে নাই, কি দিবা, কি রাত্র সকল সময়েই উত্তর মুখে শিবপূজা কর্ত্তব্য।

বিশ্বেশ্বর মহাদেবের স্বুবর্ণ মন্দিরই এখানকার সর্ব্বপ্রধান, অর্থাৎ কাশী নগরে ছোট বড় অনূান ১৫০০ শত মন্দির আছে, তন্মধ্যে ভগবান বিশ্বেশ্বর ও কেদারেশ্বরজীউর মন্দির—এই দুইটীরই মান্য অধিক। বিশ্বেশ্বরজীউর মন্দিরটী প্রদক্ষিণ করিবার সময় ইহার চতুর্দ্দিকে বিবিধ প্রকার শিবলিঙ্গ মূর্ত্তির দর্শন লাভে কত আনন্দ অনুভব করিবেন, উহা লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, কেন না, মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব, বিশ্বেশ্বরের আদি মন্দিরটী ধ্বংস করিবার আদেশ প্রদান করিলে এই সকল বিগ্রহ মূর্ত্তি তথা হইতে আনীত হইয়া এই নবপ্রতিষ্ঠিত মন্দিরের চতুর্দ্দিকে যথানিয়মে স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই মন্দিরটী সামান্যরূপে নির্ম্মিত ছিল। কোন এক সময় মহারাজ রণজিতসিংহ বাহাদুর সাংঘাতিক পীড়াক্রান্ত হইলে,তিনি দীর্ঘ জীবন ও আরোগ্যলাভের আশায় ভগবান বিশ্বেশ্বরের নিকট মানত করেন যে, "ভগবান আমায় রোগমুক্ত করুন, আমি আরোগ্য হইলে আপনার শ্রীমন্দিরটী নূতন কলেবরে নির্ম্মাণ করাইয়া ইহা স্বর্ণপাতে মণ্ডিত করিয়া দিব।" বিশ্বেশ্বরের কৃপায় তিনি অল্পদিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিলে পর, রাজা নিজ ব্যয়ে বর্ত্তমান মন্দিরটী নির্ম্মাণ করাইয়া পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা পালন করেন। এই মন্দিরটী সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট এবং হস্ত দ্বারা যত দূর স্পর্শ হয়, তাহার উপর হইতে উচ্চ চূড়া পর্য্যন্ত সমস্তই স্বুবর্ণ পাতে আবৃত। চূড়ার শীর্ষদেশে ত্রিশূল ও তৎপার্শ্বে একটী স্বর্ণের পতাকা বায়ুভরে আন্দোলিত হইতেছে, ইহার এই সকল সৌন্দর্য্য দর্শন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। সম্মুখেই নাটমন্দির, তথায় এক শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত ভগবানের বাহন "বৃষমূর্ত্তিটী" এখানকার শোভা বিস্তার করিয়া আছে।

মন্দির চত্বরের উপরিভাগে এক বৃহৎ ঘণ্টা দোদুল্যমান—ভক্তগণ ইহাতে ঘা দিয়া আপনাপন আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিয়া থাকেন। নাট-মন্দিরে এই বৃষমূর্ত্তি ব্যতীত আরও অপরাপর বিস্তর লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এ তীর্থে উপস্থিত হইয়া সাধ্যমত দেবতা, ব্রাহ্মণ ও অতিথি-দিগকে তৃপ্তিসাধন করিবার চেষ্টা করিবেন, কখন কাহারও সহিত অসৎ ব্যবহার, কলহ বা পাপ কার্য্যে মন দিবেন না, কারণ কথিত আছে, মহাদেবই কাশীর সৃষ্টিকর্ত্তা ও রাজা—এ রাজ্যটী তাঁহার ত্রিশূলের উপরেই অবস্থিত। এই অবিমুক্তক্ষেত্রে অগণ্য ছোট ছোট দেবালয় ব্যতীত বিস্তর প্রসিদ্ধ মন্দির ও ২০০ শত মসজিদ শোভা পাইতেছে। হিন্দুরা যেরূপ শেষ অবস্থায় কাশীবাস করিতে ভালবাসেন, মুসল-মানেরাও সেইরূপ মক্কায় বাস করিতে বাসনা করেন।

ভক্তমাত্রেই কোন পবিত্র তীর্থ স্থানে উপস্থিত হইয়া মৎস্য ভক্ষণ করেন না। ইহার প্রধান কারণ এই যে মৎস্য—সকল প্রাণীর মাংস আহার বা ভক্ষণ করিয়া থাকে, সুতরাং মৎস্য ভক্ষণ করিলে সকল প্রাণীর মাংসই ভক্ষণ করা হয়; এই কারণবশতঃ তীর্থ স্থানে মৎস্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ। কথিত আছে, ভগবান মহেশ্বর মৎস্য মাংসাহারী ব্যক্তি-গণের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করেন।

যাহারা সতত মৎস্য ভক্ষণ করেন, তাহাদের জানা আবশ্যক, কোন্ স্থানের কিরূপ মৎস্যের আস্বাদ করিলে পরিণামে স্বাস্থ্যের গুণ কিরূপ উৎপন্ন হয়;—

সরোবরজাত মৎস্য—মধুর, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক ও বল-কারক।

নদী মৎস্যের গুণ—মধুর, পুষ্টিকর, শ্লেষ্মাসঞ্চারক ও মৃদু বিরেচক।

নির্ঝরজাত মৎস্য—শুক্র, বল এবং চক্ষুদীপ্তি বৃদ্ধিকর।

কূপজাত মৎস্য—শুক্র, শ্লেষ্মা ও মলমূত্র বৃদ্ধিকারক।

লবণাক্ত এবং অল্পজলের মৎস্য—নিস্তেজ।

বৃহৎ মৎস্য—শুক্র বৃদ্ধিকর, মলবৃদ্ধিকারী ও গুরুপাক।

ক্ষুদ্র মৎস্য—বলকারক, লঘু ও ধারক।

শুষ্ক মৎস্য—কফনাশক, বিরেচক ও অত্যন্ত গুরুপাক।

পচা মৎস্য—বায়ু, পিত্ত, কফ বৃদ্ধিকর।

পোড়া মৎস্য—মাংস, শুক্র ও বলবৃদ্ধিকারক।

ভাজা মৎস্য—শুক্র ও বলবৃদ্ধিকর।

লোনা মৎস্য—সারক, রোচক, কফ ও পিত্ত বৃদ্ধিকর এবং গুরুপাক।

শাক মৎস্য অর্থাৎ (মৎস্যের দম)—অত্যন্ত পুষ্টিকর ও শুক্রবৃদ্ধিকর।

আঁইসযুক্ত মৎস্যমাত্রেই—বল, বীর্য্য ও পুষ্টিকর।

মৎস্য ডিম্ব—মেহনাশক ও অতিশয় শুক্রবৃদ্ধিকর, পুষ্টিকর, বলকারক, কফ ও মেদবৃদ্ধিকর, কিন্তু ইহা অস্বাস্থ্যকর ও গুরুপাক।

প্রতি সন্ধ্যার পর কাশীতে বিশ্বেশ্বরের যথানিয়মে আরতি হইয়া থাকে। ভক্তগণ এই পবিত্র স্থানে উপস্থিত হইয়া সকল কর্ম্ম পণ্ড করিয়া সন্ধ্যার পর ভগবানের এই আরতি দর্শন করিতে অবহেলা করিবেন না, কারণ ঘণ্টাব্যাপী এই আরতির সময় মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণের সরিৎসার বেদপাঠ ও সুমধুর মন্ত্র উচ্চারণ, ভক্তদিগের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলেই এক অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় ভাবের উদয় হইয়া হৃদয়ে

যেন আরতি বাদ্যের সহিত "হর-হর বোম্‌-বোম্‌" শব্দে আনন্দিত করিয়া তাঁহারই ধ্যানে নিমগ্ন করিতে থাকে। ইহা দর্শনে মহা পাপীর পাষাণ হৃদয়ও ভক্তিরসে দ্রব হয়।

সন্ধ্যা—যিনি গায়ত্রী, তিনিই সন্ধ্যা। একই দ্বিধা হইয়া ভিন্ন নামে অবস্থান করিতেছেন, সুতরাং এই সন্ধ্যার উপাসনা করিলে বিষ্ণুর উপাসনা করা হয় এবং এই নিমিত্ত যাবতীয় দেবালয়েই যথা-নিয়মে যথাসময়ে সন্ধ্যা আরতি হইয়া থাকে।

অন্নপূর্ণাদেবীর মন্দির—ভগবান বিশ্বেশ্বরের শ্রীমন্দিরের পশ্চিমপার্শ্বে এই দেবালয়টী অবস্থিত। এই দেবী-মন্দিরের চতুর্দ্দিকই ভিক্ষুকে পরিবৃত। ইহা বিশ্বেশ্বরজীউর মন্দির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহদায়তন বলিয়া অনুমান হয়, মন্দিরাভ্যন্তরে নানালঙ্কারে ভূষিতা মা যেন ভুবনমোহিনীরূপে পুরী আলোকিত করিয়া ভক্তগণকে দর্শনদানে উদ্ধার করিবার জন্য বিরাজ করিতেছেন। এখানকার পূজারী ব্রাহ্মণকে প্রণামী ব্যতীত পৃথক্‌ কিছু অর্থ দান করিলে তিনি সন্তুষ্টচিত্তে ভক্তগণকে মায়ের শিলাপোরি আদি মূর্ত্তি দর্শন করাইয়া থাকেন। আমরা বাটী হইতে দেবীর পূজার্চ্চনার নিমিত্ত যে সিন্দুর, কর্পূর, সাজসমেত সিন্দুর-চুবড়ী, লালপাড় সাড়ী, সোণার নথ, লোহা, খালা, গেলাস ও মসলা প্রভৃতি সাধ্যমত সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম, ঐ সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী দেবীস্থানে যথানিয়মে প্রদানপূর্ব্বক আপনাপন ব্রত উদ্‌যাপন করিলাম। জগজ্জননীর এক পার্শ্বে ভগবান সূর্য্যদেবের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজমান থাকিয়া মোহান্ধ মানবদিগকে সেই দেবীমূর্ত্তির শ্রীচরণ ধ্যান করিতে উপদেশ দিতেছেন।

অন্নপূর্ণাদেবীর মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমদিকে ঢুণ্ডিরাজ গণেশজীউর দেবালয় অবস্থিত। এই দেবের পূজার্চ্চনা একান্ত কর্ত্তব্য, কেন না,

সিদ্ধিদাতা গণেশজীউর কৃপায় ভক্তের সকল বাসনা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

কালভৈরবনাথের মন্দির—এই দেবালয়ে প্রবেশ করিলে সর্ব্বপ্রথমে ভৈরবনাথের রৌপ্যময় দুইটী চক্ষু ও পার্শ্বে তাঁহার বাহন, কুক্কুরের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ভৈরবনাথ কাশীর কোতয়ালরূপে কাশীবাসীদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন।

একদা "অব্যয় কে ?" এই বিষয় তর্ক করিতে করিতে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়ে বিবাদ উপস্থিত হয়। বিবাদ স্থলে মূর্ত্তিমান চারি বেদ উপস্থিত হইয়া মহাদেবকে "অব্যয়" বলেন, তথাপি তাঁহারা বিবাদ করিতে থাকেন, এমন সময় পাতাল হইতে এক জ্যোতিঃ উত্থিত হইল; সেই জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি মধ্যে শূলপাণি রুদ্রকে দেখিয়াই ব্রহ্মা কহিলেন, "রুদ্র! আমি তোমার পিতা, তুমি আমাকে প্রণাম কর।"

রুদ্রদেব তৎশ্রবণে কুপিত হইলে, তাঁহার ললাট হইতে এক ভয়ঙ্কর পুরুষ বাহির হইল—তিনিই কালভৈরব। রুদ্রদেবের আজ্ঞায় সেই ভয়ঙ্কর পুরুষ মূর্ত্তি ব্রহ্মার উর্দ্ধদিকের এক মস্তক ছেদন করিলেন; তদ্দর্শনে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়েই তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া তিনি শান্তমূর্ত্তি ধারণ করতঃ বিবাদে ক্ষান্ত হইলেন সত্য, কিন্তু ব্রহ্মার ছিন্ন মস্তক হস্ত হইতে স্খলিত হইল না; সুতরাং ইহার প্রতিকারকল্পে তিনি নানা তীর্থ স্থান পর্য্যটন করিয়া অবশেষে কাশীতে প্রবেশ করিবামাত্র সেই হস্তসংলগ্ন ছিন্ন মস্তক স্খলিত হইয়া পড়িল, তখন কালভৈরব বলিলেন, "আহা, কাশী কি মহাতীর্থ! আমি আজ হইতে এই কাশী সহরের প্রতিহারী রহিলাম।" এই নিমিত্ত যাত্রীগণ কাশীতে আসিয়া কালভৈরবদেবের পূজা করিয়া থাকেন। কেন না, এই দেবকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে কাশীবাসের বিঘ্ন ঘটে।

জ্ঞানবাপী—গণপতি কৃত একটী পবিত্র কূপ। বাপীর তলায় যাইবার সোপান আছে, ইহার নিম্নদেশ কাশীর উত্তরগামিনী গঙ্গার সহিত সংলগ্ন। ঐ স্থানে নন্দীর একটী প্রতিমূর্ত্তি আছে, অর্থাৎ সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রস্তরময় বৃষ স্থাপিত হইয়াছে। কথিত আছে, গজানন—ভগবান বিশ্বেশ্বরকে স্নান করাইবার জন্য তাঁহার আদেশ মত তাঁহারই ত্রিশূলের দ্বারা এখানে এই কূপটী খনন করেন এবং বিশ্বেশ্বরকে উহাতে স্নান করান। বিশ্বেশ্বর এই কূপজলে স্নান করিয়া সন্তুষ্ট হইলে গণেশকে বরপ্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন, তখন গণেশ সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া এই প্রার্থনা করিলেন যে, "ভগবান্! আপনার বরপ্রভাবে এই কুণ্ড যেন কাশীর সর্ব্ব তীর্থাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়।"

বিশ্বেশ্বর "তথাস্তু!" বলিয়া এই কূপের নাম "জ্ঞানবাপী" রাখিলেন এবং বলিলেন, যে ব্যক্তি কাশীতে আসিয়া তোমার নির্ম্মিত এই বাপীর সেবার্চ্চনা করিবে, সে আমার কৃপায় দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া অন্তে স্বর্গারোহণ করিতে সমর্থ হইবে। এই হেতু ভক্তগণ কাশীতে আসিয়া মুক্তি কামনা করিয়া জ্ঞানবাপীর পূজার্চ্চনা করিয়া থাকেন। যেরূপ গুরুদীক্ষা ব্যতীত কোন কর্ম্মশুদ্ধ হয় না, সেইরূপ কাশীতে আসিয়া এই জ্ঞানবাপীর পূজার্চ্চনা না করিলে তাহার কোন কর্ম্মই শুদ্ধ হয় না।

শীতলাদেবীর মন্দির—জ্ঞানবাপীর সন্নিকটেই শীতলাদেবীর মন্দির বিদ্যমান। এই প্রশস্ত মন্দির মধ্যে শীতলাদেবীসহ তাঁহার সপ্ত ভগ্নীর দর্শনলাভ করিতে সমর্থ হইবেন। ভক্তগণ এই দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া শীতলাদেবীর কপালে সিন্দূর দান করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিয়া থাকেন।

নবগ্রহের মন্দির—কালভৈরব ও দণ্ডপাণির মন্দিরের মাঝামাঝি স্থানে নবগ্রহদেবের মন্দিরটী অবস্থিত। মনুষ্যমাত্রেরই এই নব-

গ্রহকে পূজার্চ্চনা করিয়া সন্তুষ্ট রাখা কর্ত্তব্য, কেন না—মানবদেহ ধারণ করিলেই তাঁহাদের ফলভোগ করিতে হয়। এই সকল গ্রহগণকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে সকলেই সুখে থাকিতে পারেন।

মনুষ্যমাত্রেই এই নবগ্রহ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকেন, সুতরাং প্রত্যহ শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে গ্রহগণের যথানিয়মে স্তব করিতে পারিলে উক্ত ব্যক্তির দিন স্বচ্ছন্দে ভালয় ভালয় অতিবাহিত হয়, কিন্তু তাঁহাদের ফলভোগ করিতে হয়। বলাবাহুল্য যে, গ্রহগণ তুষ্ট থাকিলে তাঁহারা ভক্তগণের প্রতি শান্তভাবে ফলদান করিয়া থাকেন, অতএব সুধীব্যক্তির প্রত্যহ নবগ্রহের স্তব করা উচিত। কথিত আছে, স্বয়ং গুরুকেও তাঁহাদের ফলভোগ করিতে হয়, এ বিষয়ে একটী প্রাচীন উপাখ্যান প্রকাশিত হইল।

পুণ্যস্থান নবদ্বীপের অন্তর্গত কোন এক পল্লীর প্রান্তভাগে দেবনারায়ণ নামক জনৈক আচার্য্য বাস করিতেন। তথায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটী চতুষ্পাটী টোল ছিল, স্বয়ং দেবনারায়ণ উক্ত টোলে সাধ্যমত ছাত্রদিগকে শিক্ষাদান করিতেন এবং তাহাদের গুণানুসারে উপাধি প্রদান করিতেন। ভাগ্যক্রমে যে কোন ছাত্র তাঁহার নিকট "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি প্রাপ্ত হইতেন,তাহাকে চির প্রথানুসারে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতে হইত। আচার্য্য দেবনারায়ণ মহাশয়ের অসাধারণ ক্ষমতার গুণে কখন কোন ছাত্র কোথাও পরাজয় স্বীকার করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় নাই। দেবনারায়ণ এই কারণে ত্রিভুবন বিখ্যাত হইয়াছিলেন, এমন কি স্বর্গেও এই মহাত্মার কীর্ত্তি সতত ঘোষিত হইত।

একদা গ্রহগণ পরীক্ষা করিবার অভিলাষে নয়টী সুশ্রী কুমারবেশে মর্ত্ত্যধামে এই আচার্য্য মহাশয়ের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিবার অভিলাষ

অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন। এতাবৎকাল দেবনারায়ণের কোন সন্তান সন্ততি না থাকায় এবং এই সকল বালকরূপী গ্রহগণের ভক্তি ও শ্রদ্ধাতে মুগ্ধ হইয়া তিনি আগ্রহের সহিত তাঁহাদের অভিলাষপূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। এইরূপে তাঁহারা আশ্রয়প্রাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণীও বাৎসল্যভাবে উক্ত নয়টী বালককে স্বীয় পুত্রের ন্যায় পালন করিতে লাগিলেন। এদিকে অল্পদিনের মধ্যে তাঁহারা টোলের যাবতীয় ছাত্রদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিলে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাল্যস্বভাববশতঃ অপরাপর ছাত্রেরা ঈর্ষান্বিত হইয়া যাহাতে তাঁহারা তথায় আর না থাকেন, এই অভিপ্রায়ে ঐ সকল বালকদিগের প্রতি কুব্যবহার করিতে লাগিলেন। গ্রহগণ সহপাঠীদিগের মনোভাব অবগত হইয়া সকলে পরামর্শপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিতে মনস্থ করিলেন।

পর দিবস প্রত্যুষে যথানিয়মে যথাসময়ে তাঁহারা সকলে কৃতাঞ্জলিপুটে গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া আপনাপন বক্তব্য বিষয় জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, "গুরো! আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমরা সকলেই এখানে নিরাপদে অবস্থান করিয়া পরম সুখে দিনাতিপাত করিয়াছি এবং আপনার কৃপায় যাহা শিক্ষালাভ করিয়াছি, উহাতেই নিজেরা গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি, এক্ষণে সবিনয় প্রার্থনা—আপনি স্বেচ্ছায় আমাদের নিকট হইতে দক্ষিণা গ্রহণপূর্ব্বক বিদায়ের অনুমতি প্রদান করুন।"

আচার্য্য মহাশয় তাঁহাদের মায়ায় অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং এত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহারা যে তাঁহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিবেন, তাহা তিনি পূর্ব্বে একবার স্বপ্নেও কখন ভাবেন নাই, সুতরাং এই মর্ম্মভেদী বাক্যে গুরুজীকে আন্তরিক দুঃখিত হইতে হইল। বলাবাহুল্য, মায়ার মোহিনীশক্তিতে তিনি বহুক্ষণ এই সকল চাঁদমুখ নিরী-

ক্ষণ করাতে গুরুজীর হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল। তখন তিনি বালকগুলিকে মধুর সম্ভাষণে বলিলেন, "বৎসগণ! তোমা-দের ভক্তিতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি এক্ষণে তোমাদের শিক্ষাগুরু, অতএব আমার নিকট অকপটচিত্তে তোমাদের সঠিক পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক সাধ্যমত দক্ষিণা প্রদান কর।" গ্রহগণ তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তখন আপনাপন যথার্থ পরিচয় প্রদান করিলেন। এই অসম্ভব ব্যাপারে গুরুজী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া স্বীয় পত্নীর নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কাহার নিকট কিরূপ দক্ষিণা গ্রহণ করিবেন, ইহাই বহুক্ষণ বাদানুবাদের পর স্থির করিয়া বলিলেন, "দেবগণ! বহু পুণ্যফলে আপনাদের দর্শন পাই-য়াছি, এক্ষণে সদয় হইয়া আপনাদের আটজনের মধ্যে যাঁহার যাহা ইচ্ছা, সেইরূপই দক্ষিণা প্রদান করুন।" শনিঠাকুরকে অনুরোধ করি-লেন, "দেব! আপনি সদয় হইয়া কেবল আপনার কোপদৃষ্টির ভোগ হইতে পরিত্রাণ করিলে আমি পরমানন্দ অনুভব করিব।"

ছদ্মবেশী শনি—তখন গুরুর বাক্যে সন্তুষ্টচিত্তে বলিলেন, "গুরো! আপনি সকল শাস্ত্রই অবগত আছেন, আপনাকে অধিক বলিবার আমার কিছুই নাই। দেখুন, পার্ব্বতী পুত্র "গণেশ" আমার ভাগিনেয় হইয়া আমারই কোপ দৃষ্টিতে মস্তকহীন হইয়াছিলেন, শেষে দেবগণের পরামর্শে শ্বেত হস্তীর শুণ্ডযুক্ত মুখ সংযোগে তাঁহাকে অবস্থান করিতে হইয়াছে। অতএব স্থির জানিবেন, জীবমাত্রকেই আমার ফলভোগ করিতে হয়। আপনি অবগত আছেন যে, মানব হৃদয়ে আমার পূর্ণ-কাল ভোগের সময়—চৌদ্দ বৎসর, চৌদ্দ মাস, চৌদ্দ দিন, চৌদ্দ দণ্ড নির্দ্ধারিত আছে, কিন্তু আমি আপনার পক্ষে সেই শেষ ন্যূন সংখ্যা চৌদ্দ দণ্ড সময়ই ধার্য্য করিলাম, এক্ষণে আশা করি, আপনি ইহাতে

আর কোনরূপ আপত্তি করিবেন না।" আচার্য্য মহাশয় তখন অগত্যা উহাতেই সম্মতিদান করিলেন।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইবার পর একদা অবসর মত শনি-ঠাকুর এই গুরুজীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন। তাঁহার কৃপামাত্র আচার্য্য মহাশয়ের মৎস্যের ঝোল আস্বাদ করিতে বাসনা হইল, সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীয় পত্নীকে ইহার উদ্যোগ করিতে অনুরোধ করিয়া মৎস্য আনিবার নিমিত্ত বাজারে গমন করিলেন এবং তথায় শনির কৃপায় একটী বৃহৎ রুই মৎস্যের মুণ্ড পাইয়া পরমানন্দ অনুভব করি-লেন। এদিকে এই শনিদেবের দৃষ্টির ফলে স্থানীয় সুসজ্জিত রাজ-পুত্রের মুণ্ড—দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিরুদ্দেশ হইল। মহারাজ এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য অবলোকন করিবামাত্র আন্তরিক দুঃখিত মনে কোটালকে সেই পাষণ্ড হত্যাকারীকে ধৃত করিতে আদেশ করিলেন। আজ্ঞাপ্রাপ্তে তাঁহার অনুচরবর্গ সহরের নানা স্থান পাতি পাতি সন্ধান করিবার সময় পথিমধ্যে এই আচার্য্য মহাশয়ের হস্তে রাজকুমারের ছিন্ন মস্তক অবলোকন করিয়া তাঁহাকেই হত্যাকারী সাব্যস্ত করিলেন এবং বন্ধনপূর্ব্বক রাজসমীপে হাজির করিলে—শোকাতুর রাজা তাঁহার নৃশংস আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া কারাগারে আবদ্ধ রাখিতে অনুমতি করিলেন। বলাবাহুল্য যে, শনির কৃপায় এখানে তাঁহার পলকে প্রলয় ঘটিল অর্থাৎ আচার্য্যের হস্তস্থিত সেই মৎস্যমুণ্ডের পরিবর্ত্তে রাজপুত্রের ছিন্ন মস্তক শোভা পাইতে লাগিল। এদিকে মহারাজ, কি অভিপ্রায়ে তাঁহার একমাত্র স্নেহের পুত্তলি সেই কুমারকে বিজ্ঞ আচার্য্য হত্যা করিয়াছেন, তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব সংগ্রহের নিমিত্ত সুযোগ্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলেন। গুরুজী এই অদ্ভুত ঘটনায় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং অকস্মাৎ বিপদে হতবুদ্ধি হইয়া কেবল শ্রীমধুসূদনকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

আচার্য্যের এই গর্হিত হত্যাকাণ্ডের বিষয় মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রতি নগরের পল্লীতে পল্লীতে প্রচারিত হইল। অপরদিকে আচার্য্য-পত্নী স্বামীর বিলম্ব দেখিয়া মৎস্যের নিমিত্ত পথপানে চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় এই দুঃসংবাদে তাঁহাকে কাতর করিল, কিন্তু সেই বুদ্ধিমতী আসন্ন বিপদে ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক কেবল এই বিষয়ই চিন্তা করিবার সময় শনিঠাকুরের বিষয় স্মৃতিপথে উদিত হইলে, তিনি অবিলম্বে বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কোনরূপে এই রাজমাহষীর অন্দর মহলে উপস্থিত হইলেন এবং বিনীতভাবে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, যাহাতে রাজা—মাত্র চৌদ্দ দণ্ড পরে তাঁহার স্বামীর প্রতি বিচারপূর্ব্বক দণ্ডাজ্ঞা বাহাল করেন। রাজ্ঞী শোকাতুরা হইলেও ব্রাহ্মণীর কাতর প্রার্থনায় পুত্রশোক সম্বরণপূর্ব্বক রাজসমীপে আশ্রিতার প্রার্থনা মঞ্জুর করাইয়া আপন মহত্ত্ব প্রকাশ করিলেন।

এইরূপে শনির চৌদ্দ দণ্ড ভোগ অতীত হইলে পর মহারাজা সহসা তাঁহার সেই একমাত্র স্নেহের কুমারকে জীবিতাবস্থায় তাঁহারই সম্মুখে নির্ব্বিঘ্নে পাদচারণ করিতেছে দেখিতে পাইলেন। বলাবাহুল্য, এই অদ্ভুত ঘটনায় তিনি পুত্রকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াও যেন স্বপ্নবৎ বোধ করিতে লাগিলেন। রাজা কুমারকে নিরাপদে দেখিতে পাইয়া পূজনীয় বৃদ্ধ আচার্য্য মহাশয়কে বৃথা কারাক্লেশ ভোগ করাইবার নিমিত্ত নানাপ্রকার অনুতাপ করিতেছেন, ইত্যবসরে ব্রাহ্মণী তথায় উপস্থিত হইয়া শনিঠাকুরের বিষয় আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা যথাযথ প্রকাশ করিলেন। রাজা তখন দেবচক্রের বিষয় স্থির অবগত হইয়া তাঁহাকে মুক্তিদান করিলেন। এইরূপে নিষ্কৃতি পাইয়া বৃদ্ধ আচার্য্য মহাশয় মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, শনিঠাকুর! তুমি যাহার প্রতি পূর্ণমাত্রায় ভোগ প্রদান কর, না জানি তাহাকে কত দুঃখই সহ্য করিতে হয়? ঠিক এই

সময় শূন্যে গ্রহগণ স্বরূপে তাঁহাকে দর্শনদানে অভয় প্রদান করিলেন, তখন আচার্য্য মহাশয় নবগ্রহের স্তবে মনোনিবেশ করিলেন।

গ্রহগণের স্তব

রবি। জবাকুসুম শঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্ব-পাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং॥

চন্দ্র। দধিশঙ্খ তুষারাভং ক্ষীরোদার্ণব সম্ভবং।
নমামি শশিনং-ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুট ভূষণং॥

মঙ্গল। ধরণীগর্ভ সম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জ সমপ্রভং।
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহং॥

বুধ। প্রিয়ঙ্গু কলিকাশ্যামং রূপেনা প্রতিমংবুধং।
সৌম্যং সর্ব্ব-গুণোপেতং নমামি শশিনঃসুতং॥

বৃহস্পতি। দেবতানা মৃষীনাঞ্চ গুরুং কনক সন্নিভং।
বন্দভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিং॥

শুক্র। হিমকুন্দ মৃণালাভং দৈত্যানাং পরমংগুরুং।
সর্ব্বশাস্ত্র প্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহং॥

শনি। নীলাঞ্জন চয়প্রখ্যং রবিসূনুং মহাগ্রহং।
ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং বন্দেভক্ত্যা শনৈশ্চরং॥

রাহু। অর্দ্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্য বিমর্দ্দকং।
সিংহকায়ঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহং॥

কেতু। পলাল ধূম শঙ্কাশং তারাগ্রহ বিমর্দ্দকং।
রৌদ্রং রুদ্রাত্মকং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহং॥

কাশীর কালকূপ—কালকূপ নামে এখানে যে তীর্থ বর্ত্তমান আছে। উহাতে যথানিয়মে স্নান করিলে পিতৃপুরুষগণের স্বর্গে গতি

হয়। কূপটীর বহির্ভাগের ভিত্তিতে এরূপভাবে একটী ছিদ্র বর্ত্তমান আছে যে, প্রতিদিন ঠিক মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যরশ্মি ঐ ছিদ্রের মধ্য দিয়া কূপের জলে পতিত হয়। ইহাতেই উহার মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইতেছে।

বৃদ্ধ কালেশ্বরের মন্দির—এই মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেবতার পূজার্চ্চনা করিতে হয়।

পিশাচমোচন তীর্থ—অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল চতুর্দ্দশী তিথিতে এই তীর্থে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়। কথিত আছে, এক ব্রাহ্মণ অযথা দান গ্রহণে পিশাচদেহ প্রাপ্ত হন। তাহার পর তিনি মুক্তিলাভের আশায় নানা তীর্থ স্থান পর্য্যটন করিয়া অবশেষে কাশীর এই নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্নান করিয়া মুক্তিলাভ করেন বলিয়া ইহার নাম পিশাচমোচন তীর্থ হইয়াছে।

আদি কেশব ও কমলাদেবী—ভগবান্ বিশ্বেশ্বর যোগিনী-দিগকে দেবোদাসের পাপ অন্বেষণ করিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং তিনিও কাশীলাভের বিষয় চেষ্টা করিতে করিতে হতাশ হইলে—একদা বিষ্ণুকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্র বিষ্ণু লক্ষ্মীসহ কাশীতে আগমন করিলে, তিনি বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা এখানে এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে যে বিগ্রহ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, ঐ পবিত্র মূর্ত্তিই আদিকেশব-কমলা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তৎপরে বিষ্ণু—মহাদেবের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত এখানে প্রতি ঘরে ঘরে বৌদ্ধমত প্রচার করিতে লাগিলেন, ইহার ফলে কাশীবাসীরা নাস্তিকতা প্রাপ্ত হইল, অর্থাৎ তদ্দ্বারা কাশীবাসী স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ব্যভিচার পাপ সংঘটন হইল, এই ব্যভিচার দোষে এখানে পাপে পূর্ণ হইলে বিশ্বেশ্বর সহজেই দেবোদাসকে কাশী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

দেবোদাস এইরূপে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া নারায়ণের স্তবে মনোনিবেশ

করিলেন। নারায়ণ স্তবে তুষ্ট হইয়া বর দানে প্রস্তুত হইলে, দেবোদাস সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবান! পুণ্যধাম কাশী-ক্ষেত্র মধ্যে ব্যভিচার দোষ সংঘটন হইল কি কারণে?" তখন নারায়ণ মধুর বচনে দেবোদাসকে উত্তরদানে সন্তুষ্ট করিলেন, "দেবোদাস! তুমি বিশ্বেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত কাশীতে আপন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলে, ইহা জানিয়া শুনিয়াও তিনি নিজে যাচিঞা করিলে, তুমি ইহা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ কর নাই, এই পাপেই এখানে এইরূপ সংঘটন হইয়াছে। এক্ষণে আমার উপদেশ মত তুমি কাশীতে এক লিঙ্গমূর্ত্তি স্থাপনা করিয়া কাশীর মায়া ত্যাগ কর।" তখন দেবোদাস কাশীতে এক লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক তপস্যায় রত হইলেন। যে লিঙ্গটী তিনি প্রতিষ্ঠা করিলেন, সেই মূর্ত্তি ভূপালেশ্বর নামে অদ্যাপি এখানে বিদ্যমান থাকিয়া অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। প্রত্যহ প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যার সময় কাশীর যাবতীয় দেবালয়ে চিরপ্রথানুসারে নহবৎ বাজিয়া থাকে। পাঠকবর্গের প্রীতির জন্য মণিকর্ণিকা ও অপরাপর মন্দির সমূহের একটী সাধারণ দৃশ্যপটের চিত্র প্রদত্ত হইল।

মণিকর্ণিকার ঘাট—ইহার দৃশ্য অতি মনোহর। জন্মজন্মান্তরে তপস্যা করিয়া যে মানব মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম না হয়, এই মণিকর্ণিকার পবিত্র বারি একবার মাত্র স্পর্শ করিলে, তিনি হর-পার্ব্বতীর কৃপায় অনায়াসে মোক্ষলাভ করিতে পারেন। মণিকর্ণিকা ঘাটের উপর ভগবান বিষ্ণুর চরণ চিহ্ন পাদুকা স্থাপিত আছে, ভক্তগণ কর্ত্তব্য বোধে সেই পাদুকা পূজা করিবেন। এই মণিকর্ণিকা প্রস্তুত হইলে পর একদা গঙ্গাদেবী স্বেচ্ছায় মর্ত্ত্যে আসিয়া ইহার সহিত মিলিতা হওয়ায়—ইহা এক মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে। কথিত আছে, মণিকর্ণিকার সন্নিকট বর্ত্তমান শবদাহ ঘাট স্থানে, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ মহামুনি বিশ্বামিত্রে

তদবধি সেই আজন্ম ব্রহ্মচারী বশিষ্ঠ কাশীতে বাস করিয়া একাধিক ষষ্টিবার কেদারেশ্বরকে দর্শন করিয়াছিলেন, তৎপরে চৈত্র মাস উপস্থিত হইলে পুনরায় এই বশিষ্ঠ কেদারেশ্বরের উদ্দেশে যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন; তদ্দর্শনে তাঁহার অনুচরবর্গ বশিষ্ঠের বার্দ্ধক্যহেতু পথিমধ্যে গুরুর মৃত্যুর আশঙ্কায় দয়ার্দ্রহৃদয়ে বারম্বার তাঁহাকে নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই মহামতি ব্রাহ্মণ—কিছুমাত্র নিরুৎসাহ না হইয়া স্থির করিলেন, যদি অর্দ্ধ পথেই মৃত্যু হয়, সে অতি উত্তম, কেন না তাহাতে তাঁহার গুরুর ন্যায় তিনিও সদ্গতি লাভ করিতে পারিবেন। এদিকে করুণাময় কেদারেশ্বর এই পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠকে তাদৃশ দৃঢ়ব্রত জানিতে পারিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তখন তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শনদানে কহিলেন, "হে দৃঢ়ব্রত! আমি তোমার উপাস্য—সেই কেদারেশ্বর। তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া এখানে আসিয়াছি; এক্ষণে তুমি অভিলাষিত বর গ্রহণ কর।" বশিষ্ঠ 'স্বপ্ন সত্য হয় না' স্থির জানিয়া উহা অগ্রাহ্য করিলে—দয়াময় কেদারেশ্বর পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, "ভক্ত রে! অপবিত্র ব্যক্তিরাই মিথ্যা স্বপ্ন দেখিয়া থাকে, তুমি অতি পবিত্র, তোমার স্বপ্ন মিথ্যা বলিয়া মনে করা উচিত নহে। আমি প্রসন্ন হইয়া তোমায় বর দিতে আসিয়াছি, এক্ষণে তুমি অভিলাষিত বর প্রার্থনা কর, তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই।"

তৎশ্রবণে ব্রাহ্মণ কহিলেন, "হে দেবাদিদেব! আমার প্রতি আপনি যেমন সন্তুষ্ট হইয়াছেন, সেইরূপ আমার অনুচরবর্গের উপরও আপনার অনুগ্রহ হউক, ইহাই আমার প্রার্থনা।"

বশিষ্ঠের বাক্যে ভগবান "তাহাই হইবে" বলিয়া স্বীকৃত হইয়া পুনরায় বলিলেন, "এই পরোপকারানুষ্ঠানে তোমার পুণ্য দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইল; সেই পুণ্যের ফলে তুমি এক্ষণে অন্য বর প্রার্থনা কর।"

এবার বশিষ্ঠ বিনীতভাবে প্রার্থনা করিলেন, "হে নাথ! আপনি হিমালয় হইতে কাশীতে আসিয়া অবস্থান করুন।" তদবধি হিমালয়ের কেদারেশ্বর হরপাপ হ্রদের সন্নিকট, কাশীর কেদারেশ্বর লিঙ্গে অবস্থান করিতেছেন। কথিত আছে, স্থানীয় কেদারেশ্বরের সান্নিধ্যে পরম পবিত্র হরপাপ হ্রদে বশিষ্ঠ ও তাঁহার অনুচরগণ স্নান করিয়া সেই দেহেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। হরপাপ হ্রদের অপরাপর নাম যথা—হংস-তীর্থ, মধুস্রবা, গঙ্গা, গৌরীকুণ্ড এবং মানসতীর্থ। এই নিমিত্ত কলি-কালে হিমালয়স্থ সেই কেদারেশ্বর লিঙ্গের দর্শন অপেক্ষা কাশীর এই কেদারেশ্বর লিঙ্গকে ভক্তিপূর্ব্বক দর্শন করিলে তিনি সপ্তগুণাধিক পুণ্য সঞ্চয় করিতে সমর্থ হন।

তিলভাণ্ডেশ্বর—ভগবান নন্দীকেদারেশ্বরের মন্দিরের অনতি-দূরে এক বিখ্যাত পাষাণময় তিলভাণ্ডেশ্বর নামে শিবলিঙ্গের দর্শন পাওয়া যায়। প্রতিদিন তিলপরিমাণে এই দেবের শ্রীঅঙ্গ বৃদ্ধি হয় বলিয়া, ইনি তিলভাণ্ডেশ্বর নামে এখানে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

পুরাতন বিশ্বেশ্বরের মন্দির — মহাপ্রতাপশালীমোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের স্থাপিত বিখ্যাত মস্‌জিদের কিছু দূরে—পূর্ব্বে ভগবান বিশ্বেশ্বরের আদি মন্দিরটী স্থাপিত ছিল। ইহার পার্শ্বে মসজিদটী নির্ম্মিত হওয়ায় বিশ্বেশ্বরের মন্দিরটী অপবিত্র হইবার ভয়ে স্থানীয় পণ্ডিত-মণ্ডলীর উপদেশ মত স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। বাদশাহা আপন প্রভাবে এই পবিত্র মন্দির পার্শ্বে মস্‌জিদটী নির্ম্মাণ করাইয়া হিন্দুদিগের হৃদয়ে দারুণ আঘাত করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। তিনি যে কেবল কাশীতেই এইরূপ মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন এমন নহে—হিন্দুদিগের যে যে স্থানে বিখ্যাত তীর্থস্থান বর্ত্তমান আছে, সেই সেই স্থানে তিনি মস্‌জিদ প্রস্তুত করাইয়া আপন কীর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছেন। যাত্রীগণ

বেনারস পোলের অপর পার—গঙ্গাতীর হইতে যে উচ্চ মস্‌জিদ-স্তম্ভ দেখিতে পান, উহাই সেই ঔরঙ্গজেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত প্রকাণ্ড মস্‌জিদ।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মস্‌জিদের সন্নিকটে পঞ্চগঙ্গা ঘাট নামে একটী পবিত্র ঘাট শোভা পাইতেছে। পুরাণ মতে—এই ঘাট-স্থানটী পঞ্চ নদীর সঙ্গম স্থল, কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও আমরা এখানে এক উত্তর-গামিনী গঙ্গা ব্যতীত অপর কোন নদ বা নদীর চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম না। ভক্তগণ কাশীতে আসিয়া এই পঞ্চগঙ্গা ঘাটের পবিত্র বারি অদ্যাপি যত্নের সহিত স্বদেশে লইয়া আসিয়া আপনাপন আত্মীয়-স্বজনকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়া থাকেন।

কাশীর এই পঞ্চগঙ্গা নামক তীর্থ স্থানে প্রাতঃস্নানের সময় গঙ্গা-দেবীর উদ্দেশে নিম্নলিখিত স্তোত্রটী পাঠ করা প্রশস্ত;—মাতঃ গঙ্গে তুমি বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে উদ্ভবা, তুমি বিষ্ণুভক্তা এবং বিষ্ণুর পূজনীয়া, সেই হেতু তুমি জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সকল পাপ হইতে ভক্তদিগকে পরিত্রাণ কর। বায়ু বলিয়াছেন, স্বর্গে, মর্ত্তে, ও আকাশে সার্দ্ধ ত্রিকোটী তীর্থ আছে, হে জাহ্নবি! সে সমুদয় তীর্থ তোমাতেই বর্ত্তমান। তোমার নাম নন্দিনী ও দেবলোকে তুমি নলিনী নামে অভিহিত। এইরূপ আবার তুমি—বৃন্দা, পৃথ্বী, সুভগা, বিশ্বকায়া, শিবা, সীতা, বিদ্যাধরী, সুপ্রসন্না, লোকপ্রসাদিনী, ক্ষেমা, জাহ্নবী, শান্তা, এবং শান্তি-দায়িনী নামে পরিচিত। কথিত আছে, স্নানের সময় এই সকল পবিত্র নাম কীর্ত্তন করিলে ত্রিপথগামিনী গঙ্গা যেখানেই থাকুন না কেন, তিনি গুপ্তভাবে তথায় উপস্থিত হইয়া আপন ভক্তকে উদ্ধার করেন।

বিন্দুমাধবদেবের মন্দির—পঞ্চগঙ্গা ঘাটের নিকট এই পবিত্র মন্দিরটী অবস্থিত। সম্রাট ঔরঙ্গজেব ভগবান বিন্দুমাধবজীউর প্রাচীন মন্দিরটী ভঙ্গ করিয়া সেই স্থানে এক প্রকাণ্ড মস্‌জিদ নির্ম্মাণ

করিয়া দিয়াছেন। এই নিমিত্ত ভগবান বিন্দুমাধবজীউ এক্ষণে পার্শ্বস্থ এক গৃহমধ্যে বিরাজ করিতেছেন। কাশীর পরপার হইতে যে উচ্চ মস্‌জিদ স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়, উহাই এই বিখ্যাত মস্‌জিদের স্তম্ভ।

নাগকূপ—ইহা সহরের উত্তর পশ্চিমাংশে অবস্থিত। এই স্থানে তিনটী নাগ ও একটী শিবলিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহার অনতিদূরে বাগীশ্বরীদেবীর মন্দির আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে।

বাঙ্গালীটোলা—কাশী সহরের এই পল্লীতে কেবল বাঙ্গালীদিগের বাসস্থান বর্ত্তমান আছে, সুতরাং এই পল্লীটী বাঙ্গালীটোলা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বাঙ্গালীটোলা—অত্যন্ত অপ্রশস্ত, ফলতঃ সামান্য বৃষ্টিপাত হইলেই এই স্থানের পথটী কর্দ্দমময় হইয়া থাকে। পল্লীর এই সকল বাঙ্গালীদিগের মধ্যে সাধু, অসাধু, মদ্যপ, লম্পট প্রভৃতি সকল প্রকার বাঙ্গালীদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। কেশল নামক এক সম্প্রদায় বাঙ্গালীও এই পল্লীতে অবস্থান করেন, উহারা ব্যভিচার দোষাসক্ত ব্রাহ্মণ দ্বারা উৎপন্ন; এই কারণে ভাল ব্রাহ্মণদিগের সহিত উহাদের আদান প্রদান হয় না।

পুণ্যস্থান কাশীর সীমা মধ্যে অনেক বেদ, বেদান্ত, বিজ্ঞান দর্শন, ও পুরাণাদিতে অভিজ্ঞ এইরূপ পণ্ডিত বাস করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন এখানে অন্যূন তিন-চারিশত দণ্ডী, মোহান্ত, সন্ন্যাসী, অবধূত, পরমহংস এবং পরিব্রাজক বাস করিয়া থাকেন। কাশীতে বিস্তর অন্নছত্র প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাতে ধনীগণ মা অন্নপূর্ণাদেবীর মান রক্ষার্থে অকাতরে বহু অর্থব্যয়ে প্রত্যহ অন্নদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া এ তীর্থে কখন কেহ অভুক্ত থাকেন না।

কাশীর মাহাত্ম্য অবগত হইয়া এখানে কত সাধু সন্ন্যাসীদিগের আশ্রম স্থান হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এখানে বহুবিধ মঠ ও

সংস্কৃত চতুষ্পাঠী বর্ত্তমান আছে। সাধু মহাত্মাগণের মধ্যে ত্রৈলিঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি ইঁহারাই বিখ্যাত।

চিদম্বগ্রামের পুণ্যবতী বশিষ্ঠাদেবীর গর্ভজাত বালক শঙ্কর ব্রহ্মাদ্বৈত মন্ত্রে দীক্ষিত এবং সংসারত্যাগী হইয়া সর্ব্বপ্রথমেই তিনি এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে—এখানে এক বীভৎস ঘৃণিত ছদ্মবেশধারী চণ্ডাল মূর্ত্তির (স্বয়ং মহাদেব) নিকট বেদনির্ণীত তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষালাভপূর্ব্বক ভাবমুগ্ধহৃদয়ে আপনার পূর্ব্ব উপার্জ্জিত বিদ্যাভিমান, জ্ঞানগরিমা, ধর্ম্মাহঙ্কার সমস্তই জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন এবং ভগবান শঙ্করের শ্রীঅঙ্গের আলিঙ্গনে যে সার জ্ঞানরত্ন লাভ করেন, তাহারই ফলে নানা দেশ, বিদেশ পর্য্যটন করিয়া তিনি শঙ্করাচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ হন। এইরূপ আবার দাক্ষিণাত্যের চোলপাত জেলার অন্তর্গত শ্রীপদ্মম্বদর গ্রামের বিখ্যাত কেশব ত্রিপাঠীর পুত্র পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহাত্মা রামানুজাচার্য্য উত্তর-পশ্চিমের তীর্থসমূহ পর্য্যটন করিবার সময় একদা তিনি কাশীতে আসিয়া মনের সাধে ভগবান বিশ্বেশ্বরজীউর পূজার্চ্চনা করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিয়াছিলেন।

ত্রৈলিঙ্গ স্বামী—দাক্ষিণাত্যের বিজানা গ্রামের অন্তর্গত হেলিয়া নামক নগরে নৃসিংহধর শর্ম্মা নামে এক ঐশ্বর্য্যশালী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার দুই পত্নী—প্রথম পত্নীর গর্ভে যে পুত্র জন্মে, তিনিই ভারত বিখ্যাত ত্রৈলিঙ্গধর, আর দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে যে পুত্র হয়, তিনি শ্রীধর শর্ম্মা নামে জনসমাজে পরিচিত হন। ত্রৈলিঙ্গধরের বাল্যকাল হইতে বিদ্যাচর্চ্চায় অনুরাগ ছিল, সুতরাং অল্প বয়সেই তিনি নানা শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছিলেন। বড় মানুষের ঘরে আদরের ছেলে হইলেও তিনি সংসারের ভোগ বিলাসকে ঘৃণা করিতে শিখিয়া-

ছিলেন। তাঁহার পিতা নৃসিংহধর—বহু চেষ্টা করিয়াও সেই স্নেহের প্রথম পুত্র ত্রৈলিঙ্গধরকে দারপরিগ্রহে সম্মত করিতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য, ত্রৈলিঙ্গধর বাল্যকাল হইতে কেবল ধর্ম্মকর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন; সত্যসাধনায়, ব্রহ্মচর্য্যাপালনে এবং পরোপকার ব্রতেই তাঁহার আত্মগৌরব বোধ হইত।

কালের কুটিলগতিতে চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতা নৃসিংহধর ইহসংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তখন ত্রৈলিঙ্গধর তদীয় বৈমাত্র ভ্রাতা শ্রীধরকে—সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি অর্পণ করিয়া নিজে কঠোর বৈরাগ্যব্রত অবলম্বন করিলেন, কিন্তু পাছে তাঁহার জননীর প্রাণে আঘাত লাগে, এই আশঙ্কায় সংসার ত্যাগ করিতে পারিলেন না। এদিকে কনিষ্ঠ শ্রীধর সাধ্যমত অগ্রজকে বিষয়-কর্ম্ম পরিদর্শন করিবার জন্য অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু দৃঢ়ব্রত ত্রৈলিঙ্গধর আপন সঙ্কল্প হইতে কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। ত্রৈলিঙ্গধর চল্লিশ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়াছিলেন, এবার ৫২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি মাতৃহীন হইলেন। এই বয়সে মাতৃশোক তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল, অর্থাৎ সেই গর্ভধারিণীর শোকে তিনি বালকের ন্যায় কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে আত্মীয়স্বজনের অনুরোধে যথা-নিয়মে মাতার অগ্নিসংস্কার শেষ করিলে পর তিনি স্বাধীন হইলেন এবং মনের দুঃখে গৃহে আর না ফিরিয়া মাতৃ-চিতার সেই ভস্মাবশেষ সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া সকল দুঃখের অবসান করিলেন, অধিকন্তু এই শ্মশানেই বাস করিতে লাগিলেন।

ভ্রাতৃবৎসল শ্রীধর—বিবিধ প্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও যখন তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিতে পারিলেন না, তখন অগত্যা তিনি বাধ্য হইয়া সেই শ্মশানের উপরে অগ্রজের বাসযোগ্য একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া

আপন কর্ত্তব্য পালন করিলেন। এদিকে শ্রীধর কর্ত্তৃক যে গৃহ নির্ম্মাণ হইল, ত্রৈলিঙ্গধর সে গৃহে একবার পদার্পণও করিলেন না। এবার তিনি ফলমূলাহারী, কৌপীনধারী সন্ন্যাসী সাজিয়া এক বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়া একাধিক্রমে বিশ বর্ষকাল সেই নির্জ্জন শ্মশানেতেই অতিবাহিত করেন।

ইত্যবসরে ভগীরথ স্বামী নামে এক যোগী দাক্ষিণাত্যে পদার্পণ করিলেন। এই মহাত্মাও লোকালয়ের পরিবর্ত্তে সেই বিজন শ্মশান ভূমির এক স্থানে নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদা ত্রৈলিঙ্গধর স্নান করিতে যাইবার কালে এই মহাত্মার দর্শন পাইলেন এবং এই সূত্রে উভয়ে উভয়কে চিনিতে পারিলেন। এইরূপে কিছু-দিন অতীত হইবার পর, একদা ত্রৈলিঙ্গধর ভগীরথ স্বামীকে পুষ্কর তীর্থে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া তিনিও তাঁহার সঙ্গী হইয়া তাঁহাকেই গুরুপদে মান্য করিলেন।

পুষ্করে অবস্থানকালে তিনি মহাত্মা ভগীরথ স্বামীর নিকট যোগের গূঢ় তত্ত্ব শিক্ষালাভ করিলে—গুরুর কৃপায় তিনি গণপতি স্বামী নামে খ্যাত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে নামের পরিবর্ত্তে সকলেই তাঁহাকে "ত্রৈলিঙ্গ স্বামী" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এইরূপে গুরুশিষ্যে কিছুকাল অবস্থিতির পর বার্দ্ধক্যবশতঃ ভগীরথ স্বামী এই পুষ্কর তীর্থেই দেহ রাখিলেন। গুরুর লোকান্তর গমনে ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর আর তথায় অবস্থান করিতে ইচ্ছা হইল না, সুতরাং তিনি তীর্থ সমূহ পর্য্যটন করিতে মনস্থ করিলেন।

পুষ্কর হইতে সর্ব্বপ্রথমেই তিনি পুণ্যধাম রামেশ্বরের দক্ষিণভাগে সুমাদাপুরী নামে যে গ্রাম আছে, তথায় জনৈক নিঃসন্তান ব্রাহ্মণের বাটীতে অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের অতি হীন অবস্থা ছিল, তথাপি তিনি সাধ্যমত সস্ত্রীক স্বামীজীর পরিচর্য্যা করিতে লাগি-

লেন। এখানে স্বামীজী এই ব্রাহ্মণ-দম্পতীর ভক্তিতে প্রীত হইয়া তাহাদের দুঃখমোচন করিলেন অর্থাৎ চিরদরিদ্রের গৃহে কমলার শুভ দৃষ্টি পড়িল। সুতরাং সেই কমলার কৃপায় দরিদ্র ব্রাহ্মণের পুণ্যভবনে শিশুর কলহাস্যে মুখরিত হইয়া উঠিল।

ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর এই অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া স্থানীয় পল্লীবাসীগণ একে একে তাঁহার শরণাগত হইতে লাগিলেন। কেহ ধনের আশায়, কেহ পুত্রের আকাঙ্ক্ষায়, কেহ বা রোগমুক্তির আশে স্বামীজীর চরণ-কামনা করিতে লাগিলেন। তখন তিনি এই বিপুল জনতায় বিরক্ত হইয়া, এই স্থান হইতে দেবতাত্মা হিমালয়াভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বলাবাহুল্য, এখানেও তিনি বেশী দিন অবস্থান করিতে পারিলেন না, কারণ স্বার্থসিদ্ধির কামনায় লোকে তাঁহাকে বিরক্ত করিতে লাগিলেন।

এবার স্বামীজী হিমালয় হইতে বরাবর নর্ম্মদাতীরে মার্কণ্ডেয় আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। পুণ্যস্থান নর্ম্মদাতীরে অনেক যোগীঋষির সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। মার্কণ্ড আশ্রমে খাকীবাবা নামে একটী সন্ন্যাসী বাস করিতেন। একদিন গভীর রাত্রে তিনি শৌচার্থে এই নর্ম্মদাতীরে গমন করিবার সময় স্বচক্ষে যাহা দর্শন করিলেন, উহাতেই তাঁহাকে স্তম্ভিত হইতে হইল। খাকীবাবা তীর হইতে দেখিলেন, নর্ম্মদার সমস্ত জল সেই গভীর অন্ধকারে দুগ্ধে পরিণত হইয়াছে, আর মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ স্বামী সেই দুগ্ধ প্রফুল্ল মনে অঞ্জলি ভরিয়া পান করিতেছেন, কিন্তু খাকীবাবা নিকটস্থ হইবামাত্র নর্ম্মদা আবার স্বাভাবিক রূপ ধারণ করিল। ইহাতেই তিনি স্বামীজীর ক্ষমতার বিষয় প্রত্যক্ষ করিলেন। বলা বাহুল্য, এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে আশ্চর্যান্বিত হইয়া খাকীবাবা আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার ক্ষমতার বিষয়

প্রকাশ করিয়া দিলেন, তখন সকলেই একে একে তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, সুতরাং তিনি বিরক্ত হইয়া পরদিন গুপ্তভাবে তথা হইতে কাশী যাত্রা করিয়া সুস্থ হইলেন।

ত্রৈলিঙ্গ স্বামী কাশীতে উপস্থিত হইয়া মহাত্মা তুলসীদাসের আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই আশ্রমে একজন কুষ্ঠরোগী বাস করিত, স্বামীজী আপন মহিমা প্রকাশ ছলে তাঁহাকে সমাজের পাংশু স্তূপ হইতে স্বীয় কোলে তুলিয়া লইলেন। মহাত্মার নির্ব্বাদে আলি-ঙ্গনে—পাপী রোগমুক্ত হইয়া সুস্থ শরীরে স্বামীজীরই সেবা করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে মহাপুরুষের আলিঙ্গনে সেই মহাব্যাধিগ্রস্ত রোগীকে সকলে মুক্ত হইতে দেখিয়া তাঁহার "ঋষিত্ব ও দেবত্ব" জানিতে পারিলেন। ঋষিত্ব—কুষ্ঠরোগীর সহবাসে বলীয়ান বিসর্জ্জনের প্রতিষ্ঠা! আর দেবত্ব—পাপ ঘৃণ্য কিন্তু পাপী ঘৃণ্য নহে!!

মুহূর্ত্ত মধ্যে কাশীর চতুর্দ্দিকে ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর ক্ষমতার বিষয় রাষ্ট্র হইলে দলে দলে কাতারে কাতারে কাশীবাসীগণ তাঁহার দর্শন আশে উপস্থিত হইতে লাগিলেন, তখন তাঁহার সাধনায় বিঘ্ন হইবার আশঙ্কায়, তিনি তুলসীদাসের আশ্রম হইতে বেদব্যাসের আশ্রমে নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে লাগিলেন। প্রস্ফুটিত গোলাপফুলের সৎগন্ধ যেরূপ চারিদিক আমোদিত করে—মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর মহত্ত্বের বিষয় সেইরূপ চারিদিকে বিঘোষিত হইতে লাগিল। এ আশ্রমেও এক অভিনব ব্যাপার সংঘটন উপস্থিত হইল। অর্থাৎ বেদব্যাসের আশ্রমে অবস্থানকালে—একদা এক পরমা সুন্দরী মারহাট্টা যুবতী, তাঁহার স্বামীর দুরারোগ্য ব্যাধির প্রতিকার আশায় এই স্বামীজীর শরণাপন্ন হইলেন, কিন্তু তাঁহাকে এখানে উলঙ্গ ভৈরবমূর্ত্তি দর্শনে যুবতী লজ্জিতা হইয়া বিশ্বেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে হত্যা দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বলা বাহুল্য, যুবতী

এখানেও ভগবান বিশ্বেশ্বরের রত্ন সিংহাসনোপরি সেই উলঙ্গ স্বামীজীর বিরাট মূর্ত্তি দর্শনে আপন ভ্রম বুঝিতে পারিলেন; তখন তিনি স্বামী-জীকে বিশ্বেশ্বরের অংশ জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে সাধ্যমত প্রসন্ন করিলেন এবং তাঁহারই কৃপায় সেই সতী রমণী স্বীয় স্বামীর প্রাণ রক্ষা করিলেন।

অদ্ভূতকর্ম্মা স্বামীজীর অসাধারণ ক্ষমতা অবলোকনে তখন কাশী-বাসী সকলেই তাঁহাকে বিশ্বেশ্বরের অবতার বলিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে লাগিলেন। মহাত্মা স্বামীজীর সরলতা ঠিক যেন শিশুর মত পরিলক্ষিত হইত—তিনি সতত উলঙ্গ অবস্থায় অবস্থান করিতেন। এই নিমিত্ত অনেকে "তাঁহাকে ন্যাংটা বাবা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এই ন্যাংটা বাবা কাহারও সহিত বেশী কথা কহিতেন না, সর্ব্বদাই ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তাঁহাকে দর্শন পাওয়া যাইত। তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার গুণে এই স্থাণুর ন্যায় নির্ম্মল মূর্ত্তির পাদমূলে কত রত্নভূষিত রাজ্যেশ্বরের শির সম্ভ্রমে নত হইত, তাহার ইয়ত্তা নাই। ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর কীর্ত্তিকলাপ সমস্তই অসম্ভব ছিল—পৌষ মাসের দারুণ শীতে তিনি গঙ্গার শীতল জলে অঙ্গ ডুবাইয়া থাকিতেন, আবার গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে তাঁহাকে সতত ধুনি জ্বালাইয়া তন্মধ্যে অবস্থান করিতে দেখা যাইত। শীততাপ সহিষ্ণু স্বামীজী কখনও কাহার নিকট কোন আহার্য্য চাহিতেন না—যাত্রীগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভক্তিভাবে তাঁহার শ্রীমুখে বা হাতে যে খাদ্য তুলিয়া দিতেন, তিনি অম্লানবদনে তাহাই ভক্ষণ করি-তেন। আহারকালে ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর মনে জাতিবিচার সম্বন্ধীয়শাস্ত্রের অনুশাসন স্থান পাইত না এবং যোগ বল অবলম্বনেই তিনি দীর্ঘায়ুলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কথিত আছে, একদা এক দুর্বৃত্ত—ত্রৈলিঙ্গ স্বামীকে জব্দ করিবার

অভিপ্রায়ে খানিকটা চুণ খাইতে দেয়, তিনি অম্লানবদনে উহা ভক্ষণ করিয়া পরে সেই দুর্ব্বৃত্তের চাতুরী বুঝিতে পারিলেন, তখন তাঁহারই সম্মুখে তিনি তৎক্ষণাৎ বিষ্ঠা ত্যাগ করিলেন, ঐ বিষ্ঠার সহিত সেই সমস্ত চুণ বাহির হইয়াছিল। স্বামীজীর ক্ষমতা দর্শনে উক্ত দুর্ব্বৃত্ত ভয় বিহ্বলচিত্তে তাঁহারই শরণাগত হইলে—রিপুজয়ী ত্রৈলিঙ্গ স্বামী দক্ষিণ হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অভয়দান করেন। আহা! মহাপুরুষদিগের কার্য্যকলাপ যাহা কিছু নয়নগোচর হয়, উহা সমস্তই অসম্ভব!

মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ স্বামী অসাধারণ যোগী ছিলেন। তাঁহার যোগবল সম্বন্ধীয় যে সকল ব্যাপার জনসমাজে শ্রুত হয়, উহা একে একে লিখিতে হইলে একখানি সুবৃহৎ পুস্তকাকারে পরিণত হয়। ইনি যোগ-বলে সর্ব্বসমক্ষে অদৃশ্য হইতে পারিতেন।

একদা এক উচ্চ পদস্থ ইংরাজ রাজপুরুষ নিকটবর্ত্তী কোন এক স্থান হইতে নৌকাযোগে একটী বাঙ্গালা কর্ম্মচারী সমভিব্যাহারে কাশীতে যাইতেছিলেন, এই নৌকাখানি মণিকর্ণিকা নামক ঘাট স্থান দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার সময়—ইংরাজ পুরুষটী সহসা এক মনুষ্যদেহ গঙ্গার সেই অগাধ জলে ভাসিতেছে দেখিতে পাইলেন। বলা বাহুল্য, ত্রৈলিঙ্গ স্বামী আপন প্রতিভাবলে আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা সকলকারই নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন, সুতরাং বাঙ্গালী বাবুটী তাঁহাকে দর্শন মাত্র চিনিতে পারিলেন এবং সাহেবকে স্বামীজীর যোগ-বিভূতি ও অলৌকিক ক্ষমতার বিষয় সাধ্যমত বলিতে লাগিলেন। তখন সেই ইংরাজ পুরুষটী একবার অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া স্বামীজীকে স্বীয় নৌকায় উঠিতে অনুরোধ করিলেন। যোগীবর নিরাপত্তিতে উক্ত নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক সাহেব ও বাঙ্গালীর মধ্যস্থানে আপন আসন

গ্রহণ করিলেন। বলা বাহুল্য, এই সময় বাবুটী ভক্তিসহকারে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন।

এখানে সাহেবের পার্শ্বে একখানি তীক্ষ্ণধার তরবারি দেখিয়া স্বামীজী তাহার ধার পরীক্ষাপূর্ব্বক—একবার সাহেবের মুখের দিকে তাকাইলেন এবং ভীতভাব প্রকাশ করিয়াই সহসা সেখানি গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। এদিকে স্বামীজীর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া সাহেবের ক্রোধের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল, তখন বাঙ্গালী বাবুটী অনুনয় বিনয় করিয়া সাহেবকে বলিলেন, "হুজুর! আপনি মহামতি যোগীর প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ করুন। আমি তীরে উঠিয়া নিশ্চয় ডুবুরীর সাহায্যে আপনার তরবারিখানি উঠাইয়া দিব।" তৎশ্রবণে সাহেব আরও কুপিত হইয়া স্বামীজীকে শাস্তি দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

অন্তর্য্যামিন্ স্বামীজী সাহেবের মনোভাব অবগত হইয়া বাবুটীকে কেবল একবারমাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—ঐ প্রাণঘাতী তরবারিখানি কি সাহেবের বিশেষ প্রয়োজনীয়? তিনি বিনীতভাবে সম্মতিসূচক উত্তর দিলেন। স্বামীজী আপন মহত্ব প্রকাশ করিবার অবসর পাইয়া সেই গভীর গঙ্গাবক্ষে আপন হস্ত প্রসারণ করিয়া সাহেবের ন্যায় ঠিক সেই-রূপ এককালে তিনখানি অস্ত্র উত্তোলনপূর্ব্বক ইংরাজ পুরুষটীকে নিজের খানি বাছিয়া লইতে আদেশ করিলেন। এই অলৌকিক ক্ষমতা দর্শনে সাহেবের চমক ভাঙ্গিল এবং নিজের কুব্যবহারের জন্য তিনি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া স্বামীজীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি-লেন। এক্ষণে স্বামীজী প্রসন্নমুখে সাহেবকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বয়ং তাঁহার তরবারিখানি প্রত্যর্পণপূর্ব্বক অপর দুইখানি জলে নিক্ষেপ করিলেন, তৎপরে ধীরে ধীরে গঙ্গাবক্ষে অবতরণ করতঃ সকলসমক্ষে অদৃশ্য হইলেন।

স্বামীজীর এইরূপ আর একটী ক্ষমতার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইল, ১৮৫৭ খৃঃ নানা সাহেব কর্ত্তৃক দেশীয় সেপাহীরা বিদ্রোহী হইলে, সেই সঙ্কটময় সময় কাশীর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব স্থানীয় উলঙ্গ সন্ন্যাসীদিগকে বিদ্রোহী স্থির করিলেন এবং সকলকে কারারুদ্ধ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন, অধিকন্তু উলঙ্গমূর্ত্তি—স্ত্রীজাতির লজ্জাশীলতার হানিকারক বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে বস্ত্র পরিধান করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। এই সময় কাশীর বেশীর ভাগ সন্ন্যাসী বস্ত্র পরিধান করিয়া আপনাপন ইজ্জত রক্ষা করিলেন, কিন্তু ত্রৈলিঙ্গ স্বামী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া সমভাবেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। বলাবাহুল্য, মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর নিকট চন্দন ও বিষ্ঠার পার্থক্য ছিল না। এদিকে মহাপ্রতাপশালী ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের আদেশ অমান্য করিবার জন্য তিনি বন্দী হইয়া বিচারালয়ে আনীত হইলেন। তখন সদাশয় ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় স্বয়ং তাঁহাকে বস্ত্র পরিধান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, অধিকন্তু যদি তিনি তাঁহার আদেশ অমান্য করেন, তাহা হইলে তিনি জোরপূর্ব্বক স্বামীজীকে তাঁহার নিজের খানা খাওয়াইয়া দিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। ইহাতেও ত্রৈলিঙ্গ স্বামী কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অম্লানবদনে উত্তর করিলেন, "সাহেব! যদি আপনি আমার খানা খাইতে পারেন, তাহা হইলে আমিও আপনার খানা বিনা আপত্তিতে খাইব।" এবার সাহেব আপন ক্ষমতা বলে তাঁহাকে নির্য্যাতন করিতে ইচ্ছা করিলে—তিনি আপন প্রতিভাবলে তাঁহাকে চমৎকৃত করিলেন। তদবধি আর কোন রাজপুরুষ স্বামীজীর প্রতি কোনরূপ আদেশ করিতে সাহস করেন নাই।

ত্রৈলিঙ্গ স্বামী কাশীতে অবস্থানকালে—এক অতুল-ঐশ্বর্য্যের অধী-

শ্বর ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্রের পিঞ্জরাস্থি ভাঙ্গিয়া যায়, বহু চিকিৎসাতেও তাহার কোন ফলোদয় হয় নাই। অবশেষে ব্রাহ্মণ স্বামীজীর অসাধারণ ক্ষমতার বিষয় অবগত হইলে—তিনি তাঁহার সেই একমাত্র উত্তরাধিকারীকে সঙ্গে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীজীর শরণাপন্ন হইলেন। এই সময় স্বামীজী, তাঁহার অচলা ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া সেই মৃতবৎ পুত্রকে সামান্যমাত্র মৃত্তিকা খাইতে দেন। ইহাতে সেইদিনেই উক্ত বালক প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল।

স্বামীজীর এইরূপ আর একটী মাহাত্ম্যের বিষয় প্রকাশ করিয়া তাঁহার জীবনী সম্পূর্ণ করিব। একদা এক রাজা সস্ত্রীক গঙ্গাস্নান উপলক্ষে কাশীধামে উপস্থিত হন। বলাবাহুল্য, অসূর্য্যম্পশ্যা রাজকুলবধূর সম্ভ্রম রক্ষার নিমিত্ত রাজার প্রাসাদ হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত পথের উভয় পার্শ্বেই পর্দ্দা ফেলিয়া সুসংস্কৃত করা হয়। রাজা ও মাহিষী যথানিয়মে এখানে স্নানকার্য্য সম্পন্ন করিয়া সিক্তবেশে পথে আসিতে আসিতে এক স্থানে উলঙ্গবেশে ত্রৈলিঙ্গ স্বামীকে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন। মাহিষী সেই উলঙ্গমূর্ত্তি দেখিবামাত্র লজ্জায় অধোমুখী হইলেন, তদ্দর্শনে রাজা রাজঅন্তঃপুরের মর্য্যাদা নষ্ট হইল স্থির করিয়া অধীর হইলেন এবং স্বামীজীর ব্যবহারে প্রতিবাদ করিয়া যথেষ্ট ভৎর্সনা করিলেন। ত্রৈলিঙ্গ স্বামী আপন মহত্ত্বগুণে সমস্ত অপমানই সহ্য করিলেন। ইহাতে রাজা আরও ক্রুদ্ধ হইলে জনসাধারণ—রাজসমক্ষে তাঁহার যোগবিভূতির বিষয় নিবেদন করিলেন, কিন্তু রাজা কাহারও অনুরোধ গ্রাহ্য না করিয়া তাঁহার অধীনস্থ দুইজন অনুচরকে এই স্বামীজীকে বেত্রাঘাত করিতে আদেশদানে আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করিলেন। মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ স্বামী সর্ব্বসমক্ষে সেই বেত্রাঘাত হাস্যমুখে সহ্য করিলেন সত্য, কিন্তু দর্শকমণ্ডলীমাত্রেই ইহার নিমিত্ত মর্ম্মাহত হইয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঠিক সেইদিন রাত্রিকালে রাজা এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়া ভীতচিত্তে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। স্বপ্নটা এই-রূপ—যেন স্বয়ং কাশীশ্বর উন্মুক্ত ত্রিশূল হস্তে ভ্রুকুটিসহকারে এই রাজাকে বলিতেছেন," রে দুর্বৃত্ত ! তুই আমারই রাজ্যে আমার সেবক হইয়া আমাকে যখন বেত্রাঘাত করিতে সাহস করিয়াছিস্, তখন এই পুণ্যক্ষেত্রে তোর আর স্থান নাই, এই দণ্ডেই তুই এ রাজ্য হইতে দূর হ, নচেৎ আমি ত্রিশূলাঘাতে তোকে খণ্ড খণ্ড করিব।" পর দিবস যথা-সময়ে পারিষদবর্গ এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত অবগত হইলে—সকলেই স্বামীজীকে বিশ্বেশ্বরের অংশ বলিয়া স্থির করিলেন, তখন রাজা সপরিবারে এই সাধুর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন,কিন্তু স্বামীজী আপন মহত্ত্বগুণে রাজাকে অভয়দানে কাশীসীমা পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। এই ঘটনার পর হইতে সকলেই তাঁহাকে বিশ্বেশ্বরের অপমূর্ত্তি বলিয়া স্বীকার করিলেন। এইরূপে স্বামীজী কিছুকাল কাশীতে অবস্থানপূর্ব্বক শেষ এই কাশীতেই ২৮০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইহলোক ত্যাগ করেন।

মহর্ষি গৌতম—কাশীর এই পুণ্যক্ষেত্রে বসিয়াই তাঁহার ন্যায় শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। যে কাশী পাণিনি-ব্যাকরণের জন্য প্রসিদ্ধ, যে কাশীতে কপিলমুনি সাঙ্খ্য-দর্শন-শাস্ত্র সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, সেই কাশীতেই পুরাকালে রাজা হরিশ্চন্দ্র সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন।

দশাশ্বমেধ ঘাট—এই ঘাট অতি পবিত্র বলিয়া বিখ্যাত; কারণ স্বয়ং প্রজাপতি দেবোদাসের সাহায্যে এই ঘাট স্থানে একে একে দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম দশাশ্বমেধ ঘাট হইয়াছে। এই ঘাটটীর সৌন্দর্য্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়, ঘাটের উপরিভাগে পদ্মযোনি প্রতিষ্ঠিত দশাশ্বমেধেশ্বর ও ব্রহ্মেশ্বর নামক দুইটী শিবলিঙ্গ বিরাজমান থাকিয়া ভক্তগণকে দর্শনদানে উদ্ধার করিতেছেন।

কথিত আছে, দশহরার দিন এই ঘাটে স্নান করিলে জন্মজন্মান্তরের পাপরাশি প্রক্ষালিত হইয়া যায়। দশাশ্বমেধ ঘাটের উপরিভাগে বিস্তর পাণ্ডা অবস্থান করিয়া যাত্রীদিগের স্নানের সহায়তা করিয়া থাকেন। কাশীর তীর্থগুরু পাণ্ডার উপদেশ মত ভক্তগণ এই পবিত্র তীরের উপর বসিয়া মুক্তি কামনা করিয়া ছত্রদান, গোদান প্রভৃতি দানকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল।

মানমন্দির—দশাশ্বমেধ ঘাটের দক্ষিণদিকে মানমন্দির ঘাটের উপরিভাগে মানমন্দির নামক একটী যন্ত্রবাটী স্থাপিত আছে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষের লোক ঘড়ি কি—তাহা জানিত না। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে রাজপুত শ্রেষ্ঠ মহারাজ মানসিংহ কাশীতে এই মানমন্দির নামক যন্ত্রটী প্রতিষ্ঠা করিয়া আপন জ্যোতিষীবিদ্যার পরিচয় প্রদান করেন। পুরাকালে হিন্দুরা জ্যোতির্ব্বিদ্যা বিষয়ে যে কতদূর উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন, এই মানমন্দিরই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সেই প্রাচীনকালে ইহাতে যে সমস্ত যন্ত্র স্থাপিত ছিল, তদ্দ্বারা জ্যোতির্ব্বিদগণ আকাশস্থ গ্রহ-নক্ষত্রাদির গণনা অতি সহজেই করিতে পারিতেন। এই যন্ত্রগুলির মধ্যে যে গুলি বহনযোগ্য, তৎসমুদায়ই এক্ষণে বিলাতে প্রেরিত হইয়াছে। যদিও এক্ষণে ইহা অকর্ম্মণ্য অবস্থায় আছে, তথাপি এই যন্ত্রগুলির স্থাপত্য-কৌশল দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এই নিমিত্ত কাশী দর্শনেচ্ছুক যাত্রীগণকে এই মানমন্দিরটীর স্থাপত্য-কৌশল একবার দেখিতে অনুরোধ করি।

কাশীক্ষেত্রে দশাশ্বমেধ, মণিকর্ণিকার বিখ্যাত ঘাট ব্যতীত অসি-সঙ্গম ঘাট, তুলসী ঘাট, গণেশ ঘাট, শিবালয় ঘাট, দণ্ডী-ঘাট, মানমন্দির ঘাট, মীর ঘাট, পঞ্চগঙ্গা ঘাট, দুর্গা ঘাট, সুরতি ঘাট, ত্রিলোচন ঘাট,

কেদার ঘাট, পিশাচমোচন ঘাট প্রভৃতি বহুবিধ প্রসিদ্ধ ঘাট আছে, এখানে যে সমস্ত তীর্থ বিরাজিত, উহা একে একে সমস্ত বর্ণনা করিলে একখানি সুবৃহৎ পুস্তক প্রস্তুত হয়।

তুলসীঘাট—যমুনাতীরবর্ত্তী রাজাপুর গ্রামের ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব মহাত্মা তুলসীদাস—যিনি যুবতী পত্নীর একটীমাত্র তীব্র বাক্যে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সচেতন হইয়া অলঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্য দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং সংসার ত্যাগী হইয়াছিলেন। যিনি এই কাশীক্ষেত্রে উপস্থিত হইবামাত্র প্রথম নিশ্বাসে তাঁহার মুখ দিয়া রাম নাম উচ্চারণ হইয়াছিল, যাঁহার হৃদয়ের কৃত্রিমতা—জীবনের জটিল মোহ-আবরণ, স্থান মাহাত্ম্যগুণে সমস্ত ছিন্ন হইয়া রজনীর অন্ধকারের ন্যায় মিশাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, অর্থাৎ এক খণ্ড ক্ষুদ্র উপলে সময় সময় যেমন নির্ঝর নীরের গতির পরিবর্ত্তন হয়, মহাত্মা তুলসীদাসেরও ঠিক সেইরূপ জীবন-স্রোত ভিন্ন পথে প্রবাহিত হইয়াছিল।

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের নিকট একজন ব্রাহ্মণ এক চত্বরে বসিয়া প্রত্যহ রামায়ণ পাঠ করিতেন। তুলসীদাস ঐ স্থানে গিয়া এক মনে ভক্তিসহকারে তাঁহার রামায়ণ পাঠ শ্রবণ করিতেন। এখানে অবস্থানকালে একদা গভীর রাত্রে এক প্রেতমূর্ত্তির আবির্ভাবে তিনি উপদেশ পাইলেন—"যে ব্রাহ্মণ প্রত্যহ এখানে রামায়ণ পাঠ করেন, তিনি ছদ্মবেশধারী সাক্ষাৎ পবনকুমার"। যদি তুমি কোনরূপে এই পবনকুমারকে সন্তুষ্টপূর্ব্বক গুরুত্বে বরণ করিতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয় ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন।

পর দিবস প্রভাতে তুলসীদাস যথাসময়ে স্বপ্ন বৃত্তান্ত অনুসারে সেই ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—ভাগ্যক্রমে তথায় এই ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহই নাই এবং তিনি এক মনে

এক প্রাণে বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে শ্রীরামগুণ গান করিতেছেন। ইত্যবসরে তুলসীদাস সুযোগ পাইয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া আপন অভি-লাষ ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার করুণ প্রার্থনায় ব্রাহ্মণ দয়া করিয়া তুলসী দাসকে রামনামে দীক্ষিত করিয়া আপন শিষ্যত্বে বরণ করিলেন। এই দিন হইতে সেই রামায়ণ পাঠকারী ব্রাহ্মণকে আর কেহ এখানে দেখিতে পাইলেন না।

তুলসীদাস এবার গুরুর কৃপায় রামনামে দীক্ষিত হইয়া নির্জ্জনে বসিয়া ইষ্ট মন্ত্র জপ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অমৃত নির্ঝরিণী রাম নামের তরঙ্গস্রোতে বারাণসীক্ষেত্রের ভূভাগ হইতে আকাশমণ্ডল পর্য্যন্ত পবিত্র হইয়া উঠিল, সুতরাং সম্বরাপতি অমরসিংহ প্রমুখ হিন্দু নৃপতিবৃন্দ পর্য্যন্ত এই তুলসীদাসকে ভক্তির চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। ইহার কিছুকাল পর তুলসীদাস নানা তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে চিত্রকূটে উপস্থিত হইলেন। তখন সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে সেখানে বহু লোকের জনতা হইয়াছিল। নানা সম্প্রদায়ের সাধু সন্ন্যাসীগণকে এখানে একত্রিত দেখিয়া তিনি আনন্দে অধীর হইলেন, এমন কি সেই সাধুসহবাসের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া তিনি এই চিত্রকূটে কিছু দিন অব-স্থান করিতে মনস্থ করিলেন।

একদা তুলসীদাস প্রাতঃস্নানে পবিত্র হইয়া এখানে ইষ্টপূজার জন্য যখন চন্দন ঘর্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে একটী নবদূর্ব্বাদল শ্যাম-কান্তিবিশিষ্ট বালক সন্ন্যাসীবেশে তাঁহার নিকট অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ভাই! আমার চন্দন পরাইয়া দিতে পার?"

এই অপূর্ব্ব বালকের দিব্য জ্যোতিঃ দর্শনে তুলসীদাস তাঁহাকে শ্রীরাম রঘুবীর বলিয়াই স্থির করিলেন এবং মনে মনে ভগবান শ্রীরাম-চন্দ্রের শ্রীচরণ ধ্যান করিতে করিতে সহসা মূর্চ্ছিত হইলেন।

মূর্চ্ছাভঙ্গে তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার স্বহস্ত ঘর্ষিত সেই চন্দন ও সেই অপূর্ব্ব কান্তিবিশিষ্ট বালক আর তথায় নাই। তখন তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে, এ বালক স্বয়ং নরনারায়ণ শ্রীরামচন্দ্র ভিন্ন অপর কেহই নহে। এবার তুলসীদাস—উন্মাদ, বাহ্যজ্ঞানশূন্য, তিনি যাহাকেই সম্মুখেই দেখেন, তাহাকেই এই বালকের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

এইভাবে কিছুদিন অতীত হইলে একদা তিনি স্বপ্নে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন পাইলেন। স্বপ্নেই তুলসীদাসের প্রতি প্রত্যাদেশ হইল যে, "বৎস! তোমার ভক্তিতে আমি বাঁধা পড়িয়াছি, আমার আদেশ মত একখানি রামায়ণ রচনা কর—রামলীলা প্রকাশের তুমিই যোগ্য পাত্র।

ভগবানের আদেশ মত তুলসীদাস ১৫৭৫ খৃঃ রামায়ণ রচনা করিবার অভিলাষে অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন এবং এই স্থানে তাঁহার বাল্যখণ্ড লেখা সম্পূর্ণ করিলে স্থানীয় বৈষ্ণবদিগের সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হয়, এই হেতু তিনি বাধ্য হইয়া তাঁহার সাধের অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া পুনরায় কাশীক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বারাণসী গঙ্গাতীরে যথায় বসিয়া তিনি ভগবানের আদেশ পালন করিয়াছিলেন, অদ্যাপি জনসমাজে ঐ ঘাটটী "তুলসী ঘাট" নামে প্রসিদ্ধ আছে। বলাবাহুল্য যে—মহাত্মা তুলসীদাস রচিত "রামায়ণ" হিন্দুদিগের উপাদেয় এবং পবিত্র গ্রন্থ।

পুণ্য স্থান কাশীক্ষেত্রে আসিয়া গো দান, ছত্রদান, স্বর্ণদান প্রভৃতি দানকার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। যে সকল ব্যক্তি পরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হন, তাহাদের জানা উচিত যে—তীর্থ স্থানে দান করিয়াই তাহারা ঐশ্বর্য্যসুখ ভোগ করিতেছেন। তীর্থ স্থানে দান না করিলে

জন্মজন্মান্তরে দরিদ্র হইতে হয়, এ বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ভোজন সকল তীর্থের মুখ্য; অতএব সকল তীর্থেই ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া দক্ষিণাসহ তাঁহাদের সন্তুষ্ট করিতে হয়। প্রচুর পরিমাণে ভোজন করাইয়া তাঁহাদের দক্ষিণা দান না করিলে সকল ফলই নষ্ট হইয়া থাকে, শাস্ত্রে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই নিমিত্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া সাধ্যমত দক্ষিণাদানে তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করেন। কাশীক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ ভোজন ব্যতীত একটী দণ্ডী ভোজন করাইবার বিধি আছে, একটী দণ্ডী ভোজন করাইতে হইলে তাঁহাকে একটী কমণ্ডলু, একখানি কুশাসন, একখানি গেরুয়া বর্ণের ধুতি ও সাধ্যমত ভোজনান্তে দক্ষিণা দান করিতে হয়। কথিত আছে, দণ্ডীদিগের উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিতে নাই, যদি দৈবাৎ কেহ ইহা স্পর্শ করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে গঙ্গা স্নান করিয়া দেহ শুদ্ধ করিতে হয়। কাশীক্ষেত্রে—তীর্থ সকল সেবা ও দর্শন করিয়া কুমারীপূজা করিতে হয়, সর্ব্বশেষে স্বীয় পাণ্ডার নিকট সুফল লইয়া অন্য তীর্থে বা ইচ্ছামত স্থানে গমন করিতে হয়।

কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটের দক্ষিণপ্রান্তে প্রায় তিন মাইল দূরে দুর্গাবাটী নামে একটী বিখ্যাত মন্দির আছে। এই মহাদেবীকে দর্শন করিতে যাইবার সময় পথিমধ্যে তিলভাণ্ডেশ্বরের মন্দিরের সন্নিকটে প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী অহল্যা বাঈ প্রতিষ্ঠিত এক বৃহৎ শিবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অভ্যন্তরে ভগবানের প্রকাণ্ড লিঙ্গমূর্ত্তি ও চতুপার্শ্বে যে শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত বারটী বিগ্রহমূর্ত্তির দর্শন পাওয়া যায়, সেই পবিত্র মূর্ত্তিগুলি দর্শন করিলে নয়ন আর ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না, বোধ হয় সমস্ত কাশী সহর মধ্যে এরূপ সুশ্রী মূর্ত্তি আর দ্বিতীয় নাই। এই দেবালয় হইতে আরও কিছু দূরে দুর্গাবাটীটী অবস্থিত।

দুর্গাবাটী—এ তীর্থে জগজ্জননী জগদ্ধাত্রী শঙ্করের আদেশে দুর্জ্জয় দুর্গাসুরকে বিনাশপূর্ব্বক দুর্গা নাম অর্জ্জন করিয়াছেন।

দুর্গার অপর নাম শক্তি, আবার এই শক্তিদেবীই বৃত্রাসুর সংহার সময় তদীয় পুত্র শ্রীমান কার্ত্তিককে দেবসেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে শক্তি নামে খ্যাত করিয়াছেন। বলাবাহুল্য, এই দেবী নানা স্থানে নানা বেশে আবির্ভূতা হইয়া ভক্তগণকে উদ্ধার করিতেছেন। চণ্ডী পাঠে উপদেশ পাওয়া যায়—এই জগজ্জননী ত্রিনয়নী তে'ত্রিশ কোটী দেবগণের তেজ হইতে দুর্জ্জয় অসুরকুলকে বিনাশ করিবার জন্যই অবনীমাঝে অবতীর্ণা হইয়াছেন।

শক্তিরূপিণী ত্রিনয়নীর উৎপত্তির কিম্বদন্তী এই-রূপ ;—

পুরাকালে অসুরাধিপতি মহিষাসুর এবং দেবতাধিপতি ইন্দ্রের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী যে সংগ্রাম উপস্থিত হয়, সেই প্রলয়কর দেবাসুর যুদ্ধের পরিণামে—দেবতাদিগেরই পরাজয় হইয়াছিল। মহাপরাক্রম-শালী মহিষাসুর তখন বীরদর্পে যাবতীয় দেবগণসহ তাঁহাদের রাজা শচীপতি ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া স্বয়ং ঐ রাজ্য ভোগ দখল করিতে লাগিলেন। এদিকে দেবগণ অসুররাজের তাড়নায় আশ্রয়হীন হইলে—সেই সঙ্কটময় সময় অতিবাহিত করিবার কালে একদা সকলে যুক্তিপূর্ব্বক লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুসমীপে উপস্থিত হইয়া আপনা-পন দুর্দ্দশার বিষয় জ্ঞাপন করিলেন।

ভগবান বিষ্ণু—দেবগণের যুদ্ধের কথা, তাঁহাদের পরাজয়ের বিবরণ এবং আশ্রয়হীন হইবার বিষয় একে একে শ্রবণ করিবার পর তাঁহার

ভয়ঙ্কর ক্রোধ উপস্থিত হইল। ইহার ফলে তিনি ভ্রুকুটি করিলেন, অর্থাৎ তাঁহার শ্রীমুখ হইতে ব্রহ্মতেজ বাহির হইতে লাগিল। বিশ্বচক্রী-বিষ্ণুর দেখাদেখি মহেশ্বর ও ব্রহ্মা ভ্রুকুটি করিলেন, তদ্দর্শনে অপরাপর দেবগণ যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন, সেই সকলকারই মুখ হইতে অগ্নির ন্যায় তেজ বাহির হইয়া এক উজ্জ্বল বিরাট দেবীমূর্ত্তিতে পরিণত হইল।

চণ্ডীমাহাত্ম্য নামক গ্রন্থে উপদেশ পাওয়া যায়—মহাদেবের তেজে দেবীর—মুখ, বিষ্ণুর তেজে—বাহু, যমের তেজে—চুল, ব্রহ্মার তেজে—পাদদ্বয়, সূর্য্যের তেজে—আঙ্গুল, চন্দ্রের তেজে—স্তনদ্বয়, ইন্দ্রের তেজে—কটিদেশ, বরুণের তেজে—উরু, পৃথিবীর তেজে—নিতম্ব, কুবেরের তেজে—নাক, বায়ুর তেজে—কাণ, প্রজাপতির তেজে—দাঁত, অগ্নির তেজে—তিনটী নয়ন জ্বলিয়া উঠিল, ঊষা ও সন্ধ্যার তেজে—দুটী সুন্দর বাঁকা ভ্রূর সৃষ্টি হইল, এতদ্ভিন্ন অপরাপর দেবতাদিগের তেজে দেবী সর্ব্বমঙ্গলা সর্ব্ব সুলক্ষণযুক্তা রূপ ধারণ করিয়া দেবতাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ঠিক এই সময় সূর্য্যদেব প্রীতমনে ঐ স্ত্রীমূর্ত্তির, প্রতি লোমকূপে আপন কিরণরাশি ঢালিয়া দিলেন, ইহার ফলে ত্রিনয়নীর প্রাকৃতিক দৃশ্য ধক্ ধক্ জ্বলিতে লাগিল। এইরূপে যে দেবীর সৃষ্টি হইল—তিনি তৎক্ষণাৎ দেবাদিদেব মহাদেবের তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন।

কিছুকাল অতীত হইলে পর—এই তপস্যার ফলে তিনি একদা মহাদেবের কৃপায় মহেশ্বরকেই পতিত্বে বরণ করিলেন। তখন ভগবান মহেশ্বর দেবগণকে নিজ নিজ মূল অস্ত্র হইতে যুদ্ধাস্ত্র বাহির করিয়া তাঁহাকে রণবেশে সজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন, অধিকন্তু মহাগিরি হিমালয় হইতে একটী মহাকায়া প্রচণ্ড পশুরাজকে আনয়ন করাইয়া

দেবীর বাহনরূপে নিযুক্ত করাইয়া দিলেন। তদ্দর্শনে ক্ষীরদসমুদ্রের দেবী (লক্ষ্মী) তাঁহাকে নানা বহু মূল্য বসনভূষণে ভূষিতা করিলে—শঙ্করী এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিলেন। এইরূপে মহাদেবী অপূর্ব্ব সাজে শোভিতা হইলে—ভগবান শঙ্কর তাঁহাকে সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই দুর্জ্জয় মহিষাসুরকে সদলে বিনাশ এবং দেবতাদিগের দুঃখমোচন করিতে উপদেশ দান করিলেন।

মহাদেবী মহাদেবের আদেশে সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিলে—তাঁহার পদভরে পৃথিবী টলমল, এমন কি যাবতীয় জীবজন্তু ও গিরিপর্ব্বত থর থর কাঁপিতে লাগিল। তখন দেবতারা মহানন্দে "জয় সিংহবাহিনী কী জয়" শব্দে দিগদিগন্ত পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন; ইত্যবসরে দেবী অট্টহাসি হাসিয়া এক হুঙ্কার ছাড়িলেন। সেই হুঙ্কারের ফলে সমস্ত বিশ্ব ভরিয়া অনন্ত-জগৎ স্তব্ধ হইল, সপ্তসমুদ্র উথলিয়া উঠিল, স্বর্গরাজ্যে সহসা মহিষাসুরের প্রাণে আতঙ্ক প্রদান করিল।

এদিকে শঙ্করী শঙ্করের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া যথাসময়ে স্বর্গ-রাজ্যে মহিষাসুরকে সদলে বিনাশপূর্ব্বক দেবতাদিগের দুঃখমোচন করিলেন। তখন দেবগণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। এ যুদ্ধে দেবী শিবকে দূতরূপে বাহাল করিয়া আপন কার্য্যসিদ্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া জনসাধারণে তাঁহাকে—শিবদূতী নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

ত্রেতাযুগে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীরামচন্দ্র দেবগণের কাতর প্রার্থনায় দুর্জ্জয় রাবণকে সবংশে বিনাশ করিতে গমন করিলে—তিনি ভয়বিহ্বল-চিত্তে এই দেবীরই শরণাপন্ন হইয়া নির্ভয়চিত্তে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন রঘুবীর আপন কার্য্যসিদ্ধির জন্য এক শত আটটী নীলপদ্ম যথা-নিয়মে উৎসর্গপূর্ব্বক ভগবতীকে প্রসন্ন করিয়া রাবণকে বিনাশ করিয়া-ছিলেন। সেই ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ শ্রীরামসেনাপতি বানররাজ

সুগ্রীবের আদেশে—কপিবানরগণ করুণাময়ী জগজ্জননীর মন্দিরটী পাহারায় নিযুক্ত আছে, আর এই কারণে দুর্গাবাটীর চতুঃসীমার মধ্যে ভগবতীর মন্দিরে এই সকল কপিবানরগণকে দেখিতে পাওয়া যায়। কাশীস্থ এই দুর্গাদেবীর পূজার্চ্চনা করিতে যাত্রাকালীন যাত্রিগণ! এক গাছি যষ্টি সঙ্গে লইবেন,নচেৎ সেই সকল বানরগণের তাড়নায় অকারণ লাঞ্ছিত হইতে হইবে। বলাবাহুল্য, এখানে এত বানর আছে যে, তাহাদিগকে সামান্যমাত্র খাদ্য-সামগ্রী প্রদান করিলে, চারিদিক হইতে পালে পালে লাফাইয়া পড়িয়া, তাহারা একটীর উপর আর একটী পতিত এবং কাড়াকাড়ি করিয়া একের খাদ্য অপরে লইয়া থাকে। ইহা এক কৌতুকবহ দৃশ্য!

দুর্গাবাটী প্রবেশকালে—ইহার সম্মুখভাগে যে সকল পত্রপুষ্প ও ডালার দোকান দেখিতে পাওয়া যায়,ভক্তগণ সাধ্যমত তথায় আপনাপন আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি সংগ্রহপূর্ব্বক দেবীর পূজার্চ্চনা করিতে পারেন। এই মন্দিরের উত্তরদিকে যে একটী চারিধার বাঁধান চতুষ্কোণ পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়, উহাই দুর্গাকুণ্ড নামে খ্যাত। যাত্রীগণ এ তীর্থে উপস্থিত হইয়া যথানিয়মে এই কুণ্ডবারি স্বীয় মস্তকে সিঞ্চন করিয়া চরিতার্থ বোধ করিয়া থাকেন। মন্দির প্রাঙ্গণের বহির্ভাগে যে প্রশস্ত পতিত জমি দেখিয়া থাকেন—প্রতি মঙ্গলবারে ঐ স্থানে একটী মেলা বসে। এ তীর্থে দেবী উদ্দেশে প্রত্যহ বিস্তর ছাগবলি হইয়া থাকে। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত দুর্গাবাটীর একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল।

যে সকল যাত্রী ধর্ম্মশীল হইয়া কাশীক্ষেত্রে বাস করেন, তাঁহারা স্বীয় আত্মা ও পিতৃগণকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। অতএব অর্থ, শরীর ও বেশ-ভূষাদি—সকল পদার্থই নশ্বর, অসার ও অনিত্য, ইহা নিশ্চয় জানিয়া সংসারভয়ভঞ্জন দুরিতহারী, ত্রাণকারী কাশীধামের সেবা

করা কর্ত্তব্য। কলিযুগে একমাত্র সর্ব্বদুরিতহারী কাশীক্ষেত্র ব্যতীত জীবগণের আর কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত দৃষ্ট হয় না। যে তীর্থে দেবনদী প্রবাহিতা, যথায় মণিকর্ণিকা বিরাজিতা, তথায় দেহীমানবকুল যে মুক্তিপ্রাপ্ত হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? অধর্ম্মনিরত ব্যক্তিরা যদি এই ক্ষেত্রসীমা মধ্যে প্রাণ ত্যাগ করে, তাহা হইলেও স্থান মাহাত্ম্য-গুণে তাহাকে আর কখন সংসারমাঝে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। কাশীর অদূরে—রামনগর নামে যে একটী স্থান আছে, যাহা ব্যাস-কাশী নামে প্রসিদ্ধ। যথায় কাশীর রাজা স্বয়ং বাস করিয়া থাকেন। সেই নির্দ্দিষ্ট সীমামধ্যে কেহ দেহত্যাগ করিলে জগজ্জননী অন্নপূর্ণাদেবীর বরপ্রভাবে তাহাকে গর্দ্দভ জন্মলাভ করিতে হয়।

কাশীর দ্রষ্টব্য স্থান—বিশ্বেশ্বরজীউর মন্দির, মণিকর্ণিকা, দশাশ্বমেধঘাট, নন্দীকেদারেশ্বরের মন্দির, দুর্গাবাটী, মানমন্দির, ডালকা-মণ্ডাই, বেণীমাধবজীউর মন্দির, জ্ঞানবাপী, মহারাণী অহল্যা বাঈয়ের দেবালয়, তিলভাণ্ডেশ্বরের মন্দির, গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত কলেজবাটী, ভাস্করানন্দ স্বামীর মঠ, বুদ্ধ সারনাথ-দেবের মন্দির ইত্যাদি।

সারনাথ—কাশী সহরের ৬ মাইল দূরে এই প্রাচীন বৌদ্ধ কীর্ত্তিস্তম্ভটীর শোভা দর্শন পাওয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে ইহা এখানে ভূগর্ভে প্রোথিত ছিল, সম্প্রতি মহামতি বড়লাট কর্জ্জন বাহাদুরের আদেশে এবং স্থানীয় বুদ্ধ অধিবাসীদিগের যত্নে ইহা পুনরাবিষ্কৃত হইয়াছে। কাশী তীর্থসেবকগণ ইচ্ছা করিলে ইহার সেই প্রাচীন সৌন্দর্য্য দেখিতে পারেন। ইতিপূর্ব্বে গয়া তীর্থ হইতে—যেরূপ বুদ্ধগয়া মন্দিরের অদ্ভুত কীর্ত্তিকলাপ দর্শন করিয়াছেন, এখানেও ঠিক সেইরূপ বুদ্ধ সারনাথ-দেবের প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ দর্শনে আত্মহারা হইবেন, সন্দেহ নাই।

কাশীতে প্রস্তর নির্ম্মিত কলেজ বাটীর গঠনপ্রণালী অতি সুন্দর।

এই কলেজটীর ১৮৯৩ খৃঃ নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। ১৭৯১ খৃঃ বারাণসীতে গভর্ণমেণ্ট যে সংস্কৃত কলেজ বাটী স্থাপন করেন, বিষয়কর্ম্মের পক্ষে সুবিধা হয় বলিয়া লোকেরা সংস্কৃত শিক্ষার পরিবর্ত্তে ইহাতে কেবল ইংরাজী শিখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

কাশীসহরে যে সমস্ত প্রস্তরময় বাটী নির্ম্মাণ হয়, ঐ সমস্ত পাথরগুলির মধ্যে অধিকাংশ প্রস্তর খণ্ড গঙ্গাবক্ষে নৌকার সাহায্যে চুনার নামক স্থান হইতে সংগৃহীত হয়। এই চুনার হইতে ১০ ক্রোশ পশ্চিমে মির্জ্জাপুর অবস্থিত, পূর্ব্বে এখানে একটী শস্যের হাট বসিত বলিয়া এই স্থানটী ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। বর্ত্তমানকালে রেলপথ প্রস্তুত হওয়ায় সেই বাণিজ্য স্থানটী এক্ষণে অন্যত্রে উঠিয়া গিয়াছে। মির্জ্জাপুর জেলার দক্ষিণ অংশ পর্ব্বতময় এবং কোন কোন স্থান এমন জঙ্গলপূর্ণ যে—তথায় স্বচ্ছন্দে ব্যাঘ্রগণ অবস্থান করিয়া থাকে। মির্জ্জাপুর ষ্টেশনের অনতিদূরে শ্রীশ্রীবিন্ধ্যেশ্বরীর দেবালয় আছে, ভক্তগণ এই স্থানে দেবীর দর্শন করিয়া নয়ন ও জীবন চরিতার্থ বোধ করিয়া থাকেন।

ব্যাসকাশী

কাশী তীর্থের মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইলে পর—একদা ব্যাসদেব মনে মনে ভাবিলেন, কাশী মাহাত্ম্যে দেখিতেছি—পাপীরা এখানে আসিয়া যদি আর পাপ না করে, তাহা হইলে কাশীসীমার মধ্যে তাহার মৃত্যু হইলে সে হরপার্ব্বতীর কৃপায় মুক্তিলাভ করিবে; কিন্তু কোন ধার্ম্মিক—আজীবন ধর্ম্ম-কর্ম্মে রত থাকিয়া যদি কাশীবাসী হয় এবং কোনরূপে অজ্ঞানত পাপ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে সে পাপের আর

মুক্তি নাই। ঋষিবর এই সকল চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, আমায় এখানে এমন একটী কাশীর—সৃষ্টি করিতে হইবে, যথায় পাপীরা আসিলে উদ্ধার হইবে, অথচ আমার প্রতিষ্ঠিত কাশীমধ্যে বাস করিয়াও যদ্যপি পাপকার্য্যে রত হয়, তাহা হইলে আমার আশীর্ব্বাদে অনায়াসে সে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে, আরও আমি যে সহরটী নির্ম্মাণ করিব, উহা আমারই নামানুসারে ব্যাসকাশী নামে প্রসিদ্ধ হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি মহেশ্বর প্রতিষ্ঠিত কাশীসীমার অনতিদূরে অর্থাৎ রামনগরে একটী পৃথক্ সহর সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন।

এদিকে অন্নপূর্ণাদেবী—ব্যাসের মনোভাব অন্তরে অবগত হইয়া ভাবিলেন, "ব্যাসের ওরূপ কাশীর সৃষ্টি হইলে মহেশ্বরের সোণার কাশী অরণ্যে পরিণত হইবে, কেন না—সকলেই ব্যাসকাশীতে গিয়া বাস করিবে।"

দেবী এইরূপ চিন্তা করিয়া এক বৃদ্ধার বেশ ধারণপূর্ব্বক যষ্টি হস্তে ধীরে ধীরে যথায় ব্যাসদেব তাঁহার কাশীক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া মৃদুস্বরে ব্যাসকে জিজ্ঞাসিলেন, "বাবা, তুমি এক মনে এখানে কি করিতেছ?"

ব্যাসদেব উত্তর করিলেন, "বুড়ি, আমি এখানে এমন একটী কাশী সৃষ্টি করিতেছি যে, এখানে বাস করিয়া যে যত পাপকার্য্য করুক বা অন্য স্থানের পাপী এখানে বাস করুক, আমার আশীর্ব্বাদে মৃত্যুকালে সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে।"

"ভাল ভাল" বলিয়া দেবী কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া তৎদণ্ডে—পুনরায় ব্যাসস্থানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে ম'লে কি হবে বলিলে বাবা?"

এইরূপ পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে ব্যাসদেব ঐ বৃদ্ধার উপর

রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, "এখানে মলে গাধা হবে, শুনিতে পেয়েছিস্ বুড়ি।"

দেবী তৎশ্রবণে হাস্যপূর্ব্বক "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

ব্যাস তখন দেবীর চাতুরী বুঝিতে পারিয়া "হায় কি করিলাম" বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। এই কারণে রামনগরে ব্যাস প্রতিষ্ঠিত কাশীতে কাহারও মৃত্যু হইলে দেবীর বরপ্রভাবে তাহাকে গর্দ্দভ জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। চৈত্র মাসে শ্রীরামনবমীর সময় রামনগরে মহাসমারোহের সহিত রামলীলা উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে।

কাশীর শিক্রোল নামক স্থানে ইংরাজেরা বাস করিয়া থাকেন। শিক্রোলে চূড়াবিশিষ্ট একটী সুন্দর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে, উহার নিকটস্থ প্রাঙ্গণে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার জলে কয়েকটী পোষা কুম্ভীর নানাপ্রকার খেলা দেখাইয়া দর্শকবৃন্দকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকে, অধিকন্তু খাদ্য-দ্রব্য পাইলে তাহারা নিকটে আসিয়া খেলা করিয়া থাকে। কাশীর বাজার, চক, ডালকা, মণ্ডাই এই সকল স্থানে নানা প্রকার লোকের আচার-ব্যবহার দেখিলে অনেক রকম শিক্ষালাভ হইয়া থাকে।

কাশীর পাণ্ডারা প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতে সুফলের প্রণামী ব্যতীত পৃথক্ ৩৲ টাকা ৵৹ আনা আদায় করিয়া থাকেন। নিম্নলিখিত বাবুদে এই ৩৲ টাকা ৵৹ আনা আদায় হয়, যথা—গঙ্গাপুত্র অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ—গঙ্গাস্নান সময় মন্ত্র পাঠ করান, উঁহারাই এখানে গঙ্গাপুত্র নামে খ্যাত। তাঁহার মজুরী ১৲ টাকা ৴৹ আনা, যাত্রাওয়ালা অর্থাৎ যে সকল লোক কাশীর তীর্থস্থান সকল, ভক্তগণকে দর্শন করাইয়া থাকেন—তাহারাই যাত্রাওয়ালা নামে খ্যাত। ইহাদের মজুরী ১৲ টাকা ৴৹ আনা। কাশীতে উপস্থিত হইয়া যাঁহাকে তীর্থগুরু মান্য

করা যায়—তিনি নিজ ব্যয়ে যাত্রীদিগকে বিশ্রাম স্থান প্রদান করেন। এই বিশ্রাম স্থানের—ভাড়াস্বরূপ প্রত্যেক যাত্রীর নিকট ১৲ টাকা /০ আনা, এই তিন বাবুদে ১৲ টাকা /০ আনার হিসাবে মোট ৩৲ টাকা ৶০ আনা দিতে হয়। কাশীতে আসিয়া কুমারীপূজা করিতে হয়, এই পূজার সময় পাণ্ডার আদেশ মত একটী ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভবা কুমারীকে থালা, গেলাস, সাড়ী প্রভৃতি দ্রব্য-সামগ্রী যথানিয়মে মন্ত্রপূত করিয়া দান উৎসর্গ করিতে হয়, শেষে তাঁহাকে যত্নের সহিত ভোজন করাইয়া দক্ষিণাসহ তুষ্ট করিতে হয়। কথিত আছে, পুণ্যস্থান কাশীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যে ব্যক্তি এইরূপ কুমারীকে পূজার্চ্চনায় সন্তুষ্ট না করেন, ভগবান বিশ্বেশ্বর তাহার কোন পূজাই গ্রহণ করেন না।

কুমারীপূজার কারণ ;—

পুরাকালে মহেশ্বর কর্ত্তৃক কাশী ও মণিকর্ণিকা প্রতিষ্ঠিত হইবার পর—এক সময় দেবাদিদেব কিছুকালের জন্য কুশদ্বীপস্থিত মন্দারপর্ব্বতে যাইয়া অবস্থান করেন। ঐ সময় কাশীক্ষেত্রে কোন নির্দ্দিষ্ট প্রজাপালক না থাকায় অত্যন্ত অমঙ্গল ঘটিতে আরম্ভ হইল। দেবোদাস নামে এক ব্যক্তি সংসার পরিত্যাগ করিয়া সেই সময় এই স্থানে বাস করিতেছিলেন। প্রজারা তাঁহাকে ধার্ম্মিক ও সুন্দরকান্তি পুরুষ দেখিয়া তাঁহাকেই উপযুক্তবোধে কাশীর রাজারূপে অভিষেক করিলেন। বহুকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে পর একদা ভোলানাথের আনন্দকানন (কাশী) স্মরণ হইল, তখন মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি তাঁহার কাশীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেবোদাসকে এখানকার রাজা দেখিলেন, তদ্দর্শনে তিনি দেবোদাসকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। দেবোদাস কিছুতেই সম্মত হইলেন না, তখন মহাদেব ভাবিলেন,

মার অভয়বাণীতে এ কাশীতে যে ব্যক্তি শুদ্ধচিত্তে ধর্ম্মাবলম্বনপূর্ব্বক স করে, সে পাপী হইলেও আমার কৃপায় নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে। তএব এই ধর্ম্মাত্মা রাজা দেবোদাসকে কোন উপায় অবলম্বনে বিতাড়িত করিব, পাপসংঘটন ব্যতিরেকে তাহাকে বিদায় করা যুক্তিসঙ্গত য়—এইরূপ স্থির করিয়া তিনি শঙ্করীর চৌষট্টি যোগিনীদিগকে আজ্ঞা করিলেন, "তোমরা কুমারীবেশে কাশীর রাজা দেবোদাসের কিম্বা কাশীবাসীগণের পাপ অনুসন্ধান কর।"

যোগিনীগণ ভগবানের আদেশপালনার্থে কুমারীবেশে কাশীর প্রতি ঘরে ঘরে—পাতি পাতি অনুসন্ধান করিয়াও কুত্রাপি পাপের সন্ধান পাইল না। এইরূপে অধিকদিন এই স্থানে বাস করিয়া তাহাদের মায়া কাশীতে বসিয়া যায় ও এই স্থানে শুদ্ধচিত্তে বাস করিতে থাকে। সদাশিব বহুদিন যোগিনীগণের কোন সন্ধান না পাইয়া অন্য উপায়ে, কাশী পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া যখন নগর মধ্যে প্রবেশ করেন, সেই সময় ঐ সকল যোগিনীগণ ভগবানের দর্শনে ভীতচিত্তে তাঁহারই শ্রীচরণ ধারণপূর্ব্বক অবনতমস্তকে রোদন করিতে লাগিল; তদ্দর্শনে ভোলানাথ মৃদুহাস্যসহকারে তাহাদিগকে অভয়বচনে বলিলেন, "যোগিণিগণ! তোমাদের চিন্তিত হইবার আবশ্যক নাই," আমার কাজে অকৃতকার্য্য হইয়াও যখন তোমরা অন্যত্র না পলাইয়া আমারই প্রিয়কাশীতে বাস করিতেছ, তখন আমি সন্তোষের সহিত তোমাদের এই বর দিতেছি যে, অতঃপর যে কোন ভক্ত কাশীতে আসিয়া তোমাদের উদ্দেশে মন্ত্রপূতসহকারে পূজা ও ভোজন প্রদান না করাইবে, আমি কখনই তাহার পূজা গ্রহণ করিব না। সদাশিবের বরে এইরূপে কাশীক্ষেত্রে কুমারীপূজার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, আর এই নিমিত্তই যাত্রীগণ এ তীর্থে আসিয়া কুমারীপূজা করিয়া থাকেন।

মণিকর্ণিকা ত্রিলোকপূজ্য হইবার কিম্বদন্তী ;—

মহাপ্রলয়কালে স্থাবরজঙ্গম বিলুপ্তপ্রায় হইলে—ব্রহ্মাণ্ড তমোময় হইয়া পড়িল ; তখন চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ ও তারাগণ কিছুই ছিলনা—একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন। যিনি পরমানন্দ ও তেজঃস্বরূপ, নিরাকার, নির্গুণ, সর্ব্বব্যাপী ও সমুদয়ের মূলীভূত কারণস্বরূপ বিদ্যমান ছিলেন ; সেই সময় তাঁহার দ্বিতীয় ইচ্ছা সঞ্জাত হইলে—সেই অমূর্ত্তি ব্রহ্ম লীলাবশে একটী মূর্ত্তির কল্পনা করিলেন, ঐ মূর্ত্তি সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্না, সর্ব্বজ্ঞানময়ী, সর্ব্বকার্য্যকারিণী। পরব্রহ্ম—সেই শুদ্ধিরূপিনী ঈশ্বরীমূর্ত্তির কল্পনা করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। যিনি সেই সর্ব্বমূলাধার অমূর্ত্ত পরব্রহ্ম, বিশ্বেশ্বরই সেই মূর্ত্তি, প্রাচীন মহাত্মাগণ তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

অনন্তর সেই পরমব্রহ্ম অন্তর্হিত হইলে—একমাত্র তিনি ইচ্ছানুসারে বিহার করিতে লাগিলেন, তৎপরে তাঁহার নিজ দেহ হইতে স্বশরীরানুরূপ আর এক মূর্ত্তির সৃষ্টি করিলেন। সেই মূর্ত্তিই পার্ব্বতী। এই দেবী পরম গুণবতী, মায়া প্রধানা বা প্রকৃতি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। কোন এক সময়ে কালরূপ ব্রহ্ম মচ্ছক্তিরূপিণী পার্ব্বতীর সহিত মিলিত হইয়া এই পুণ্য ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করেন। সেই শক্তিই প্রকৃতি এবং সেই পুরুষই পরম ঈশ্বর। তাঁহারা উভয়েই এই পঞ্চক্রোশী পরিমিত পরমানন্দময় "কাশীক্ষেত্র" সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রলয়কালেও কদাপি তাঁহারা এই ক্ষেত্র ত্যাগ করেন না। এই নিমিত্ত ইহার অপর নাম অবিমুক্তক্ষেত্র।

অনন্তর বিশ্বেশ্বর ও পার্ব্বতী উভয়ে সেই আনন্দকাননে বিহার

করিতে করিতে অপর একটী মূর্ত্তি সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন, এবং স্থির করিলেন, ঐ মূর্ত্তির উপর সমস্ত মহাভার অর্পণপূর্ব্বক তাঁহারা ইচ্ছানুরূপ বিচরণ করিতে পারিবেন। যে পুরুষ উৎপন্ন করিবেন, তিনিই সংসার পরিপালন এবং সংহার করিবেন। যাহারা কাশীক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিবে, তাঁহারা উভয়েই তাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন। ভগবান বিশ্বেশ্বর—জগদ্ধাত্রীর সহিত এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া স্বীয় বামাঙ্গে সুধাবর্ষিণী দৃষ্টি নিপাতিত করিলেন। ইহার ফলে তৎক্ষণাৎ ত্রিভুবনসুন্দর একটী পুরুষের আবির্ভাব হইল—সেই পুরুষ শান্ত,সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন ও গাম্ভীর্য্যে সাগরজেতা। তিনি ক্ষমাশীল,ইন্দ্রনীলকান্তি, শ্রীমান, পদ্মপলাশলোচন এবং তাঁহার বাহুদ্বয় প্রচণ্ড ও দীপ্তিপূর্ণ। তিনি একাকী সর্ব্বগুণের আশ্রয় ও সর্ব্বকলার নিধি। তাঁহাকে এইরূপ মহা-মহিমাসম্পন্ন দেখিয়া বিশ্বেশ্বর কহিলেন, "হে অচ্যুত! আমার আদেশে তুমি মহাবিষ্ণু নামে পরিচিত হও। আমার আশীর্ব্বাদে তোমার নিশ্বাস হইতে সমস্ত বেদের আবির্ভাব হইবে, সেই বেদ হইতে তুমি সকল বিষয় জানিতে সক্ষম হইবে, আরও আমার আদেশ মত তুমি বেদদৃষ্ট পথের অনুসারী হইয়া সমস্ত কার্য্য যথাযথরূপে সম্পাদন কর।" বিশ্বে-শ্বর—বুদ্ধিতত্ত্বরূপী সেই মহাবিষ্ণুকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া পার্ব্বতীর সহিত আনন্দকাননে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর মহাবিষ্ণু শিবাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ক্ষণকাল ধ্যানমগ্ন-ভাবে অবস্থানপূর্ব্বক তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। তিনি তথায় চক্র দ্বারা একটী পুষ্করিণী খননপূর্ব্বক স্বীয় অঙ্গগলিত স্বেদজল দ্বারা উহা পূর্ণ করিলেন এবং পঞ্চাশৎ সহস্র বৎসর নিশ্চল হইয়া ভগবানের কঠোর তপস্যায় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। বিশ্বেশ্বর তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া মৃণালীর সহিত তথায় আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে তপঃ

প্রজ্জলিত, নিশ্চল ও মুদ্রিত নয়ন দেখিয়া হৃষীকেশকে বলিলেন, "হে বিষ্ণু! তোমার তপস্যার কি মহত্ত্ব! আর তোমার তপস্যার প্রয়োজন নাই, এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।"

মহাবিষ্ণু—বিশ্বেশ্বর প্রোক্ত এই বাক্য শ্রবণমাত্র পদ্মনেত্র উন্মীলন-পূর্ব্বক বলিলেন, "হে দেবেশ! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বরদান করুন, যেন ভবানীসহ সকল কর্ম্মের পুরো-ভাগে আপনাকে দর্শন করিতে পাই।"

তখন সদাশিব হৃষ্টচিত্তে উত্তর করিলেন, "হে জনার্দ্দন! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে আমার বরপ্রভাবে তাহাই হইবে—তদীয় তপস্যার মহোন্নতিদর্শনে মদীয় ভুগজ-ভূষণ-ভূষিত মৌলিদেশ আন্দোলনহেতু কর্ণ হইতে মণিখচিত মণিকর্ণিকালঙ্কার এই স্থানে পতিত হইয়াছে, অতএব আমার বাক্যানুসারে এই স্থান "মণিকর্ণিকা" নামে প্রসিদ্ধ হউক। হে শঙ্খ চক্র-গদাধর! তুমি চক্র দ্বারা এই স্থান খনন করাতে পূর্ব্ব হইতেই ইহা কল্যাণকর চক্র-পুষ্করিণীতীর্থ এবং আমার কর্ণ হইতে যে সময় মণিকর্ণিকা পতিত হইয়াছে, তদবধি ইহা লোকদুরিত-হারী পরম পবিত্র হইয়াছে। অতএব আমার বচনানুসারে এই স্থান, তীর্থসমূহের মধ্যে পরম তীর্থ ও মুক্তিক্ষেত্র হউক। আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম মধ্যে যে কোন জীব আছে, এই চক্রতীর্থে একবারমাত্র স্নান করিলে আমার কৃপায় সে—সকল পাপ হইতে মুক্তি পাইবে। যে মণিকর্ণিকার এত মাহাত্ম্য, তথায় কাহার না স্নান করিয়া পিতৃপুরুষদিগকে উদ্ধার করিতে বাসনা হয়? অন্তিম সময় জীবমাত্রেই এখানে দক্ষিণ কর্ণ উত্তোলনপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়া থাকে। ইহার প্রধান কারণ এই—হরপার্ব্বতী স্বয়ং নিজ হস্তে জীব-দিগের দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিয়া তাহাদিগকে তারকব্রহ্ম নাম শুনাইয়া

উদ্ধার করিয়া থাকেন। পূর্ব্ব জন্মে বহু পুণ্য বা তপস্যা না করিতে পারিলে কখনই কাহারও ভাগ্যে কাশীবাস ঘটে না।

কাশীক্ষেত্রে যাবতীয় নিয়ম সকল পালন, দেবতাদিগের এবং দ্রষ্টব্য স্থানগুলির দর্শনান্তে আপন পাণ্ডার নিকট সুফল গ্রহণ করিয়া অপর কোন তীর্থ স্থান বা স্বদেশে প্রত্যাগমনের সময় স্থানীয় কাশী নামক ষ্টেশন হইতে ট্রেণে না উঠিয়া—বেনারস কেণ্টনমেণ্ট নামে যে ষ্টেশন আছে, উহা হইতেই রেলে উঠিবেন। কেন না—এখানে ট্রেণখানি যাত্রীদিগের উঠিবার ও নামিবার সুবিধার জন্য ১৫ মিনিটকাল স্থগিত থাকে, কিন্তু কাশী নামক ষ্টেশনে কেবলমাত্র ৩ মিনিটকাল অপেক্ষা করে। যাত্রীদিগের মোট, পুটলী, বাক্স প্রভৃতি ও স্ত্রীপুত্র লইয়া এত অল্প সময়ের মধ্যে সেই জনতা ভেদপূর্ব্বক রেলগাড়ীতে উঠা অত্যন্ত কষ্টকর হয়, এমন কি আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি—এই নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে কাশী ষ্টেশন হইতে অনেকে গাড়ীতে উঠিতে না পারিয়া সমস্ত দিন হতাশ প্রাণে ষ্টেশনে দ্বিতীয় ট্রেণের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন। সে যাহা হউক, আমরা কাশী হইতে প্রয়াগ তীর্থ সেবা করিবার উদ্দেশে এলাহাবাদ যাত্রা করিয়াছিলাম, সুতরাং উহারই বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল।

বেনারস কেণ্টনমেণ্ট ষ্টেশন হইতে ই-আই-রেল কোম্পানীর প্রধান জংশন মোগলসরাই নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া আমরা সদলে এলাহাবাদ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। পথিমধ্যে কেবল মির্জাপুরের অন্তর্গত শ্রীশ্রীবিন্ধ্যবাসিনীদেবীর শ্রীচরণ বন্দনা করিবার অভিলাষে একবার বিন্ধ্যাচল নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিয়াছিলাম।

বিন্ধ্যাচল

বিন্ধ্যাচল ষ্টেশনের প্রায় এক ক্রোশ দূরে ঠগীদিগের স্থাপিত এক মর্ম্মরপ্রস্তর নির্ম্মিত, মন্দির মধ্যে ভক্তগণ যোগমায়ার অষ্টভুজা বা বিন্ধ্যবাসিনীদেবী মূর্ত্তির দর্শন করিয়া জীবন ও নয়ন চরিতার্থ করিয়া থাকেন। ষ্টেশনের অনতিদূরে ধর্ম্মশালা আছে। যাত্রীগণ—তথায় অবাধে বিশ্রামসুখ অনুভব করিতে পারেন।

ধর্ম্মশালা হইতে যোগমায়াদেবীর মন্দির—অন্যূন অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে এক উচ্চ পর্ব্বতের উপরিভাগে মায়াময়ী যোগমায়াদেবীর মন্দিরটী প্রতিষ্ঠিত। এই উচ্চ মন্দিরে উঠিবার সিঁড়ী আছে, সিঁড়ীগুলির আশে পাশে বিস্তর বৃক্ষশ্রেণী এবং তাহার মধ্যে মধ্যে কতকগুলি গুহা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল গুহা মধ্যে কত সাধু কত সন্ন্যাসী যাঁহারা বেদ-পাঠ করিতেছেন, তাঁহাদের দর্শন পাওয়া যায়। আহা! সেই পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণ শব্দ শ্রবণ করিলে —কর্ণ যেন পরিতৃপ্ত হয়। এখানকার এই শৈলশিখরের কিয়দংশে এক গুহা খনন করিয়া যোগমায়াদেবীর পবিত্র মূর্ত্তিটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে গৃহে দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার দুই ধারে দুইটী দ্বার, এবং মধ্য স্থলটী এত অল্প পরিসর যে ৮।১০ জনের বেশী লোক কিছুতেই ইহার মধ্যে উপবেশন করিতে পারেন না।

কথিত আছে,যে সময় পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ—দেবগণের কাতর প্রার্থনায় কংসকে বিনাশ করিবার জন্য মথুরায় বসুদেব-পত্নী দেবকীর অষ্টম গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, অষ্টমীর সেই ঘোরান্ধকার রজনীতে দেবকীপতি বসুদেবের প্রতি তখন এক দৈববাণী হয় যে, "মহাত্মন! তুমি নির্ভয়ে এই সদ্যঃজাত পুত্রটীকে গোকুলনগরে—নন্দালয়ের সূতিকা গৃহে

রাখিয়া, তৎপরিবর্ত্তে নন্দরাণী যশোমতী সম্প্রতি যে কন্যারত্ন প্রসব করিয়াছেন, সেই কন্যাটীকে অপহরণপূর্ব্বক এই কারাগৃহ মধ্যে স্থাপন কর। মায়াময়ের মায়া প্রভাবে কংসরাজের যাবতীয় প্রহরীগণ অচেতনপ্রায়, অতএব এই অবসরে তুমি আপন কার্য্য সম্পন্ন কর।"

বসুদেব—সেই দৈববাণী অনুসারে কার্য্যসিদ্ধি করিয়া যথাসময়ে তাহাকে দেবকীর কোলে স্থাপন করিবামাত্র সে কাঁদিয়া উঠিল। তৎ-শ্রবণে প্রহরীগণ হৃষ্টচিত্তে আপন প্রভু কংসরাজের নিকট দেবকীর সন্তানের বিষয় জ্ঞাপন করিল।

অসুররাজ কংস—মুহূর্ত্তমধ্যে কারাগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, এবার তাঁহার ভগ্নী একটী সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যা প্রসব করিয়াছেন। তখন তিনি মনে মনে একবার চিন্তা করিলেন, "দেবর্ষি নারদ আমায় বলিয়াছিলেন—দেবকীর অষ্টম গর্ভের পুত্রই আমার কালসম হইয়া বিনাশ করিবে," কিন্তু আমি ইহাকে পুত্রের পরিবর্ত্তে একটী সামান্য কন্যা দেখিতেছি। যাহা হউক, দেবচক্রে সকলই সঙ্ঘটন হইতে পারে, শত্রুর মধ্যে কি কন্যা, কি পুত্র কেহই ভাল নয়, অতএব ইহাকে বিনাশ করাই শ্রেয়ঃ। কংসরাজ—মনে মনে নানাপ্রকার তর্কের পর এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া ঐ সদ্যঃ প্রসূত কন্যাটীকে হত্যাভিলাষে দেবকীর কোল হইতে গ্রহণ করিয়া নিকটস্থ এক প্রস্তর খণ্ডের উপর সজোরে আছাড় দিবামাত্র—মায়াময়ী মায়াদেবী নিজমূর্ত্তি ধারণ করতঃ কংসকে হিতোপদেশ দিলেন, "তোকে মারিবে যে—গোকুলে বাড়িছে সে," এইরূপ বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। মায়াময়ী মায়াদেবী নারায়ণের আদেশপালন করিয়া এইরূপে স্বস্থানে প্রস্থান করিবার সময় তিনি যে মূর্ত্তিতে এখানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, সেই পবিত্র মূর্ত্তিরই এ তীর্থে দর্শন পাওয়া যায়।

বিন্ধ্যাচলে দেবীমন্দিরের এক পার্শ্বে একটী সুরঙ্গ পথ বর্ত্তমান আছে। স্থানীয় পূজারীরা—যাত্রীদিগকে বলেন যে, "মায়াদেবী এখানে ঐ সুরঙ্গ পথ দিয়া আবির্ভূতা হইয়াছেন।" এই নিমিত্ত আমরা যত্নের সহিত ঐ সুরঙ্গ পথটী অদ্যাপি এখানে রক্ষা করিতেছি।

মায়াদেবীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ;—

ধর্ম্মাত্মা মহারাজ সুরথ—মেধস ঋষির নিকট মহামায়ার শক্তিতে মনুষ্যমাত্রেই মোহের বশে আচ্ছন্ন আছেন উপদেশ পাইলে—এই মোহই জগৎসংসারে "সৃষ্টির মূল" বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। প্রমাণস্বরূপ দেখুন—এই মোহের বশে আপন আপন বলিয়া যদি পিতা-মাতা—সন্তানকে, সন্তান—পিতামাতাকে, ভ্রাতা—ভগ্নীকে, ভগ্নী—ভাইকে, স্বামী—স্ত্রীকে, স্ত্রী—স্বামীকে, বন্ধু—বন্ধুকে, স্বজন—স্বজনকে আপন বলিয়া জড়াইয়া না ধরিত—তবে সংসার বল, সমাজ বল, সৃষ্টি বল কিছুই থাকিত না। মায়াদেবী—জীবের মনে এই মোহ আনিয়া তাহার বিবেক বুদ্ধি সব ঢাকিয়া—কেবল মায়ায় মুগ্ধ সংসারমাঝে তাহাকে সংসারী করিয়াছেন, যিনি এই জগৎসংসারকে সংসাররূপে সাজাইয়া রাখিয়াছেন, তিনিই মহামায়া। আবার এই মহামায়াই যখন সে জীবকে মোহ হইতে মুক্ত করেন, তখন তাহার মমতাশ বন্ধন, সংসারবন্ধন কাটিয়া মুক্তি হয়, অর্থাৎ জগৎ সংসার হইতে সে অনন্ত আত্মায় মিলিয়া যায়।

মায়াদেবীর জন্ম বা অন্ত বলিয়া বস্তুতঃ কোন কিছু নাই। এই দেবী—ভগবানেরই শক্তি, সুতরাং চিরকালই ইনি ভগবানের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। স্বয়ং ভগবান যেরূপ আদি ও অনন্ত, ইনিও তদনুরূপ। মায়াদেবী কখন জাগিয়া জীবস্থ সৃষ্টিরূপে ভগবান হইতে প্রকা-

শিত হইয়াছেন, কখন আবার ভগবানের মধ্যেই অন্তর্হিত হইয়া সৃষ্টি-লোপ করিতেছেন।

সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয় বলিয়া পুরাকাল হইতে যে শব্দটী শুনিতে পাওয়া যায়। বেদসূক্তে তাহার উপদেশ পাওয়া যায়—ভগবান হইতে বিশ্বরূপ মূর্ত্তিতে যখন মায়াদেবী প্রকাশিত হন, তাহাই সৃষ্টি। আপন শক্তি আশ্রয় করিয়া যতদিন এই দেবী প্রকাশিত থাকেন—ততদিনই স্থিতি, এইরূপ আবার জগৎমূর্ত্তি সংহার করিয়া যখন ইনি ভগবানের মধ্যে অন্ত-হিত হন—তখনই প্রলয়। এই অন্তর্হিত অবস্থায় যোগ-নিদ্রারূপে ইনি যতক্ষণ ভগবানের মধ্যে থাকেন, অর্থাৎ যখন ভগবান এই যোগনিদ্রায় নিদ্রিত থাকেন—তখনই প্রলয়ের অবস্থা। ইহা হইতেই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে—সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তারূপে স্বয়ং ভগবানই মহা-মায়ারূপে বিরাজমান।

বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্যবাসিনীদেবী ব্যতীত "সংহার মায়ামূর্ত্তি"দেবীরও দর্শন পাওয়া যায়। যাত্রীগণ এখানকার এই মন্দির হইতে ঐ সংহার মায়ারূপিণী মহাকালী মূর্ত্তির দর্শন ইচ্ছা করিলে অনূ্ন অর্দ্ধ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিবার পর এক উচ্চতর পর্ব্বতের শিখরদেশে দেড় শত সিঁড়ী আরোহণ করিয়া—সেই করালবদনী লোলজিহ্বা প্রসারিণী মহা-কালীকাদেবীর ভয়ঙ্করী বিগ্রহমূর্ত্তির দর্শন পাইবেন। সে যাহা হউক, আমরা বিন্ধ্যাচলে এই উভয় দেবীর পূজার্চ্চনা শেষ করিয়া স্থানীয় পূজারীদিগের উপদেশ মত ভোগমায়াদেবীর দর্শনআশে মির্জাপুরে যাত্রা করিলাম।

মিরজাপুর

বিন্ধ্যাচলের পরবর্ত্তী ষ্টেশনের নাম মিরজাপুর। পূর্ব্বেই উল্লেখ হইয়াছে, এখানে অনেক শস্যের ক্রয়বিক্রয় হইত, কিন্তু এক্ষণে রেলপথ হওয়াতে সেই বিখ্যাত বাণিজ্য স্থানটী অন্যত্রে স্থানান্তরিত হইয়াছে সহরের দক্ষিণ অংশ পর্ব্বতময় এবং কোন কোন স্থান এমন জঙ্গলে পূর্ণ যে তাহাতে ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্রক জন্তুসমূহ বাস করিয়া থাকে ষ্টেশনের অনতিদূরে একটী প্রস্তরনির্ম্মিত বিখ্যাত কেল্লা আছে। এই কেল্লা ও স্থানীয় চক্-বাজার এখানকার একটী দর্শনীয় বস্তু। মিরজা-পুরের মারবেল কাগজ, পাঁপর, সতরঞ্চ, আসন, কারপেট প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। ভক্তগণ মিরজাপুরে ভোগমায়াদেবীর দর্শনের কাঙ্গাল এবং কেল্লার শোভা দেখিবার জন্যই আসিয়া থাকেন। এখানে এক পিত্তলের স্তম্ভ দ্বারা বেষ্টিত সঙ্কীর্ণ মন্দির মধ্যে ভোগমায়াদেবীর বিগ্রহমূর্ত্তি প্রতি-ষ্ঠিত আছে। কি মিরজাপুর—কি বিন্ধ্যাচল এই উভয় দেবীস্থানে যে সকল পূজারী ব্রাহ্মণ নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের আকারপ্রকার, ভাবভঙ্গি যেমন কদর্য্য, স্বর ও তেমনি কর্কশ। এই সকল পূজারীদিগকে দেখিবামাত্র যেন বোমবেটে (ডাকাত) বলিয়া অনুমান হয়। সে যাহা হউক, এইরূপে এখানকার দেবী, চক-বাজার এবং কেল্লার শোভা দর্শন করিয়া আমরা সকলে এলাহাবাদের অন্তর্গত প্রয়াগতীর্থের সেবা করিবার জন্য যাত্রা করিলাম।
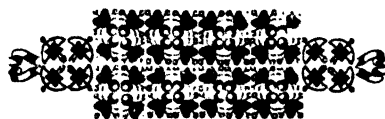
প্রয়াগতীর্থ দর্শন যাত্রা

কাশীসহরের বেনারস কেণ্টনমেণ্ট নামক ষ্টেশন হইতে প্রয়াগ তীর্থে যাইতে হইলে আউদ রোহিলখণ্ড রেলযোগে এলাহাবাদ জংশন ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়।

এলাহাবাদ অতি প্রাচীন নগর। হাওড়া হইতে এলাহাবাদ ৫১৪ মাইল, এবং মোগলসরাই হইতে ৯৪ মাইল দূরে অবস্থিত। কথিত আছে—পুরাকালে ধর্ম্মাত্মা "রাজা অশোক" ২৪০ খৃঃ বারণাবত নামে এখানে যে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং নগরমধ্যে দুর্গ ও গুরু "বুদ্ধদেবের" উদ্দেশে যে ২৮ হস্ত উচ্চ এক প্রস্তরস্তম্ভ উৎসর্গ করেন, অদ্যাপি উহা প্রয়াগতীর্থের গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী নদীর সঙ্গম স্থানের উপরিভাগে বর্ত্তমান কেল্লা মধ্যে "অশোকস্তম্ভ" নামে দণ্ডায়মান থাকিয়া অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যাত্রিগণ! এখানকার এই প্রাচীন স্তম্ভের শোভা দর্শন করিতে অবহেলা করিবেন না।

প্রতি বৎসর মাঘ মাসে এলাহাবাদে একটী প্রসিদ্ধ মেলা হয়—সেই সময় বহু দূরদেশ হইতে অনেক সাধু, সন্ন্যাসী, মোহান্ত ও নানা স্থান হইতে ভক্তগণ উপস্থিত হন, এমন কি—অনেক রাজা ও ধনী ব্যক্তি এখানে আসিয়া এই মেলায় যোগদান করেন।

মহাত্মা অশোকের অবর্ত্তমানে বহুকাল এই নগরটী পতিত অবস্থায় থাকায়, ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইবার পর ১১৯৪ খৃঃ পাঠানেরা সেই প্রাচীন নগরটী দখল করেন। তৎপরে কালের পরিবর্ত্তনশীল কুটীলগতিতে ১৫৭৫ খৃঃ ইহা আবার মোগল সম্রাট আকবরসাহের অধিকারে আসে। সেই ধর্ম্মাত্মার রাজত্বকালে এই হিন্দুনির্ম্মিত কেল্লাটীর সংস্কার হইয়া নূতনকলেবরে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে। কথিত আছে, আকবর বাদসা অতিশয় সদাশয় এবং হিন্দুদিগের পক্ষপাতী ছিলেন. তাঁহার আদানপ্রদান ক্রীড়া-কর্ম্ম যাহা কিছু সমস্তই হিন্দুদিগের সহিত মিলিত, তিনি হিন্দুদিগকে বিশ্বাস করিয়া রাজ্যের উচ্চ বিভাগের উচ্চ পদ সকল প্রদান করিয়া আপন মহত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাদসাহা স্বয়ং মুসলমান হইলেও তিনি পক্ষপাতশূন্য হইয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রজাদিগকে একই প্রকার বিবেচনা করিয়া বিচার করিতেন। এই নিমিত্ত সাধারণে তাঁহাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিতেন এবং বলিতেন যে, আকবর বাদসাহ পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন, কোন বিশেষ কারণে তিনি শাপগ্রস্ত হইয়া মুসলমানরূপে ধরায় অবতীর্ণ হইয়া আপন মহত্ব প্রকাশ করিতেছেন। স্থানান্তরে আকবরের আদি বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইল।

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে এই নগরটী পূর্ব্ব নামের পরিবর্ত্তে আলাহিবাস অর্থাৎ ঈশ্বরের আবাস নামে খ্যাত হইয়াছিল। তৎপরে ১৮০১ খৃঃ অযোধ্যার নবাব—এই নগরটি স্বেচ্ছায় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করেন। ইংরাজদিগের আমলে সেই প্রাচীন আল্লাহিবাস নগরটী এক্ষণে এলাহাবাদ নামে নবকলেবরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাজধানীরূপে বিরাজিত। এলাহাবাদের চতুর্দ্দিকস্থ অঞ্চল অদ্যাপি সেই প্রাচীন "বারণাবত" নামেই প্রসিদ্ধ আছে।

রেলগাড়ী হইতে যমুনার এপার—এলাহাবাদের দৃশ্য অতি মনোহর! সহরের দক্ষিণে যমুনা; উত্তরে, পশ্চিমে ও পূর্ব্বে গঙ্গা বিরাজমান। এলাহাবাদ, আগ্রা, অযোধ্যা প্রভৃতি অর্থাৎ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইহা যুক্তপ্রদেশের রাজধানীরূপে বিরাজিত, সুতরাং ছোট লাটের প্রধান কার্য্যালয় এখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আফিস, আদালত, পুলিস-ষ্টেশন সমস্তই বর্ত্তমান থাকিয়া ইংরাজরাজের মহিমা প্রকাশ করিতেছে।

বর্ত্তমান নগরে বাদসাহী মণ্ডাই, রাণীমণ্ডাই, সাগঞ্জ, কীটগঞ্জ, মুটগঞ্জ প্রভৃতি অনেকগুলি পল্লী আছে। এখানে বাড়ী ঘরের সংখ্যা কম, এই নিমিত্ত ইহার অপর নাম ফকিরাবাদ। এলাহাবাদের পল্লী সকল পরস্পর এত দূরে অবস্থিত যে, এক-একটীকে যেন এক-একটী ভিন্ন গ্রাম বলিয়া বোধ হয়। রাস্তা, ঘাট, পরিষ্কার ও প্রশস্ত, জলবায়ু স্বাস্থ্যকর, বিষয়-কর্ম্ম উপলক্ষে অনেক বাঙ্গালী এখানে আসিয়া বাস করিতেছেন।

নগরের যে অংশে দেশীয় লোকদিগের বাস, সে অংশের পথঘাট অতি সঙ্কীর্ণ—মধ্যে মধ্যে দুই-একটী প্রশস্ত রাজপথও আছে। যে অংশে ইংরাজদের বাস, সে অংশের রাস্তা প্রশস্ত, তাহাতে যথানিয়মে দুই বেলা জল দেওয়া হয় এবং এই রাস্তার উভয় পার্শ্বে উচ্চ উচ্চ বৃক্ষশ্রেণী শোভা পাইতেছে। গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম স্থান হইতে নগরটী প্রায় তিন ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

এলাহাবাদের দক্ষিণ অংশে সহরের প্রধান রাস্তা "চক"। এই স্থানের আশে-পাশে খুব ঘন বসতি। যতগুলি পল্লী এখানে আছে, তন্মধ্যে সাহাগঞ্জ, বাদশাহী-মণ্ডাই ও আতরসুইয়া নামক পল্লীতে বিস্তর বাঙ্গালী বাস করেন। উত্তর ও দক্ষিণদিকের পাড়ার মধ্যে

প্রায় দুই মাইল ব্যবধান—সেই স্থানে সহরের প্রধান স্কুল, কলেজ ও উদ্যান সকল, আবার এই স্থানেই প্রধান বিচারালয়, মিয়র্স কলেজ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য অট্টালিকাগুলির শোভা দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিম দিকে দেশী লোকের বসতি নাই, কেবল আফিস, আদালত, ব্যাঙ্ক, কাছারি, সৈন্যাবাস প্রভৃতিতেই সুসজ্জিত—ঐ দিকেই সাহেবগণ বসবাস করিয়া থাকেন। ১৮৮৭ খৃঃ এলাহাবাদে বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্যবস্থাপক সভা স্থাপিত হয়। এখানকার অট্টালিকার মধ্যে মিয়র কলেজ নামক বাটীটীর শোভা দর্শনযোগ্য। এলাহাবাদ সহরের লোক সংখ্যা অনুমান ১৭৩০০০ জন, সেন্সস দৃষ্টে জানিতে পারা যায়।

গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর সঙ্গমস্থলকে প্রয়াগ বা ত্রিবেণী বলে। এই সঙ্গমস্থলে ব্রাহ্মণ দ্বারা মন্ত্র উচ্চারণ করাইয়া সাধ্যমত দান করিলে অধিক পুণ্যলাভ হয়। এই সঙ্গমস্থানের উপরিভাগে এলাহাবাদ দুর্গ আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত সঙ্গমস্থান হইতে কেল্লা ও তীর্থমন্দির সমূহের একটী সাধারণ দৃশ্য প্রদত্ত হইল।

এলাহাবাদ ষ্টেশনের অনতিদূরে ধর্ম্মশালা স্থাপিত আছে। তীর্থযাত্রীগণ তথায় অবাধে সুখসচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারেন, কিম্বা যাঁহারা স্ত্রীপুত্র লইয়া ধর্ম্মশালায় বিশ্রাম করিতে অসুবিধা বোধ করিবেন, তাঁহারা অনায়াসে একটী ভাল পল্লী দেখিয়া বাসা ভাড়া করিতে পারেন, কিন্তু এখানকার সেতুয়াদিগের মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট হইয়া কখন তাহাদের উপদেশানুসারে ঐ সকল সেতুয়ার, পাণ্ডা প্রদত্ত বাসায় যাইবেন না—যদি কেহ যান, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাকে শেষে মনস্তাপ করিতে হইবে। কারণ এখানকার পাণ্ডারা—সেতুয়াদিগের আনীত যাত্রীদিগের নিকট হইতে পৃথক্ বাসা ভাড়া গ্রহণ করেন না

প্রয়াগ—ত্রিবেণীর উপরস্থ এলাহাবাদ কেল্লার দৃশ্য।

[১৩৮ পৃষ্ঠা ।

সত্য, কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে তাঁহারা ঐ সকল যাত্রীদিগের নিকট হইতে সকল বিষয়েই উচ্চহারে অর্থ আদায় করিয়া লইয়া থাকেন।

আমার বিবেচনায় ধর্ম্মশালায় অবস্থান করাই শ্রেয়ঃ, কেন না—তথায় দ্বারবান, ভৃত্য সমস্তই বিনা বেতনে পাওয়া যায়। ধর্ম্মশালায় সুবন্দোবস্ত আছে। যাত্রীগণ তথায় উপস্থিত হইবামাত্র স্থানীয় ভৃত্যগণ, তাঁহাদিগকে বিশ্রাম ঘর মনোনীত করিতে বলিয়া থাকে—যাহা আদেশ করা যায়,উহারা কিঞ্চিৎ পারিতোষিকের আশায় তাহা কেনা গোলামের ন্যায় তামিল করে, অধিকন্তু এই ধর্ম্মশালায় কলের জল ও পাইখানার সুবন্দোবস্ত আছে; যদ্যপি কোন যাত্রী রসুই করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ইহার নিকটে যে বাজার আছে, তথায় আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্যই অক্লেশে সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিবেন। এইরূপে বিশ্রাম করতঃ যথাসময়ে তীর্থতীরে যাইবার সময় ঐ নির্দ্দিষ্ট ঘরে আপন দ্রব্য-সামগ্রী নিঃসন্দেহচিত্তে কুলুপ দিয়া তাহাদের জিম্মায় উহা রাখিয়া যাইতে পারিবেন। যে পুণ্যাত্মা এই ধর্ম্মশালাটী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহার আদেশানুসারে—বিদেশী যাত্রীদিগের বিশেষ যত্ন লইতে হয়. বলাবাহুল্য, এই সকল কর্ম্ম পালন করিবার নিমিত্তই তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে ইহারা বেতন পাইয়া থাকে।

এলাহাবাদে ঘোড়ার গাড়ী, একা গাড়ী বা আহারীয় কোন দ্রব্য সামগ্রীর অভাব দেখিতে পাওয়া যায় না।

যাত্রীদিগের স্মরণার্থ—পুনর্ব্বার এখানে উল্লেখ করিতেছি যে, পূর্ব্বোক্ত সেতুয়াদিগের প্রাদুর্ভাব এ তীর্থে যত, অপর কোন তীর্থে ততোধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে উপস্থিত হইয়া যাঁহাদের পুরাতন পাণ্ডা নির্দ্দিষ্ট আছেন, তাঁহারা তাঁহাকেই অন্বেষণ করিবেন, যাঁহারা নূতন যাত্রী—তিনি নূতন পাণ্ডা নিযুক্ত করিবেন, কিন্তু স্মরণ

রাখিবেন,এ তীর্থে এই পাণ্ডা মনোনীত করিবার পূর্ব্বে এখানকার তীর্থ কার্য্য এবং সুফলের সময় যেরূপ টাকা দিতে হইবে,তাহার চুক্তি করিয়া লইবেন, নচেৎ স্থানীয় পাণ্ডারা প্রথমে যাত্রীদিগকে মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিয়া শেষে দক্ষিণার সময় প্রমাদ ঘটাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। সম্প্রতি এই সকল নিবারণার্থে এখানে একটী পঞ্চায়েত সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় নূতন যাত্রী সহজে তাঁহাদের সন্ধান করিতে পারেন না।

পশ্চিমে প্রধান প্রধান তীর্থ স্থানে, পুলিস-কর্ম্মচারীগণ একরূপ ফিকির করিয়া যাত্রীদিগের নিকট হইতে জোরপূর্ব্বক দু' পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকে, অর্থাৎ তীর্থ যাত্রীর পোটলা বা তোরঙ্গ দেখিতে পাইলেই তন্মধ্যে কি আছে দেখিতে চায়, আবার কিছু প্রণামী পাইলে তাহাকে ছাড়িয়া দেয়, নচেৎ তাহার বাক্স, পুটলি খুলিয়া দ্রব্যাদি লাট খাট করিয়া দেয়, সুতরাং যাত্রীরা বাধ্য হইয়া তাহাদের খুসি করিয়া থাকেন।

পশ্চিমে যত প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে প্রয়াগ তীর্থে, যাত্রীদিগকে পাণ্ডাদিগের সহিত যত অধিক বাক্যব্যয় করিতে হয়, এরূপ আর কোথাও হয় না—কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায়; যাঁহারা পাণ্ডার নিকট প্রথমে টাকার মীমাংসা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আর বৃথা বাক্যব্যয় করিতে হয় না।

এখানকার চক্ হইতে যে বাঁধা পাকা রাস্তা প্রসারিত হইয়াছে, ঐ রাস্তার সাহায্যে প্রায় আড়াই ক্রোশ অগ্রসর হইলেই—বেণীঘাট নামক তীর্থতীরে উপস্থিত হওয়া যায়। তথায় অসংখ্য পয়ামাণিক, গঙ্গাপুত্র, পুরোহিত, দ্বিজ ও ভিক্ষুকগণ ভক্তদিগকে বেষ্টন করিতে থাকিবে—আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই তীর্থঘাটের তীরে পাণ্ডাগণ নিজ

ঐ স্থান সকল অংশ করিয়া নিজেদের দখলি অংশে বিভিন্ন রঙ্গের বিভিন্ন প্রকার পতাকা উড়াইয়া আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থান দখল করিয়া বসিয়া আছেন। এই সমস্ত চিহ্নগুলি দেখিতে পাইলেই ঐ স্থানটী বেণীঘাট বলিয়া জানিতে পারা যায়।

বেণীঘাটে পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিতে হয়। পিণ্ডদানের পূর্ব্বে মস্তক মুণ্ডন করিবার প্রথা আছে, কিন্তু সধবা স্ত্রীলোকদিগকে কেবলমাত্র অঙ্গুলী প্রমাণ কেশাগ্র কর্ত্তন করিয়া দিলেই হয়। এই মুণ্ডনের ফলে শরীরস্থ যাবতীয় পাপরাশি লয় হইয়া থাকে।

এই নিমিত্ত একটী প্রবাদ শ্রুত হওয়া যায় যে ;—

প্রয়াগে মুড়িয়ে মাথা।
পাপী যা যথা তথা॥

কথিত আছে, প্রয়াগ তীর্থ তীরে মস্তক মুণ্ডন করিলে জন্মজন্মান্তরের পাপরাশি লয় হয়। এখানকার একটী নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়—যে নরসুন্দর ক্ষৌরকার্য্য করাইবে, যে যাত্রী যেরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া ইহা সম্পন্ন করাইবেন, তাঁহাকে সেই কাপড়খানি উক্ত পরামাণিককে দান করিতে হইবে, অর্থাৎ ঐ বস্ত্রখানিই তাহার মজুরীর স্বরূপ লভ্য, অতএব এ তীর্থে ক্ষৌর কার্য্য সম্পাদন করিবার সময়—এই বিষয় বিবেচনা করিয়া প্রস্তুত হইবেন।

প্রয়াগ—একান্ন পীঠের মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ স্থান। বিষ্ণুচক্রে বিচ্ছিন্ন সতীর দক্ষিণ অঙ্গের দশটী অঙ্গুলী পতিত হওয়ায় এখানে দেবী "আলোপী" নামে প্রসিদ্ধ হইয়া পুরী পবিত্র করিতেছেন। এই দেবীমন্দিরের চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণগণ চিরপ্রথানুসারে সুমধুরস্বরে বেদপাঠ করিয়া থাকেন ; মন্দিরাভ্যন্তরে এক বৃহৎ তাম্র সিংহাসনোপরি বিগ্রহ

মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ভক্তদিগকে দর্শনদানে উদ্ধার করিতেছেন আলোপী মন্দিরের সন্নিকটেই—রামঘাট ও শিখাকুণ্ডঘাট দর্শন পাওয়া যায়।

বাসুকীর ঘাট

রামঘাটের কিয়দ্দূরে—বাসুকীর ঘাট আপন শোভা বিস্তার করিয়া অবস্থান করিতেছে। স্থানীয় লোকেরা এই ঘাটটীকে ভোগবতীর ঘাট বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ভোগবতীর বাঁধা ঘাটের উপরিভাগে এক মন্দির মধ্যে রাজা বাসুকীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দিরটি এক বৃহদাকার সর্প মূর্ত্তি দ্বারা বেষ্টিত আছে। নগরের মধ্যে এই ভোগবতীর ঘাটটীই প্রধান বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

শিব-কোট

বাসুকীঘাটের নিকটেই শিব-কোট দর্শন পাইবেন। কথিত আছে, পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্যপালন সময়ে বনবাসকালীন এখানে এই ঘাটের উপর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক পূজা করিয়াছিলেন। এই লিঙ্গ-রাজকে ভক্তিসহকারে পূজার্চ্চনা করিলে শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় কোটি শিবপূজার ফললাভ হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই এই দেব "শিবকোট" নামে প্রসিদ্ধ।

ঝুঁশীপ্রতিষ্ঠিত প্রয়াগতীর্থ

এই ঝুঁশীর নির্দ্দিষ্ট স্থান—গঙ্গাতীরের পাড়গুলি পাহাড়ের মত উচ্চ, আবার এই উচ্চ পাহাড়ের উপর ঠিক গঙ্গাধারে, একটী পরম

কুঁশী প্রতিষ্ঠিত প্রয়াগ ঘাটের অপর তীরের দৃশ্য। [১৮৩ পৃষ্ঠা।

কলিকাতা প্রেস।

রমণীয় শান্তাশ্রম প্রস্তুত আছে—তথায় বহু সাধু, সন্ন্যাসী কৃত্রিম গুহার মধ্যে বাস করেন। শতাধিক সোপান অতিক্রম করিয়া এই আশ্রমে উঠিতে হয়; এতদ্ভিন্ন এখানে যাত্রীদিগের বিশ্রামের জন্য পাকা বাড়ীও নির্মিত আছে। এখানকার এই পবিত্র স্থানটীতে উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে মনে হয়—যেন পূর্ব্বে ইহা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিহারস্থান ছিল, তাই এ স্থানটা এক্ষণে বৈষ্ণব সাধুদিগের সাধনক্ষেত্ররূপে অবস্থান করিতেছে। যাত্রিগণ! প্রয়াগতীর্থে আসিয়া কর্ত্তব্যবোধে এই পুণ্যাশ্রমটী দর্শন করিবেন।

ঝুঁশী (প্রতিষ্ঠিত প্রয়াগ) কম্বলা, শশুর ও ভোগবতীর মধ্যস্থলে প্রজাপতির বেদী বর্ত্তমান। এই স্থানে দেবগণ, ঋষিগণ ও নৃপতিগণ ভূরি ভূরি যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত এই স্থানের নাম প্রয়াগ হইয়াছে। প্রবাদ—শ্রীরামচন্দ্র এই স্থান পার হইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবামাত্র তাঁহার মিত্র গুহক চণ্ডালের সহিত সাক্ষাৎ হয়। পাঠক মহোদয়গণ! দ্বিতীয় ভাগে এই গুহকের পরিচয় পাইবেন। এই স্থানটীর প্রাকৃতিক শোভা নয়নপথে পতিত হইলে, যেন ইহা পরম তীর্থস্থান বলিয়া মনে হয়। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত গঙ্গাতীরবর্ত্তী ঝুঁশীর একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল।

ঝুঁশীর কিয়দ্দূর উত্তর-পশ্চিমে ভরদ্বাজের আশ্রমপথে—ভগবান শ্রীশ্রীবেণীমাধবজীউর মন্দির শোভা পাইতেছে। এই বেণীমাধবজীউর নামানুসারে স্থানীয় তীর্থঘাটটীর নাম বেণীঘাট হইয়াছে।

প্রয়াগতীর্থ—প্রতিপদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলদান করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক শুদ্ধচিত্তে প্রয়াগ দর্শন, স্পর্শন বা সঙ্গমস্থলে স্নান করেন, তিনি তীর্থ মাহাত্ম্যগুণে নিঃসন্দেহে নিষ্পাপচিত্তে সুখে দিনাতিপাত করিতে পারেন। কেন না, যে স্থানে নিয়ত ব্রহ্মাদি দেবগণ, দিক্-

পালগণ, লোকপালগণ, সাধ্যগণ, ব্রহ্মর্ষিগণ, নাগগণ, সুপর্ণগণ, সিদ্ধ-সগরগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরাগণ, ভগবান শ্রীহরি এবং স্বয়ং প্রজাপতি অবস্থিত আছেন, সেই পুণ্যস্থানের মাহাত্ম্য কি লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করা যায়?

প্রয়াগে তিনটী অগ্নিকুণ্ড আছে, তন্মধ্য দিয়া সরিদ্বরা গঙ্গাযোগ প্রবাহিতা হইয়াছে, তাই ইহাকেই ঋষিগণ প্রয়াগ—বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানে বেদ ও যজ্ঞ মূর্ত্তিমান হইয়া ঋষিগণের সহিত ব্রহ্মার উপাসনা করিতেছেন—এই কারণে প্রয়াগ ত্রিলোকপূজ্য পুণ্যতমরূপে শ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত। কথিত আছে, প্রয়াগতীর্থতীরে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন অথবা গাত্রে গঙ্গা মৃত্তিকা লেপন করিলে সকল পাপ মোচন হইয়া থাকে। মনুষ্যমাত্রেরই এই তীর্থের সেবা করা কর্ত্তব্য।

বিশ্রাম-বেদী

এই প্রস্তর নির্ম্মিত পবিত্র বেদীটী প্রস্তুত করিতে নীলকমল মিত্র নামক জনৈক হিন্দু অকাতরে কত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন—তাহা ইহার শিল্পনৈপুণ্য দেখিলেই প্রমাণ পাওয়া যায়। বেদীর সন্নিকটে "থর্ণহিলস্ মেমোরিয়াল" আপন শোভা বিস্তার করিয়া দর্শকবৃন্দকে চমৎকৃত করিতেছে। এই মেমোরিয়ালের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহা কিছু দর্শন করিবেন, উহাতেই আত্মহারা হইবেন সন্দেহ নাই। ইহার অনতিদূরে খসরু-বাগ ও জুম্মা-মস্জিদের সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রয়াগে ভগবান বুদ্ধদেব—তাঁহার পুণ্য পদধূলি দিয়া তীর্থটীকে আরও পবিত্রতর করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য "রাজা অশোক" প্রভুর প্রভাব চিরস্মরণীয় রাখিবার নিমিত্ত এখানে এক চম্পককুঞ্জের স্তূপ
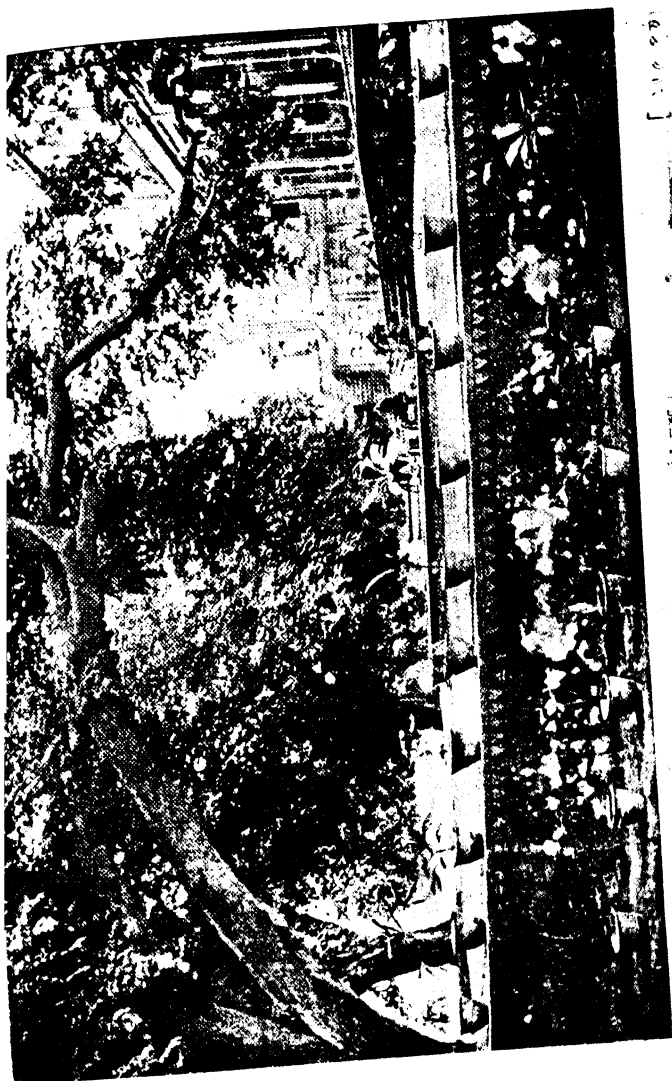
রচনা করেন। যাত্রীগণ অদ্যাপি সেই প্রাচীন বিখ্যাত চম্পককুঞ্জের স্থূপটী—বর্ত্তমান কেল্লার মধ্যে অশোকস্তম্ভের নিকট পাতালপুরীর পার্শ্বে দর্শন পাইবেন।

খশ্রু-বাগ

এই উদ্যানের চতুর্দ্দিক অত্যাচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। অবগত হইলাম, এলাহাবাদ কেল্লা প্রস্তুত হইয়া যে সমস্ত মাল-মসলা অবশিষ্ট থাকে, সম্রাট পুত্র—খসরুর আজ্ঞানুসারে ঐ মসলাগুলি এই উদ্যানটীর নির্ম্মাণ কার্য্যে অনেক সহায়তা করিয়াছে এবং সেই সম্রাট পুত্রেরই নামানুসারে ঐ উদ্যানটী "খশ্রুবাগ" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। জাহাঙ্গীর বাদসার বিদ্রোহী পুত্র—খশ্রুর সমাধি মস্‌জিদ, এই উদ্যান মধ্যে প্রতি-ষ্ঠিত আছে। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত এই প্রসিদ্ধ বাগের এক পার্শ্বের একটী চিত্র প্রদত্ত হইল।

যিনি খশ্রুবাগের ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন—তিনিই দেখিয়াছেন যে, এই খশ্রুর সমাধি মস্‌জিদটী আগ্রার তাজমহলের অনুকরণীয়। ইহার মধ্যস্থলে এক প্রকাণ্ড গম্বুজ, ভিতরের দেওয়ালে নানা জাতীয় পক্ষী ও ফলের চিত্র সংশ্লিষ্ট আছে। ইহার এই সকল শিল্পনৈপুণ্য দর্শন করিলে কোনটী বাদ দিয়া কোনটী দেখিব, এইরূপ মনে হইবে। আমা-দের বাঙ্গালা দেশে সাধারণে যে বাদসার উপমা দিয়া থাকেন, স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি যে, উহা কেবল—তাঁহাদের সৌখীন পছন্দ এবং উদারতারই নিমিত্ত।

দুর্গ

এলাহাবাদ দুর্গ প্রাচীনকালে হিন্দু রাজা অশোকের দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল, মধ্যে ধ্বংস হইয়া প্রাচীরমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তৎপরে মোগল সম্রাট আকবর সাহা পুনরায় ইহা নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করেন, একথা পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং বলাবাহুল্য, যে দুর্গ আমরা এক্ষণে দেখিতে পাই, উহা হিন্দু, মুসলমান ও ইংরাজ—এই তিন জাতির পছন্দমত নির্ম্মিত হইয়াছে। ভারতের কত দেশ, কত রাজ্য ধ্বংস হইল, কিন্তু এলাহাবাদ দুর্গ অদ্যাপি নূতন কলেবরে বর্ত্তমান থাকিয়া অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

দুর্গের মধ্যে চম্পককুঞ্জ, অশোকস্তম্ভ ব্যতীত আর একটী দর্শনীয় স্থান আছে—সেটী পাতালপুরী। পাতালপুরীটী বিখ্যাত অশোকস্তম্ভের নিকটেই দর্শন পাইবেন। ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে প্রত্যেক যাত্রীকে দুইটী পয়সা কর দিতে হয়, এই কর আদায়ের নিমিত্ত লোক নিযুক্ত আছে। অশোক স্তম্ভের নিকট দিয়া যে সিঁড়ী শ্রেণীবদ্ধভাবে নীচে প্রসারিত হইয়াছে, উহার সাহায্যে পাতালপুরীতে এক শিবমন্দির দর্শন পাওয়া যায়। প্রবাদ এইরূপ—সরস্বতী নদী এই নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে যমুনা ও গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছেন। প্রমাণস্বরূপ স্থানীয় পূজারীরা যাত্রীদিগকে এই পাতালপুরীর মন্দির দেওয়ালের এক স্থান ভিজা দেখান।

পাতালপুরীর শিবমন্দিরে—এক স্থানে একটী প্রাচীন অক্ষয়বটের গুঁড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় পূজারীদিগের নিকট উপদেশ পাইলাম, এই বটবৃক্ষটী এখানে ১৫০০ বৎসর এইরূপ অবস্থায়ও জীবন্ত

আছে। পাতালপুরী মধ্যে সদাসর্ব্বদা প্রদীপের আলো জ্বলে। যাত্রী-প্রদত্ত উপহারগুলি গ্রহণ করিবার জন্য একজন ব্রাহ্মণও সর্ব্বদা অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকেন। ইহাতে একখানি কাপড় এরূপ অবস্থায় এই গুঁড়িটী আবৃত আছে যে, সেই বটবৃক্ষটী ভাল করিয়া দেখিতে অবসর পাওয়া যায় না। আমাদের অনুমান হইল, এই বটবৃক্ষের ডালটী এখানে পুঁতিয়া রাখা হইয়াছে, অত্যন্ত শুষ্কাবস্থায় ইহা পুনরায় বদ্‌লাইয়া দেওয়া হয়। বৃক্ষের নীচে এক পার্শ্বে মুকুন্দ নামে এক ব্রহ্ম-চারীর প্রতিমূর্ত্তি ও একটী শিব মূর্ত্তির দর্শন পাওয়া যায়।

ইংরাজ বাহাদুর এই অক্ষয়বটের পূর্ব্ব ইতিহাস অবগত হইয়া, ইহার তত্ত্বাবধানের জন্য পাণ্ডা নিযুক্ত করিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মহত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন, সুতরাং কোন হিন্দু যাত্রী অশোকস্তম্ভ কিম্বা প্রাচীন অক্ষয়বট বৃক্ষটী দর্শন করিতে ইচ্ছা করিলে, তাঁহারা তীর্থ পাণ্ডার সহিত অবাধে কেল্লামধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ পবিত্র স্থানগুলি দর্শন করিয়া থাকেন। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত পাতালপুরীর সেই প্রাচীন অক্ষয়বটের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল।

মুকুন্দ ব্রহ্মচারী ও এই পবিত্র বটবৃক্ষের কিম্বদন্তী এইরূপ ;—

প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমস্থলে মুকুন্দ নামে এক ব্রহ্মচারী বাস করি-তেন, একদা অজ্ঞাতসারে তিনি দুগ্ধের সহিত গো-লোম গলাধিকরণ করিলে অপরাপর সাধুগণের বিচারে যবনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মোগল সম্রাট আকবর সম্বন্ধে প্রবাদ যে—পূর্ব্বে তিনি হিন্দু ছিলেন, কিন্তু শাপগ্রস্ত হওয়ায় মুসলমান হইয়া জন্মগ্রহণ করতঃ পক্ষ-পাতশূন্য ভাবে প্রজাপালনপূর্ব্বক আপন কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

ইতিহাস পাঠে জানা যায়—সম্রাট আকবরের রাজস্ব সচিব রাজা তোডরমল ছিলেন এবং মহারাষ্ট্রীয় বীর মহারাজ মানসিংহ তাঁহার প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত ছিলেন। কথিত আছে, মোগল সম্রাট "আকবর" জয়পুরাধিপতি মহারাজ বিহারীমলের সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিয়া মনের সুখে সংসারী হন এবং রাজা মানসিংহের ভগ্নীর সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিয়া আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হন।

পূর্ব্বে হিন্দুদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, কোন ভক্ত এই অক্ষয় বটবৃক্ষের নিম্নস্থ শিবমূর্ত্তির আরাধনাপূর্ব্বক তিনি যে কোন মানতপূর্ব্বক এই উচ্চ বৃক্ষের উপর হইতে পতিত, অর্থাৎ আত্মহত্যা করিতে পারিলে স্থান মাহাত্ম্য ও এই শিবের কৃপায় দেহান্তরে তাহার সেই বাসনা সিদ্ধি হইয়া থাকে। এই বিশ্বাসে—নিত্য কত লোক এখানে আসিয়া আত্ম-হত্যা করিতেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

মুকুন্দ ব্রহ্মচারী সাধুদিগের বিচারে যবনত্ব প্রাপ্ত হইলে, তিনি এই শিবের উপর দৃঢ় ভক্তি রাখিয়া চিন্তা করিলেন, যদি যবনই হইলাম, তবে যবনশ্রেষ্ঠ না হই কেন? এইরূপ স্থির করিয়া মুকুন্দ যবনশ্রেষ্ঠ হইবার মানসে ভক্তিপূর্ব্বক এই স্থানে শিবারাধনাপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট বটবৃক্ষ হইতে স্বেচ্ছায় পতিত হইয়া আত্মহত্যা করেন—তাহারই ফলে পর-জন্মে তিনি যবনদিগের শ্রেষ্ঠ সম্রাটরূপে ধরায় অবতীর্ণ হইয়া প্রজা-পালন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একদা এই সম্রাট যোগাবলম্বনে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমস্ত অবগত হইলেন, তখন পাছে অপর আর কেহ তাঁহার ন্যায় পরজন্মে সুবিধা করিয়া লয়, এই আশঙ্কায় অক্ষয় বটবৃক্ষ ও শিবমূর্ত্তিটী যত্নের সহিত হিন্দু নির্ম্মিত প্রাচীন দুর্গমধ্যে রাখিয়া তাহার চতুষ্পার্শ্বে গড় নির্ম্মাণ এবং সৈন্যাবাস সংস্থাপন করাইলেন, অধিকন্তু যাহাতে অপর কেহ শিবারাধনাপূর্ব্বক এই বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়া

আত্মহত্যা করিতে না পারেন, তাহারও ব্যবস্থা করিলেন। শেষে আত্মহত্যা যে কতদূর মহাপাপ, উহাও সাধারণকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার উপদেশ মত এবং সুব্যবস্থার গুণে আত্মহত্যা প্রথা এখানে উঠিয়া গেল। তাঁহারই রাজত্বকাল হইতে এই পবিত্র বৃক্ষটী যত্নের সহিত কেল্লার মধ্যে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কালক্রমে ইংরাজরাজ ঐ কেল্লা দখল করিলে পূর্ব্ব প্রথানুসারে সেই অক্ষয় বটবৃক্ষটী স্থানীয় পাণ্ডার জিম্মায় রাখিয়া দিলেন।

এলাহাবাদ যমুনাতীরে যে লৌহ নির্ম্মিত সেতু আছে, তাহার শিল্প কার্য্য দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিতে হইতে হয়, কারণ এই সেতুটী তিনভাগে বিভক্ত। ইহার উপর দিয়া রেলগাড়ী যাতায়াত করিতেছে, মধ্যভাগে মনুষ্যগণ এবং নিম্নভাগে জলযান সকল অবাধে গমনাগমন করিয়া থাকে। ইহা এক নয়নানন্দদায়ক দৃশ্য। এ দৃশ্য দর্শন করিলে শিল্পকারীর প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

এলাহাবাদ হইতে অযোধ্যা যাত্রা করিতে হইলে, যাত্রীদিগকে কানপুর নামক ই-আই-রেল কোম্পানীর বিখ্যাত জং ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। কানপুরের প্রাচীন নাম কাহানপুর, এক্ষণে ইংরাজদিগের আমলে সেই পুরাতন নামের পরিবর্ত্তে ইহা কানপুর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এলাহাবাদ হইতে এই কানপুর ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে যাত্রীদিগের বিশ্রামের নিমিত্ত ট্রেণখানি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে। ষ্টেশনের প্লাটফরমের উপরেই কলের জল, বাহিরে স্নানাগার আবার হিন্দু যাত্রীদিগের জন্য হালুইকর ব্রাহ্মণ দ্বারা আহারীয় খাদ্য-দ্রব্যের অর্থাৎ মিষ্টান্ন বিক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে এবং ইংরাজদিগের জলযোগের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত হোটেলও আছে।

কানপুর যুক্তপ্রদেশের অর্থাৎ অযোধ্যার নিকট বলিয়া—এখানকার শান্তিরক্ষার নিমিত্ত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিস্তর সৈন্য থাকে এবং রেল পথের সঙ্গমস্থান হওয়াতে—এখানে অধিবাসী এবং বাণিজ্য কার্য্যের প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। এই জনপাদপূর্ণ সহরটীর রাস্তা ঘাট অধিকাংশই বেলে পাথরে প্রস্তুত। যদিও এখানে সহর কলিকাতার ন্যায় মিউনিসিপালিটির—রাস্তায় রাস্তায় জল দিবার সুব্যবস্থা আছে, তথাপি গাড়ী ঘোড়ার গতিবিধির সময় যখন তখন এত ধূলা উড়ে, যেন স্থানে স্থানে মেঘের ন্যায় আকার ধারণ করে।

কানপুর ষ্টেশনের সন্নিকট সঙ্গমস্থলে—গঙ্গার উপর দিয়া একটী চমৎকার প্রকাণ্ড প্রশস্ত রেল কোম্পানীর সেতু আছে। যাত্রীপূর্ণ ট্রেণখানি তাহার উপর দিয়া বরাবর অযোধ্যা বা ফৈজাবাদ জংশন পর্য্যন্ত গমনাগমন করিয়া থাকে। এই প্রশস্ত সেতুটীর শিল্পনৈপুণ্য দেখিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত ঐ প্রশস্ত সেতুর একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল।

কানপুরের অধিবাসী সংখ্যা ১৭৯১৭০ হাজার ১৯১১ খৃঃ সেন্সসে নির্ণয় হইয়াছে। এই স্থানটী নানা সাহেবের হত্যাকাণ্ডের নিমিত্ত জনসমাজে আরও বিখ্যাত হইয়াছে। আমরা কানপুরে উপস্থিত হইয়া এই বিখ্যাত সহরের শোভা দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে ষ্টেশনের বাহির্ভাগে এক স্থানে একটী বিশ্রাম স্থান ঠিক করিলাম এবং তথায় কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর সহরের শোভা সন্দর্শন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। পথিমধ্যে একটী চতুরস্র বা (চৌমাথা পথ) নয়নপথে পতিত হইল, তাহার চারিদিকে গৃহশ্রেণী, আবার ইহার মধ্যে পথের ধারে আড়তদারের দ্রব্যজাতপূর্ণ লবণ, হরিদ্রা প্রভৃতি বস্তার মুখ কাটিয়া রাস্তার উপর ফেলিয়া রাখিয়াছেন আর—খরিদ্দারগণ তাহার মধ্যে দলে দলে

কানপুরের প্রসিদ্ধ রেলওয়ে সেতু

[১৭০ পৃষ্ঠা।
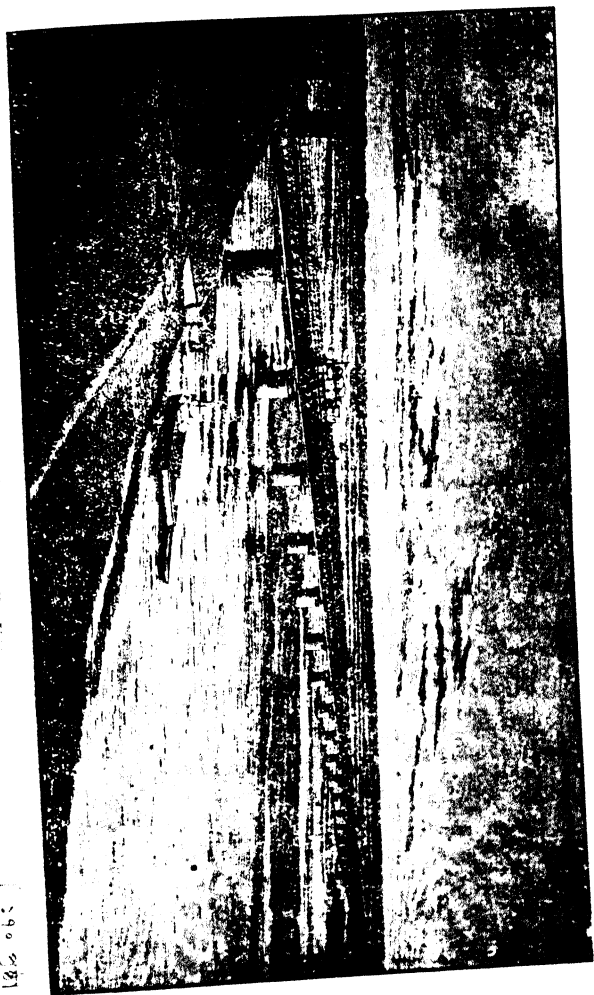
কাতারে কাতারে আসিয়া আপনাপন আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি সংগ্রহ করিতেছেন। ইহার কোন স্থানে গরুর গাড়ী সকল মাল বোঝাই করিয়া অপেক্ষা করিতেছে এই স্থানটী আমাদের কলিকাতাস্থ আফিমের চৌরাস্তাকে যেন উপেক্ষা করিতেছে।

বর্ত্তমানকালে এখানে ইংরাজরাজের কৃপায় কলের জল, আহারীয় দ্রব্য, গ্যাসের আলো, গাড়ী ঘোড়া কোন কিছুরই অভাব দেখিতে পাইলাম না। এই বিস্তৃত জনপদপূর্ণ স্থানে পুলিস-ষ্টেশন, পুলিস-কোর্ট, জজকোর্ট, পোষ্টাফিস, ব্যারাক, ক্যাণ্টনমেণ্ট প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিয়া শান্তিরক্ষা করিয়া থাকে। কানপুর যদিও পশ্চিম দেশ, তথাপি বিষয়-কর্ম্মোপলক্ষে এখানে বিস্তর বাঙ্গালীদিগকে স্ত্রীপুত্র লইয়া বসবাস করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বলাবাহুল্য যে এখানে বিস্তর দেবদেবীর বিগ্রহমূর্ত্তি ও সংস্থাপিত হইয়াছে। এই সমস্ত পবিত্র মূর্ত্তিগুলির মধ্যে বেশীর ভাগ—নদীতীরে ঘাটের উপরিভাগে দর্শন পাওয়া যায়।

কানপুরে লোহালক্কড়ের কল, ময়দার কল, তৈলের কল, উলেন ফ্যাক্টরী, চামড়ার কারখানা প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিয়া ইংরাজ শিল্পীদিগের বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রশংসা করিতেছে। সে যাহা হউক, আমরা এখানে প্রথমে বাসাবাটীর নিকটস্থ স্থানগুলির সৌন্দর্য্য এবং স্থাপত্য-কৌশল দেখিয়া ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তির উপায় অবলম্বন করিলাম। তৎপরে স্থানীয় অধিবাসীদিগের নিকট উপদেশ পাইয়া বিশ্রামের পর ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া সহরের শোভা দেখিতে বহির্গত হইলাম। সর্ব্বপ্রথমেই আমরা হত্যাগৃহ বা হত্যাকূপের নিকট উপস্থিত হইলাম।

নানা সাহেব

নানা সাহেব—এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ সন্তান, কানপুর সহরের তিন ক্রোশ দূরে বিথুর নামক গ্রামে বাস করিতেন। নানা সাহেব বরাবর ইংরাজদিগের সহিত বন্ধুবৎ ব্যবহার করিয়াছিলেন, এমন কি তাঁহাদের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া খানা পর্য্যন্ত যোগাইতেন এবং সময়মত এই সকল বন্ধুদিগকে লইয়া গিয়া নিকটস্থ জঙ্গলে শিকার করিয়া কত আমোদ অনুভব করিতেন। অবশেষে সেই নানা সাহেব, এক সময় সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া দেশীয় সিপাহীদিগকে আয়ত্তপূর্ব্বক তাহাদের নেতাস্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়া ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী হন।

হত্যাকূপ

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, সিপাহী বিদ্রোহের সময় অর্থাৎ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের দেশীয় সিপাহীগণ নানা সাহেব কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া প্রথমে স্থানীয় কালেক্টরীর খাজনাখানা লুণ্ঠন করে, জেলখানার দরজা বলপূর্ব্বক খুলিয়া দিয়া ভিতর হইতে কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দেয় এবং ইংরাজেরা যে সকল বাঙ্গালায় বাস করিতেন, সেই সকল ঘরে আগুন লাগাইয়া দেয়। এই সঙ্কটময় সময় ইংরাজ সেনাপতি সার হিউ-হুইলার ৩৩০ জন ইউরোপীয় স্ত্রীপুরুষদিগের সহিত মাত্র ১৫০ জন গোরা সৈন্যসহ কানপুরের ব্যারাকে অবস্থান করিতেছিলেন আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত সেই সময় উক্ত ব্যারাকের চতুর্দ্দিকে কেবল চারি হস্ত উচ্চ মৃণ্ময় প্রাচীর ব্যতীত আর কিছুই ছিল না—তথাপি তিনি সাহসের উপর নির্ভর করিয়া সপ্তাহকাল সেই অসংখ্য শত্রুদিগের

আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়া ইংরাজদিগের বাহুবলের পরিচয়দানে শেষ নিজ জীবন উৎসর্গ করেন।

এদিকে সার হেন্‌রি-হবলক কানপুরে ইংরাজদিগের দুরাবস্থার বিষয় শ্রবণ করিবামাত্র তিনি সসৈন্যে সেই বিপন্ন ইংরাজদিগকে উদ্ধার করিবার অভিলাষে তথায় যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যে নানা সাহেব মিঃ হবলকের আগমনের বিষয় সন্ধান পাইয়া তিনি তাঁহার অধীনস্থ সিপাহীদিগকে আদেশ করিলেন যে, উপস্থিত এখানে যতগুলি ইংরাজ পুরুষ তাহাদের স্ত্রীপুত্র লইয়া বর্ত্তমান আছে, আমার আদেশ মত তোমরা তাহাদের সকলকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া নিকটস্থ ঐ কূপমধ্যে নিক্ষেপ কর। বলাবাহুল্য, নানা সাহেবের এই নিষ্ঠুর আদেশ—কোন হিন্দুই পালন করিল না দেখিয়া তিনি কোপান্বিতকলেবরে চতুর্দ্দিক হইতে কসাইদিগকে আনয়ন করাইলেন এবং তাহাদের দ্বারা ঐ সকল বিপন্ন ইংরাজদিগের মধ্যে কাহাকেও অস্ত্রাঘাতে অঙ্গহীন, কাহাকে প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া মরণাপন্ন অবস্থায়, আবার কাহারও বা কোল হইতে শিশু সন্তানগুলিকে বলপূর্ব্বক ছিনাইয়া লইয়া দেওয়ালে বড় বড় পেরেক দ্বারা বিদ্ধ করাইয়া, অবশিষ্ট কতকগুলিকে জীবিতাবস্থায় নিকটস্থ কূপে নিক্ষেপ করিয়া সেই সমস্ত কসাইগণ উল্লাসে নৃত্য করিতে করিতে জগৎকে তাহাদিগের কর্ত্তব্যের বিষয় জানাইয়া স্তম্ভিত করিতে লাগিল। যে কূপে বিপন্ন ইংরাজদিগকে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল, উহাই হত্যাকূপ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এদিকে মিঃ হবলক বীরবিক্রমে সদলে এখানে বিপন্নদিগকে উদ্ধার করিতে আসিয়া যাহা দেখিলেন, পাঠক মহোদয়গণ তাহা সহজেই অনুমান করিতেছেন।

এই স্থানটী হত্যাকাণ্ডের চিরস্মরণার্থে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের আদেশে, তাঁহাদের সাহিত্য-সমিতির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হত্যা স্থানের উপর একটী

কারুকার্য্যে শোভিত অট্টালিকা স্থাপিত হইয়াছে। সেই স্মরণার্থ চিহ্নটী এইরূপ—একটী স্বর্গীয় দূত পশ্চিমদিকস্থ ক্রুশের উপরে ভর দিয়া দুঃখিত মনে ডানা দুইখানি নিচুভাবে স্থাপনপূর্ব্বক দাঁড়াইয়া আছেন, আবার ঐ অট্টালিকার এক স্থানে একটী স্তম্ভে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে; "বিথুরনিবাসী রাজবিদ্রোহী নানা ধন্দপন্থের আদেশে তাহার অধীনস্থ লোকেরা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ১৫ই জুলাই তারিখে যে সকল ইংরাজ বীর-পুরুষ ও তাঁহাদের স্ত্রীপুত্রদিগকে হত্যা করিয়া এই কূপে নিক্ষেপ করে, তাঁহাদিগের স্মরণার্থ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই চিহ্নটী প্রতিষ্ঠিত হইল।"

আমরা ষ্টেশন হইতে সদলে এই হত্যাকূপের নিকট উপস্থিত হইলে স্থানীয় প্রহরীগণ আমাদের হস্তস্থিত ব্যাগ, ছড়ি প্রভৃতি দ্বারদেশে রাখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে উপদেশ দিল। এই সকল দ্রব্য-সামগ্রী এখানে রক্ষা করিবার সুবন্দোবস্ত আছে দেখিয়া আমরাও বিনা আপত্তিতে তাহাদের কথামত সকলে শূন্যহস্তে গৃহমধ্যে যাহা দেখিলাম, উহাতেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম; কারণ সিপাহীবিদ্রোহ কত-কাল পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে, বিদ্রোহী কসাইগণ নানা সাহেব কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া কতকাল পূর্ব্বে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড করিয়াছিল, সেই পৈশাচিক ব্যাপারে এই গৃহ মধ্যে অতি কম এক ইঞ্চ পরিমাণ রক্ত জমিয়াছিল; কিন্তু ঐ রক্তস্রোত অদ্যাপি এখানে এরূপ যত্নসহকারে রক্ষিত হইয়াছে যে, দেখিবামাত্র যেন এই দণ্ডে ইহা সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। সেই দুরাচারদিগের অত্যাচারের বিষয় অদ্যাপি দর্শনের পরিবর্ত্তে স্মরণ করিলেও সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইতে থাকে। কেন না, উপরোক্ত হত্যাকাণ্ড ব্যতীত বিদ্রোহীরা নানা সাহেবের আদেশে যত ইংরাজ পুরুষদিগকে "তোমরা নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন কর",

এইরূপ আশ্বাস দিয়া নৌকায় উঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং যখন ঐ সকল বিপদ্‌গ্রস্ত লোক গঙ্গার মধ্যস্থলে উপস্থিত হইল, তখন গোলার দ্বারা নৌকাসহ আরোহীদিগকে জলমগ্নপূর্ব্বক করতালি দিতে দিতে মনের আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। কি ভীষণ অত্যাচার! কি পৈশাচিক ব্যাপার!! বলাবাহুল্য, হিন্দুস্থানীদিগের দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হইয়াছিল বলিয়া অন্ধকূপ হত্যাকূপ নামক গৃহে তাহাদের প্রবেশাধিকার নাই। এইরূপে হত্যাকূপের অদ্ভুত দৃশ্য অবলোকনপূর্ব্বক এখান হইতে নদীতীরে সতী চৌড়ার ঘাট নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম।

সতী-চৌড়া ঘাট

পূর্ব্বে এই ঘাটে স্থানীয় সাধ্বীসতী রমণীরা সহমৃতা হইতেন, অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যু হইলে রমণীরা পতিবিরহানলে দগ্ধ না হইয়া সেই মৃত-পতির প্রজ্বলিত চিতারোহণে স্বেচ্ছায় প্রাণ পরিত্যাগ করিতেন। এই নিমিত্ত এই ঘাটটী সতী-চৌড়া নামে খ্যাত।

পূর্ব্বকালে এই প্রথাই প্রচলিত ছিল, কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের রাজত্বকালে এবং লর্ড বেণ্টিঙ্ক মহোদয়ের শাসনকালে—একদা তিনি একটী রমণীকে তাহার আত্মীয়স্বজন বলপূর্ব্বক, রমণীর অনিচ্ছায় দগ্ধ করিবার উপক্রম করিতেছেন দর্শন করিয়া—সাহেবের সরল হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের প্ররোচনায় এক আইন প্রস্তুতপূর্ব্বক এ প্রথা উঠাইয়া রমণীকুলকে অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া দিলেন। ইতিপূর্ব্বে এই ঘাটে যে কত রমণী অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সতী-চৌড়া নামক ঘাট হইতে আমরা স্থানীয় চকবাজারের শোভা দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

চকবাজার

কানপুরের চকবাজারে—নানা ফ্যাসানের বিবিধ প্রকার পণ্য দ্রব্য খরিদ করিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ এখানকার চামের দ্রব্যাদি অতি প্রসিদ্ধ এবং মূল্যও সুবিধা দরে পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, এইরূপে কানপুর সহরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির শোভা সন্দর্শন করিয়া এখান হইতে ব্রাঞ্চ লাইনের সাহায্যে আমরা অযোধ্যা নগরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।
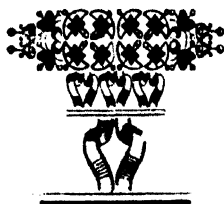
অযোধ্যা

এলাহাবাদ ষ্টেশন হইতে আউদ রোহিলখণ্ড রেলযোগে অযোধ্যা ষ্টেশন বা ফৈজাবাদ হইয়া অযোধ্যা ঘাট নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়, অর্থাৎ যাত্রীগণ অযোধ্যা নামক ষ্টেশন হইতে বা অযোধ্যা ঘাট নামক ষ্টেশন—এই দুই ষ্টেশন হইতেই তীর্থস্থান সরযূ নদীতীরে যাইতে পারেন। কথিত আছে, এই অযোধ্যা ঘাট নামক স্থানে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র মানবলীলা সম্বরণ করেন, এই কারণে এখানে স্নান ও পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিতে হয়।

অযোধ্যা ষ্টেশন হইতে নামিলে—তথায় এক প্রকার চারি চাকাবিশিষ্ট মানুষটানা গাড়ী (পুষ্পক) কিম্বা ঘোড়ার গাড়ীর সাহায্যে ষ্টেশন হইতে প্রায় ছয় মাইল অগ্রসর হইয়া তৎপরে নগরের মধ্যে খানিক হাঁটাপথে গমন করিলেই নির্দ্দিষ্ট তীর্থঘাটে পৌঁছিতে পারা যায়. কিন্তু যাঁহারা অযোধ্যা ঘাট নামক ষ্টেশনে যাইবেন, তাঁহাদিগকে ফৈজাবাদে ট্রেণ বদলপূর্ব্বক ব্রাঞ্চ লাইনে তীর্থতীরে যাইতে হইবে। অযোধ্যা ঘাট নামক ষ্টেশন হইতে তীর্থতীর. অন্যূন অর্দ্ধ মাইল ব্যবধানমাত্র—কিন্তু এই দুই স্থানে দুইবার যাত্রীগণের মাল বোঝাই ও খালাসের মুটে খরচ এবং ট্রেণের অপেক্ষায় যতটুকু সময় নষ্ট করিতে হয়, সেই সময়ের

মধ্যে অযোধ্যা ষ্টেশন হইতে অক্লেশে তীর্থস্থানে উপস্থিত হইতে পারা যায়, বেশীর ভাগ অযোধ্যা ষ্টেশন হইতে যাইলে নগরের অনেক পবিত্র স্থ ন দেখিয়া অর্থ ব্যয়ের সার্থক হয়।

অযোধ্যা ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ উত্তরে মহামুনি বশিষ্ঠদেবের আশ্রম ও তাঁহারই একটী যজ্ঞকুণ্ডের দর্শন পাওয়া যায়।

অযোধ্যা—পূরাকালে কোশলরাজ্যের রাজধানী ছিল। এক সময় এই কোশলরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। সূর্য্য-বংশীয় অনেক হিন্দু রাজা কোশলে রাজত্ব করিবার পর অবশেষে ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা এই দেশটী অধিকার করেন। সাদৎআলি নামক একজন পারস্য দেশীয় বণিক অযোধ্যা নগরে প্রথমে সুবাদারের পদে নিযুক্ত হন, তৎপরে ইংরাজগণ তাহারই সাহায্যে অযোধ্যা অধিকার করিবার পর সাদৎআলির বংশধরেরা এথানে বহুকাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন; কিন্তু ১৮৫৬ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া অযোধ্যা দেশটী ভারত সাম্রাজ্যভুক্ত করিবার আদেশ প্রদান করেন। তদবধি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই অযোধ্যা প্রদেশটী এক-জন প্রধান কমিশনরের অধীনে থাকে, তাহার পর ইহা উত্তর-পশ্চিমা-ঞ্চলের সহিত ভুক্ত হইয়াছে।

এই অযোধ্যা এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ ভূমি সমতল। গঙ্গা ও যমুনা এই দুইটী এথানকার প্রধান নদী, আবার এই দুই প্রধান নদী হইতে নানা শাখা-নদী এই প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিতা হইয়াছে। ইতিহাস পাঠে জানিতে পারা যায়, অযোধ্যা ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ৫৩০০০ বর্গ ক্রোশ ভূমি এবং অন্যূন ৫ কোটি লোকের বাস আছে। ইংরাজ অধিকৃত প্রদেশের মধ্যে লোকসংখ্যা ধরিলে এই দুইটী প্রদেশ দ্বিতীয়, এবং আকারে পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়াছে।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে অযোধ্যা প্রদেশ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সামিল হইয়াছে।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল প্রদেশটী অযোধ্যা নগরটীকে প্রায় অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় বেষ্টন করিয়া আছে। ইহার পরিধি ৪১০০০ বর্গ ক্রোশ—প্রকৃত পক্ষে বঙ্গদেশ অপেক্ষা অনেক বড়। ইহারও লোক সংখ্যা অন্যূন তিন কোটি ষাট লক্ষ। এ দেশবাসীর প্রধান খাদ্য রুটী, শীত ঋতুতে এখানে এত ঠাণ্ডা অনুভব হয়, তাহা বর্ণনাতীত। নিবাসীদিগের আট-জনের মধ্যে একজন মুসলমান, অবশিষ্ট সকলেই হিন্দু।

এখানকার স্বাস্থ্য এবং জলবায়ু অতি উত্তম, কোন ব্যক্তিকে কৃশ দেখিতে পাওয়া যায় না। ঘৃত ও দুগ্ধ এখানে প্রচুর পরিমাণে এবং সস্তা দরে পাওয়া যায়।

কেবল অযোধ্যা নগরের ভূমির পরিমাণ ১২০০০ বর্গ ক্রোশ। ইদেশটী সমতলভূমিতে পরিবেষ্টিত হইয়া ক্রমে নিম্ন হইয়া গঙ্গা ও সমুদ্রের দিকে প্রসারিত হইয়াছে। ইহার দক্ষিণ-সীমানা গঙ্গা, দেশের মধ্য দিয়া গোমতী, ঘর্ঘরা ও সরযূ-নদী প্রবাহিতা হইয়াছে, কিন্তু যাত্রীগণ এখানকার তীর্থতীরে কেবল সরযূ নদীরই দর্শন পাইয়া থাকেন। এই স্থানের ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা, সুতরাং পতিত জমি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

অযোধ্যা—হিন্দুদিগের একটী প্রাচীন তীর্থ স্থান, এমন কি অযোধ্যা ত্রিলোক বিখ্যাত এবং দেবতাদিগের নমস্য। কথিত আছে, অযোধ্যা নগরে অন্যূন দশ সহস্র কোটি তীর্থ বিরাজিত।

এখানে রামকোট নামক স্থান, শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি ও রাজধানী। রামকোটে রাজা দশরথের বাটীতে যে একটী বেদী বর্ত্তমান আছে, প্রবাদ এইরূপ যে—ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ঐ বেদীর উপর জন্ম

গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাত্রীরা এখানে উপস্থিত হইয়া পুণ্যসঞ্চয়ের নিমিত্ত সেই নির্দ্দিষ্ট বেদীটী প্রদক্ষিণ করেন। বেদীর সন্নিকটে যে জোড়া জাঁতা ও একটী উনান দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে বিবাহ করিয়া স্বদেশে উপস্থিত হইলে চির প্রথানুসারে ঐ উনানে রসুই হইয়া বৌভাতের যজ্ঞ হইয়াছিল, আর ঐ জাঁতায় চাউল ভাঙ্গা হইয়াছিল।

রামকোটে উপস্থিত হইয়া শ্রীরামজননী ভাগ্যবতী কৌশল্যাদেবীর অর্চ্চনা করিয়া অভিলষিত বর প্রার্থনাপূর্ব্বক ধর্ম্মাত্মা দশরথের পূজা করিতে হয়। তৎপরে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন এই চারি অবতারের সূতিকা গৃহ, স্বর্গদ্বার, অশ্বমেধ-যজ্ঞস্থান, মণিপর্ব্বত, সুগ্রীব পর্ব্বত, কুবের পর্ব্বত, হনুমানকোট প্রভৃতি পবিত্র স্থান সকল দর্শন করিয়া এখান হইতে তীর্থঘাট সরযূতীরে আসিয়া রাম লক্ষ্মণাদির ঘাট সকল দর্শন এবং যথানিয়মে সঙ্কল্প করিতে হয়। রামকোট যাইবার সময় পথিমধ্যে তেঁতুল বৃক্ষশ্রেণী যেন শ্রীরামশোকে নতশিরে দণ্ডায়মান আছে, আর শ্রীরাম সৈন্য কপিবানরগণ তথায় শ্রীরামচন্দ্রের অন্বেষণ করিতে করিতে ক্ষুধায় কাতর হইয়া শ্রীরাম ভক্ত যাত্রীদিগের নিকট হইতে দলে দলে আসিয়া খাবার ভিক্ষা করিতে থাকিবে—এই সকল প্রাকৃতিক শোভা এবং বানরবৃন্দের কেলী-কৌতুক দেখিলে কত আনন্দ অনুভব করিবেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

অযোধ্যা নগরে এই কপি সৈন্যকুলের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক থাকায় নগরবাসী ও নূতন যাত্রীদিগকে সতত সতর্ক থাকিতে হয়। কারণ কপিসৈন্যেরা তাহাদের রাজা শ্রীরামচন্দ্রের অদর্শনে অরাজকতা মনে ভাবিয়া যাত্রীদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুটপাঠ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। যদিও এখানকার বাড়ী ঘরগুলি বানরগণের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার

[illegible] সুবন্দোবস্তের সহিত নির্ম্মিত আছে, তথাপি তাহারা সুবিধা [illegible]ইলেই উৎপীড়ন করিয়া থাকে।

অযোধ্যায়—শ্রীরামচন্দ্র অপেক্ষা তাঁহার ভক্ত হনুমানজীর সমাদর অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান লীলাবশে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া সকল স্থানেই তাঁহার ভক্তের মান বৃদ্ধি করিয়া আপন মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। প্রমাণস্বরূপ দেখুন, এখানে হনুমানজী যে একটী সুসজ্জিত মন্দির মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তাহার অভ্যন্তরটী বহু মূল্যবান [illegible] এবং জরির কারুকার্য্যশোভিত একটী ছত্র শোভা পাইতেছে। এ তীর্থের নিয়ম এই যে, যাত্রীগণকে এ নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই—প্রথমে এই নগররক্ষক "বীর হনুমানের" স্তব ও পূজা করিতে হয়। আবার দেখুন, একদা শ্রীহরি তাঁহার ভক্ত নারদ ঋষিকে উপদেশছলে বলিয়াছিলেন যে, "আমাপেক্ষা আমার নাম শ্রেষ্ঠ, তাহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমার ভক্ত যে জন।"

এ তীর্থে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বপ্রথমেই সরযূতীরে যথানিয়মে সঙ্কল্প, স্নান, তর্পণ ও দানকার্য্য সম্পন্নপূর্ব্বক ঋষিদিগের এবং দেবতাদিগের উদ্দেশে পূজার্চ্চনা, তৎপরে পিতৃপুরুষদিগের মুক্তি কামনাসহকারে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। কথিত আছে, তীর্থতীরে শ্রাদ্ধান্তে মন্ত্রপূত করিয়া একটী গোদান করিতে পারিলে বহু পুণ্যসঞ্চয় হয়। অযোধ্যার মাহাত্ম্য অশেষ, কেন না—অযোধ্যা-মাহাত্ম্য নামক গ্রন্থে উপদেশ পাওয়া যায়, "যদি কোন ভক্ত দেশান্তরে থাকিয়াও মনে মনে ভক্তি-সহকারে পুণ্যস্থান অযোধ্যা তীর্থে যাইব—এইরূপ মনে করেন, তাহা হইলে সেই ভক্ত সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি পাইয়া শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় অন্তিমে স্বর্গে পূজিত হইয়া থাকেন। স্ত্রী বা পুরুষ যিনিই হউক না কেন, আজন্ম যিনি যত পাপ করিয়াছেন, একটীবারমাত্র সরযূ নদীতে

ভক্তিসহকারে স্নান করিলে তাহার সকল পাপ নষ্ট হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি নিয়ত শুচি অবস্থায় এই তীর্থতীরে দ্বাদশ রাত্রি বাস করেন, তিনি যাবতীয় যজ্ঞফল লাভ করিতে সক্ষম হন।" পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় এ স্থানের মহিমা বর্ণনাতীত!

শ্রীরামনবমী তিথিতে যে ব্যক্তি শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশে এথানে কোন ব্রত পালন করেন, তিনি কোটি সূর্য্যগ্রহণকালীন গঙ্গাস্নানের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেই নির্দ্দিষ্ট তিথিতে যে ব্যক্তি শুদ্ধচিত্তে উপবাস, রাত্রি জাগরণ ও পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ করেন, তাহার নিঃসন্দেহে ব্রহ্ম লোকে গতি হয়। এইরূপ আবার রামনবমী পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্ত হইলে সর্ব্বকামদায়িনী এবং মধ্যাহ্নব্যাপিনী হইলে মহা পুণ্যদায়িনী হয়।

যে ব্যক্তি বহু দূরদেশ হইতে এ তীর্থে উপস্থিত হইয়া কালক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হন—স্থান মাহাত্ম্যগুণে তাঁহাকে আর পুনর্জন্মের জ্বালা ভোগ করিতে হয় না। যথায় স্বয়ং ভগবান, লীলাবশে নরাকারে অবতীর্ণ হইয়া রামরূপে, সমাজ শাসন এবং প্রজাদিগকে সুখী করিবার নিমিত্ত, স্বীয় লক্ষ্মীস্বরূপা গর্ভবতী ভার্য্যা—সীতাদেবীকে নিষ্কলঙ্ক জানিয়াও, কেবল তাহাদের মনোরঞ্জনের জন্য বনবাস দিয়া আপন মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, যিনি সত্যপালন করিবার কারণ রাজ্য লাভের পরিবর্ত্তে স্বেচ্ছায় বনবাসকেই অঙ্গের ভূষণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন, যে রামচন্দ্র ধর্ম্মরক্ষা করিবার জন্য লক্ষ্মণসম প্রাণের ভাইকে বর্জ্জন করিতে অন্যমন করেন নাই, সেই পুণ্য স্থান—অযোধ্যা নগরে অল্পকালের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া কেহ যেন কখন পাপকর্ম্মে মতি না রাখেন।

কথিত আছে, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে—তিনি এখানে সাড়ে তিন শত দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং জঙ্গল কাটাইয়

অনেক প্রাচীন দেবালয়ও উদ্ধার করিয়া আপন কীর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন—এইরূপ স্থানীয় পূজারীদিগের নিকট উপদেশ পাওয়া যায়। কিন্তু হায়! কালের কুটিলগতিতে এক্ষণে সে সমস্তই লুপ্তপ্রায়, অর্থাৎ সে সমস্ত প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানকালে মাত্র ত্রিশটী দেবালয় বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিতেছে

অযোধ্যায় রাজা দশরথ প্রতিষ্ঠিত একটী শিব ও একটী কালীমূর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া সেই মহাত্মার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন যতগুলি দেবালয় অযোধ্যায় আছে, সে সমস্তগুলিই শ্রীরাম লীলারূপে দর্শন পাওয়া যায়।

পুণ্যধাম অযোধ্যার সরযূতীরে—রামঘাট ও স্বর্গঘাট নামে যে দুইটী বাঁধা ঘাট আছে, ভক্তগণ তীর্থপদ্ধতি অনুসারে এই দুই ঘাটে বসিয়াই আপনাপন ব্রতকার্য্য পালন করিয়া থাকেন। এই সরযূতীরেই শ্রীলক্ষ্মণদেবের স্বর্ণময় প্রতিমূর্ত্তি ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দুর্গটির সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। অযোধ্যার রামঘাটের সদৃশ সুন্দর ঘাট পৃথিবী মধ্যে আর দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ।

প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে যখন এখানে রামায়ত সাধুগণ এই দুই ঘাটে বসিয়া সুমধুরস্বরে রামনাম উচ্চারণপূর্ব্বক স্তোত্র পাঠ করেন, সেই স্তোত্র পাঠ শ্রবণ করিলে মনে এক স্বর্গীয়ভাবের উদয় হয়। এইরূপ আবার স্থানীয় নগরবাসীরা প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় গৃহে ধূপদীপ জ্বালিবার সময় যখন "রাজা রামচন্দ্র কী জয়" শব্দ শঙ্খধ্বনি করিতে থাকেন, সেই সময়—প্রতি ঘরে ঘরে ঐ একই রূপ শব্দ প্রতিধ্বনিত হইলে, হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইতে থাকে। এইরূপ জয়ধ্বনি করিবার তাৎপর্য্য এই যে, "ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তোমারই কৃপায় অদ্যকার দিন আমাদের সুখস্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইল।" সন্ধ্যাকালে যিনি এখান-

কার এই মধুর জয়ধ্বনি শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিই মোহিত হইবেন সন্দেহ নাই। অযোধ্যাবাসীদিগের মধ্যে রামায়ত বৈষ্ণবের সংখ্যাই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিয়া নগররক্ষক হনুমানজীর দর্শন, তৎপরে শ্রীরাম রঘুবীর সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক মনোমত প্রার্থনা ভিক্ষা করিয়া ভগবানের পূজার্চ্চনাসৎকারে নয়ন ও জীবন সার্থক করিবেন। তাহার পরে ঐ মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে এক প্রশস্ত কক্ষে—শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন এবং অযোধ্যালক্ষ্মী সীতাদেবীর প্রতিমূর্ত্তি আরও সুগ্রীব, বিভীষণাদি লোকপালগণের যে মূর্ত্তি স্থাপিত আছে, তথায় যথানিয়মে তাঁহাদের পূজা করিতে হয়। ইহার অনতিদূরে বশিষ্ঠাশ্রমে—ভগবতীর শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া মণাব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয়। বশিষ্ঠাশ্রমে একটী কূপ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ এইরূপ—ঐ কূপের নিকট শ্রীরামচন্দ্র বাল্যকালে ভ্রাতৃগণসহ ক্রীড়া করিতেন। এই নিমিত্ত গ্রামবাসীরা ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানটীকে এক তীর্থস্থান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

অযোধ্যায় আসিয়া পূর্ব্বোক্ত নির্দ্দিষ্ট স্থান ব্যতীত জনকরাজর্ষির কূপে—যথানিয়মে স্নান, তর্পণ করিবার প্রথা আছে। কথিত আছে, ঐ পবিত্র যজ্ঞকুণ্ডের বারি সামান্যমাত্র পান করিতে পারিলে বহু পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। ভক্তগণ পুনর্জ্জন্ম নিবৃত্তি কামনায় চিরপ্রথানুসারে এ তীর্থে এই সমস্ত নিয়মগুলি আগ্রহের সহিত পালন করিয়া থাকেন।

অযোধ্যা নগর হইতে নন্দীগ্রাম মাত্র তিন মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থানে রামানুজ শ্রীভরত—সিংহাসনোপরি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পিতৃসত্য-পালন সময় তাঁহার অনোপস্থিতকালে মনের শান্তির নিমিত্ত শ্রীরাম-চন্দ্রের পাদুকা প্রতিষ্ঠিত করিয়া যে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন এবং

জগৎকে ভ্রাতৃস্নেহের পরাকাষ্ঠা শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই পবিত্র চিত্রমূর্ত্তি-গুলির ভাব—দর্শন করিলে জ্ঞানোদয় হয়।

প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে অযোধ্যা নগরে শুক্লতৃতীয়া তিথিতে—মণিপর্ব্বতোপরি শ্রীরামসীতার বিগ্রহমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়া এক মেলা হইয়া থাকে। এই নির্দ্দিষ্ট উৎসবদিনের অপরাহ্ণকালে নগরের যাবতীয় দেবালয় হইতে বিগ্রহমূর্ত্তিগুলি নানা অলঙ্কারে সুসজ্জিত করাইয়া স্থানীয় পূজারীগণ, আপনাপন প্রতিষ্ঠাকারার ধনবলের পরিচয় দিবার অভিপ্রায়ে এই স্থানে একত্রিত হন। মেলার এই সমারোহ ব্যাপার এক অপূর্ব্ব দৃশ্য।

যে প্রশস্ত মণিপর্ব্বতে কখন জনপ্রাণীর সমাগম হয় না, সেই জনশূন্য নির্জ্জন পাহাড়টীতে দেবতা এবং যাত্রীদিগের সমাগমে তখন তিলমাত্র স্থান থাকে না। বলাবাহুল্য, এই সমারোহকালে হস্তী, উঠ ঘোটক এবং পথের উভয় পার্শ্বের উচ্চ উচ্চ বৃক্ষগুলিকে নানা সাজে সজ্জিত করাইয়া গ্রাম্যপথটীকে এক অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত করেন, এতদ্ভিন্ন নানাপ্রকার বাদ্যগীত এবং আমোদজনক কৌতুকও প্রদর্শন হইতে থাকে।

মেলার এই শোভা যাত্রা—দর্শন করিবার নিমিত্ত দলে দলে কাতারে কাতারে বহু দূরদেশ হইতে ভক্তগণের একত্র সম্মিলন হইলে, মণিপর্ব্বত ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ ক্রোশব্যাপী স্থানে তিলার্দ্ধ স্থান থাকে না। ভক্তগণ এত দূরদেশ হইতে এই মেলায় যোগদান করিয়া মণিপর্ব্বতের শিখরদেশে এক মন্দির মধ্যে শ্রীশ্রীরামসীতার নবজলধর পীতাম্বর যুগল মূর্ত্তি দর্শনপূর্ব্বক সকল পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের সার্থকবোধ করিয়া থাকেন। সৌভাগ্যক্রমে আমরা এই নির্দ্দিষ্ট সময় তথায় উপস্থিত হইয়াছিলাম, সুতরাং আমাদের অদৃষ্টে এই অপূর্ব্ব মেলাটী দর্শন করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল।

অযোধ্যায় তীর্থ সকল সেবা সমাপনান্তে দক্ষিণাসহ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয় এবং এই স্থান ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে অপরাপর তীর্থ স্থানের ন্যায় স্বীয় পাণ্ডার নিকট সুফল গ্রহণ করিতে হয়।

যে সকল ভক্ত এখান হইতে নৈমিষারণ্য তীর্থ দর্শন করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাদিগকে অযোধ্যা হইতে গো-শকট বা মানুষটানা গাড়ী অথবা পদব্রজে সাত ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে হইবে। নৈমিষারণ্য —ঋষিশ্রেষ্ঠ দধিচীমুনির প্রাচীন আশ্রমটী অবস্থানপূর্ব্বক অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এতদ্ভিন্ন ইহা—একান্ন পীঠস্থানের মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ স্থান। এ তীর্থে জগজ্জননী "ললিতাদেবী" নামে খ্যাত হইয়া ভক্তগণকে দর্শনদানে উদ্ধার করিতেছেন।

কথিত আছে, বৃত্রাসুর সংহার সময় সুরপতি "ইন্দ্র" যাবতীয় দেবগণসহ এই পুণ্যাত্মার নিকট বজ্রনির্ম্মাণ কারণ তাঁহার অস্থি প্রার্থনা করিলে—মুনিবর তাঁহাকে বলিলেন হে সুরপতি! তোমার উপকারার্থে আমি নিজ অস্থি নিঃসন্দেহে প্রদান করিব প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কিন্তু কিছুদিনের জন্য আমায় অবসর প্রদান করিতে হইবে, কারণ অদ্যাপি আমার সকল তীর্থ স্থান পর্য্যটন শেষ হয় নাই। এতৎশ্রবণে দেবরাজ সেই বৃত্রাসুরের ভীষণ সংগ্রামের লাঞ্ছনা ভোগ—স্মরণ করিয়া বিনীতভাবে ঋষিকে বলিলেন, "ঋষিবর! যদি তীর্থ পর্য্যটনই আপনার একমাত্র আপত্তি হয়, তাহা হইলে বৃথা সময় নষ্ট করিবার আবশ্যক নাই, আমি পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ এই দণ্ডে নৈমিষারণ্যে আনয়ন করিতেছি।" এইরূপ আশ্বাস দিয়াই—তিনি তৎক্ষণাৎ তীর্থ সকলকে সমাদরে নৈমিষারণ্যে হাজির করিলেন। দেবরাজের কৃপায় এইরূপে এখানে পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন এখানে যে একটী কুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বে উহা ব্রহ্মকুণ্ড নামে জনসমাজে পরিচিত

ছিল। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধজনিত ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইলে, তাঁহার হস্ত-তালুতে একটী কাল দাগ হয়। তিনি বহু তীর্থ পর্য্যটন এবং বিধিমতে চেষ্টা করিয়াও উহা উঠাইতে সক্ষম হন নাই ; অবশেষে একদা নৈমিষারণ্যে এই ব্রহ্মকুণ্ডে হস্তপ্রক্ষালন করিবামাত্র সেই দাগ উঠিয়া যায়। তদ্দর্শনে তিনি এই কুণ্ডের নাম "পাপহরণ" রাখিয়া ইহাকে বরপ্রদান করেন যে, "অতঃপর যে কোন পাপী ইহাতে স্নান বা ভক্তিসহকারে জলস্পর্শ করিবে—আমার বরপ্রভাবে তাহার সর্ব্ব-পাপ মোচন হইবে।" সুতরাং যাত্রীগণ সর্ব্বপাপ হইতে উদ্ধার কামনা করিয়া এই কুণ্ডের পবিত্র বারি স্পর্শ বা স্নান করিয়া থাকেন। উপ-রোক্ত দ্রষ্টব্য স্থান ব্যতীত এখানে মহাবীর গরুড় হরিহরছত্র হইতে গজকচ্ছপকে লইয়া আসিয়া যে পাহাড়ের উপর তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানেরও নিদর্শন পাওয়া যায়। এইরূপে এখান-কার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দর্শন ও স্পর্শন কার্য্য শেষ করিয়া এ স্থান হইতে আমরা হরিদ্বার যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

লক্ষ্ণৌ

অযোধ্যা হইতে হরিদ্বার যাইবার পথে লক্ষ্ণৌ নামক ষ্টেশনের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। লক্ষ্ণৌ আউদ রোহিলখণ্ড রেল কোম্পানীর একটী বিখ্যাত জংশন ষ্টেশন। লক্ষ্ণৌএর প্রাচীন নাম লক্ষ্মণাবতীপুরী। পূর্ব্ব-কালে ইহাই অযোধ্যা নগরের রাজধানী ছিল। সহরটী গোমতী নদীর উপরিভাগে আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে। সূর্য্যবংশোদ্ভব শ্রীরামচন্দ্রের অনুজ "লক্ষ্মণদেব" সহরটীর সৃষ্টিকর্ত্তা। এই কারণে তাঁহারই নামানুসারে ইহা লক্ষ্মণাবতীপুরী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু

এক্ষণে ইংরাজদিগের আমলে সেই প্রাচীন নামের পরিবর্ত্তে উহা লক্ষ্ণৌ নামে খ্যাত হইয়াছে। প্রায় দুই শত বৎসর অতীত হইল; এই প্রাচীন হিন্দু প্রতিষ্ঠিত রাজ্যটী মুসলমানদিগের প্রাদুর্ভাবকালে অধিকৃত হইয়া তাঁহাদের কৌশলে এরূপভাবে পরিবর্ত্তন হইয়া স্থাপিত হইয়াছে, যে পূর্ব্বে ইহা হিন্দু রাজাদিগের ছিল বলিয়া তাহা কিছুতেই জানিতে পারা যায় না। এখানে গাড়ী, ঘোড়া বা আহারীয় কোন দ্রব্যের অভাব নাই।

ষ্টেশনের বহির্ভাগ হইতে লক্ষ্ণৌ সহরের সৌন্দর্য্য অতি নয়নানন্দদায়ক। কারণ এখান হইতে সহরের যে সকল বাড়ী ঘর দেখিতে পাওয়া যায়, উহা যেন উজ্জ্বল শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত, গম্বুজ ও স্তম্ভগুলি সুবর্ণমণ্ডিত, কিন্তু নিকটে যাইবামাত্র সে ভ্রম দূর হয়। কেন না— বস্তুতঃ ঐ সকল বাড়ীগুলির চুণের প্রলেপ দ্বারা শ্বেতবর্ণে শোভিত করা হইয়াছে।

আমরা সদলে এখানে উপস্থিত হইয়া দুইখানি গাড়ী ভাড়া করিলাম এবং জয়গঞ্জ নামক পল্লীর মধ্যপথ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম; এখানকার এই প্রশস্ত রাজপথের উভয় পার্শ্বে সুসজ্জিত অট্টালিকাগুলি নয়নপথে পতিত হইবামাত্র বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। স্থানীয় অধিবাসীদিগের নিকট অবগত হইলাম, এই সকল অট্টালিকাগুলি স্থানীয় রাজা "বীর বিজয়সিংহ" বাহাদুরের প্রাসাদ। এই বিস্তৃত প্রাসাদভবনের পার্শ্বদেশ অতিক্রম করিয়া ক্রমে আজিমাবাদের বিখ্যাত বাজারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানকার এই বাজার পথের উভয় পার্শ্বে অসংখ্য খাদ্যদ্রব্যের দোকান সকল সজ্জীকৃত। ঐ সকল খাদ্য-সামগ্রীগুলি দোকানীদিগের কৌশলে স্তরে স্তরে সাজাইবার কেতা দেখিলে নয়ন পরিতৃপ্ত হয়। বাজার পথের এই সমস্ত শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে

এবার নবাব ওয়াজাবাদ-আলিশার কেশব-বাগ নামক স্থানের নিকট উপস্থিত হইলাম। নবাব শাহের রাজত্বকালে তাঁহার বেগমেরা এই বাগের মধ্যে সুখ-স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতেন। কেশব-বাগের মধ্যে—স্থানে স্থানে বৃন্দাবনের অনুকরণীয় বিবিধ ধরণের কুঞ্জবন, নিকুঞ্জকানন প্রভৃতির শোভা অতুলনীয়। কথিত আছে, নবাব ওয়াজাবাদশাহ অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। একদা এই শ্বশুর মহাশয় লোভের বশবর্ত্তী হইয়া নবাব সিংহাসন প্রাপ্তির আশায়, তৎকালীন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি মহামহিমান্বিত বড়লাট বাহাদুরকে এই নবাবের চরিত্র সম্বন্ধে নানাপ্রকার দোষারোপ করিয়া পত্র লেখেন। সে পত্র পাইয়া তিনি স্বয়ং লক্ষ্ণৌ সহরে ইহার সত্যাসত্য পরীক্ষা করিবার জন্য পদার্পণ করিলেন এবং এখানে তাঁহার দুর্ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া, কৌশল বিস্তারপূর্ব্বক তিনি সেই বিলাসী নবাবকে কলিকাতায় আনয়ন করিলেন, আর সমৃদ্ধিশালী সেই লক্ষ্ণৌ সহরের রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত—নবাব শ্বশুরের পরিবর্ত্তে একজন সুদক্ষ রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিলেন। ভারতের রাজধানী কলিকাতা সহরে সেই বিখ্যাত নবাব—ইংরাজদিগের নজরবন্দী অবস্থায় অবস্থান করিয়া তাঁহাদের কৃপার পাত্র-স্বরূপ পেন্সনপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। এইরূপে লক্ষ্ণৌ সহরের সেই বিলাসী দুর্ভাগ্য নবাব ওয়াজাবাদ এখানে—মুচিখোলার নবাব নামে প্রসিদ্ধ হইয়া শেষে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ইহধাম পরিত্যাগপূর্ব্বক সকল দুঃখের অবসান করেন।

বর্ত্তমানকালে লক্ষ্ণৌ সহরের সেই জগদ্বিখ্যাত কেশব-বাগ মধ্যে এই নবাবের দু-একজন জ্ঞাতি বাস করিতেছেন। ইহার মধ্যে তিনটী শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত সুন্দর কক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, আবার

ইহার সমতলভূমির নীচে অনেকগুলি গৃহও স্থাপিত আছে। পূর্ব্বে—গ্রীষ্মকালে ঐ সকল পাতালগৃহে বেগমদিগকে লইয়া স্বয়ং নবাব পরম সুখে অবস্থান করিতেন। ইহার মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্রাকার বাঁধা পুষ্করিণী, তাহার উপর একটী প্রশস্ত সেতু। প্রবাদ—চৈত্র মাসের দোলের সময়—বৃন্দাবনে ব্রজবাসীরা যেরূপ হোলীখেলায় উন্মত্ত হন; এখানে নবাবও সেইরূপ ঐ পুষ্করিণীতে গাজিপুরের ভাল গোলাপ জলে পরিপূর্ণ করিয়া, তাহাতে রাশি রাশি আবীর ঢালিতেন এবং পিচকারীর দ্বারা বেগমদিগের গাত্রে সিঞ্চন করিয়া নানাপ্রকার আমোদ অনুভব করিতেন। এতভিন্ন এখানে ছত্রমঞ্জিল, মতিমহল প্রভৃতির সৌন্দর্য্য দর্শনযোগ্য। ফল কথা—কেশব-বাগ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! কেন না—ইহার মধ্যে বিলাসী নবাবের বাহারটী অন্দর মহলের গৃহ শোভা পাইতেছে।

মতিমহল—ইহারও সৌন্দর্য্য লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। কারণ সংসারমাঝে বুড়াবুড়ার নিকট যে উপকথা শুনিতে পাওয়া যায়—"সোণার গাছ, হীরার ফুল" ইত্যাদি লক্ষ্ণৌ সহরে এই মতিমহলে সেই সকল বৃক্ষ, নবাব আপন পছন্দানুসারে অকাতরে বহু অর্থ ব্যয়সহকারে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টবে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহার কোনটীতে রূপার ডাল, সোণার পাতা, মুক্তার ফল ইত্যাদি শোভা পাইত, কিন্তু হায়! নবাবের অবর্ত্তমানে এখানকার এই সকল বৃক্ষগুলি বহু মূল্য দ্রব্যের পরিবর্ত্তে ঝুট সাজে সজ্জিত থাকিয়া তাঁহার পছন্দের বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

ছত্রমঞ্জিল—এই অট্টালিকাটী গোমতী নদীর তীরের উপর বারদোয়ারীর ন্যায় নানা প্রকোষ্ঠে সজ্জিত হইয়া আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে। বর্ত্তমানকালে ইহার মধ্যে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের কয়েকটী
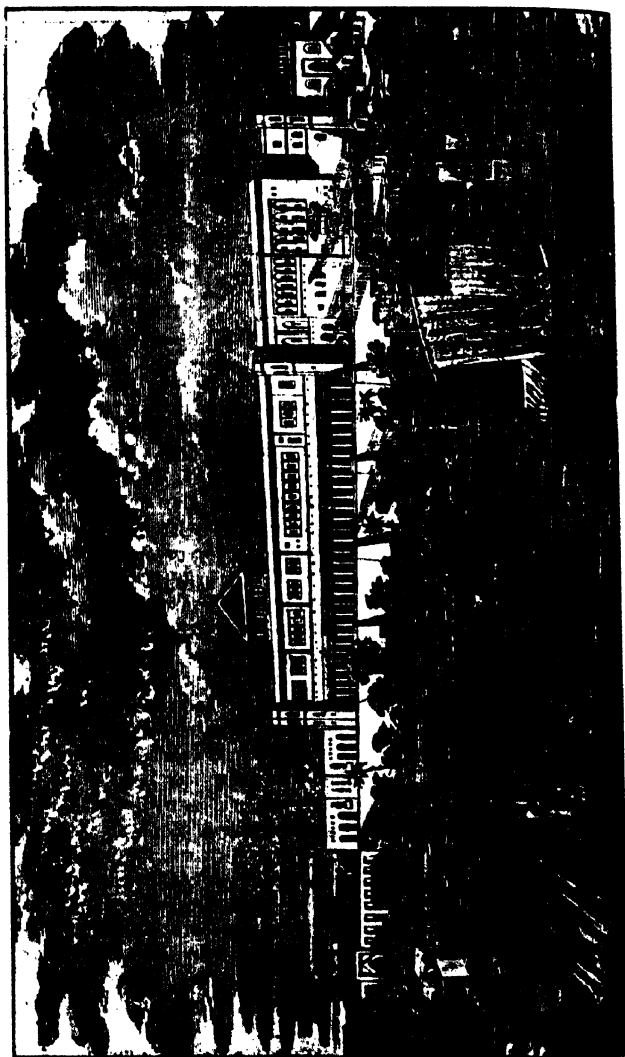
ন্যাকিস দেখিতে পাওয়া যায়। ছত্রমঞ্জিলের শিখরদেশে একটী স্বর্ণপাত আবৃত ছত্র স্থাপিত থাকার নিমিত্ত সূর্য্যালোকে উহা ঝক্‌মক্‌ করিতে করিতে দর্শকবৃন্দের আনন্দ বৃদ্ধি করিতে থাকে। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত লক্ষ্ণৌ সহরের সেই প্রসিদ্ধ ছত্রমঞ্জিলের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল।

কাইসার-বাগ নামে এখানে যে অট্টালিকা আছে, যাহার দ্বারদেশে একটী স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত আছে; স্থানীয় অধিবাসীদিগের নিকট অবগত হইলাম যে—নির্ব্বাসিত নবাববংশের উহাই শেষ কীর্ত্তি। এতদ্ভিন্ন শা-মঞ্জিল নামে এখানে যে বাগানবাটী আছে, তাহাতে নবাব ভেড়া, মেড়া প্রভৃতি পশুদিগের একত্র সমাবেশ করিয়া উহাদের লড়াই দেখিতেন এবং কত আমোদ অনুভব করিতেন। যতগুলি বাগানবাটী লক্ষ্ণৌ সহরে বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে ইমামবারা বা আসফউদ্দৌলার সমাধি-মন্দিরটীই প্রধান। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষ কালের সময় ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। সেই প্রাচীন সমাধি মন্দিরের ভিতর এক প্রকাণ্ড দালান আছে। এক্ষণে নানাপ্রকার নানা ধরণের অস্ত্রাগার ইহার মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আলম-বাগ, সেকেন্দ্রা-বাগ ও বেলিগার্ডেন নামে তিনটী যুদ্ধক্ষেত্র এখানে বর্ত্তমান আছে। সেই সকল যুদ্ধক্ষেত্রগুলি এক্ষণে রেসিডেণ্ট নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই রেসিডেন্টের বিষয় ইতিহাসে কত প্রকারই বর্ণনা আছে, সে সকল বিষয়গুলি একে একে বর্ণনা করিলে একখানি পৃথক্‌ গ্রন্থ প্রস্তুত হয়।

দৃষ্টান্তের স্বরূপ একটী বিষয় উল্লেখ করিতেছি, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহের সময় ইংরাজদিগের সহিত বিদ্রোহীদিগের যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধে—সেই সঙ্কটময় সময় প্রায় সহস্র ইউরোপীয় অধিবাসী আপন আপন স্ত্রীপুত্র লইয়া এখানে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য আশ্রয় গ্রহণ করেন

এবং ইংরাজ সেনাপতি মহাবীর সার হেনরি লরেন্স ৫০০ শত ইংরাজ ও ৫০০ শত বিশ্বাসী সিপাহী লইয়া আপন প্রাণকে তুচ্ছপূর্ব্বক ছয় মাসকাল তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য, তাহাদের অবস্থানকালে বিদ্রোহীরা এখানে ঐ সকল ইংরাজদিগকে লক্ষ্য করিয়া দিবারাত্র গোলা গুলি চালাইয়াছিল। সেই সকল কামান নিঃসৃত গোলার দাগ অদ্যাপি সেগুলিতে বর্ত্তমান থাকিয়া অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

লক্ষ্ণৌ সহরে মাদ্রাসা নামে একটী সাততালা বাড়ী বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বে ইহাতে নবাব বাস করিতেন। নবাব সেনাপতি মিঃ ক্লড মার্টিন দ্বারা ইহা প্রস্তুত হইয়াছিল. কিছুদিন পরে এই নবাবেরই আদেশে তাঁহার বংশধরেরা ইহার মধ্যে বিদ্যাভ্যাস করিতেছিলেন, কিন্তু নবাবের অবর্ত্তমানে—এই বাড়ীটী এক্ষণে মার্টিন কলেজ নামে প্রসিদ্ধ হইয়া ইংরাজ বালকেরা বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন। মার্টিন কলেজের সন্নিকট ক্যানিং কলেজ নামে যে বিদ্যালয়টী দেখিতে পাওয়া যায়—উহা রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের যত্নে স্থাপিত। এই কলেজবাটীতে ভারতসন্তানেরা বিদ্যা শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন। এই স্থানে মহাত্মা দক্ষিণারঞ্জন বাবুর কিছু পরিচয় দিব।

মাননীয় দক্ষিণারঞ্জন বাবু একজন কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান। ইনি কলিকাতায় একজন পিরালীবংশে বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়েই বাস করিতেন বলাবাহুল্য, এই দক্ষিণারঞ্জন বাবু অতি বুদ্ধিমান ও সুপুরুষ ছিলেন। কোন বিশেষ কারণবশতঃ তিনি বাধ্য হইয়া এখানে বাস করিবার সময় আপন দক্ষতাপ্রভাবে স্থানীয় অধিবাসীদিগের প্রতি শীঘ্রই প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন; এমন কি এ সহরের তালুকদারগণ পর্য্যন্ত তাঁহার পরামর্শ না লইয়া কখন কোন কর্ম্মই করিতেন না।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইবার পর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যখন বহু দূর-ব্যাপী সিপাহীবিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তখন তিনি প্রাণপণে ইংরাজদিগের সাহায্য করিয়াছিলেন ; ইহার ফলে তৎকালীন বড়লাট বাহাদুর তাঁহার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া দক্ষিণারঞ্জন বাবুকে পুরস্কারস্বরূপ একটী জাইগীর ও রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন। তখন এই রাজা দক্ষিণারঞ্জন মহোদয় এখানে অনেক হিতকর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আপন মহত্ত্ব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এই মহাত্মা স্থানীয় লোক-দিগকে নিঃসহায় অবস্থায় ফেলিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন।

লক্ষ্ণৌ সহরের চক্—এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! কেন না, যে সহর এখানকার বাইজীদিগের সঙ্গীত এবং খিলিপানের জন্যই বিখ্যাত ; সেই বিখ্যাত বাইজী এবং বেশ্যা সুন্দরীগণ ও ঐ সকল খিলীপানের দোকান সকল এই চক-বাজারের চারিধারেই অবস্থিত হওয়াতে এই স্থানটী বেশ সরগরম অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। চকের সন্নিকটে বিস্তর ধনী সওদাগর বাস করিয়া থাকেন। চক-বাজারের "আসামীর" নামক দেউড়ির সৌন্দর্য্য দেখিলে আত্মহারা হইতে হয়। এরূপ সুশ্রী অট্টালিকা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। লক্ষ্ণৌ সহরে পিত্তলের উপর গিল্টী করা বাসন, কাঁচের চুরি, বাইজীর গান, এবং খিলিপান জগদ্বিখ্যাত। এ সহরে এক খিলি পানের মূল্য ১৲ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, আমরা সদলে লক্ষ্ণৌ সহরের এইরূপে উপরোক্ত দ্রষ্টব্য স্থানগুলির শোভা সন্দর্শনপূর্ব্বক এখান হইতে হরিদ্বার যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া পথিমধ্যে কর্ণপ্রয়াগের সেবা করিয়াছিলাম।

কর্ণপ্রয়াগ

গাড়োয়াল জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। পিণ্ডার ও অলকনন্দীর সঙ্গমস্থলটাই কর্ণপ্রয়াগ নামে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, এই সঙ্গমস্থলে ভক্তিসহকারে স্নান করিলে বহু পুণ্যসঞ্চয় হয়। হরিদ্বারের যাত্রীরা ইহাতে স্নান করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য স্থাপিত একটী দেবমূর্ত্তি এখানে প্রতিষ্ঠিত আছে। কুন্তীপুত্র কর্ণ—যিনি ধরায় দাতাকর্ণ নামে খ্যাতিলাভ করেন, সেই জগদ্বিখ্যাত দাতা কর্ণেরও একটী বিগ্রহমূর্ত্তি এ তীর্থে স্থাপিত আছে। এই দাতাকর্ণের নামানুসারে এ তীর্থের নাম কর্ণপ্রয়াগ হইয়াছে।

হরিদ্বার

যে সকল যাত্রী কলিকাতা হইতে হরিদ্বারে যাত্রা করিবেন, তাঁহাদিগকে ই-আই-রেলে ৪৬৯ মাইল মোগলসরাই—তথা হইতে আবার অাউদ রোহিলখণ্ড রেলযোগে ৪৮৬ মাইল দূরে লাকসর নামে যে একটী বিখ্যাত জংশন ষ্টেশন আছে, সেই ষ্টেশন হইতে পৃথক্ ব্রাঞ্চ লাইনে মাত্র ১৬ মাইল পথ অতিক্রম করিলে পর—হরিদ্বার নামক ষ্টেশনে পৌঁছিবেন। আমরা অযোধ্যা হইতে লকসার, তৎপরে হরিদ্বারে যাত্রা করিয়াছিলাম।

হরিদ্বার গঙ্গার দক্ষিণতীরে অবস্থিত। হিমালয়ের সিয়ালিক নামক পর্ব্বত হইতে এই স্থানের সমতলভূমিতে গঙ্গাদেবী প্রথমে অবতীর্ণা হইয়াছেন, এই নির্দ্দিষ্ট স্থানেই কূলপ্লাবিনী গঙ্গাদেবী ইন্দ্রের ঐরাবতের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন। মহামুনি কপিল এই স্থানে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার অপর নাম কপিল স্থান। শৈব সম্প্রদায় এই নির্দ্দিষ্ট স্থানটীকে হরিদ্বারের পরিবর্ত্তে হরদ্বার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

হরিদ্বার—হিন্দুদিগের একটী পবিত্র তীর্থ স্থান। ইহার দুইদিকে পর্ব্বতশ্রেণী আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে, মধ্যে ত্রিধারা হইয়া

গঙ্গা প্রবাহিতা, সেই ত্রিধারা কনখলে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই সকল পর্ব্বতশ্রেণীর উত্তর পার্শ্বে বাস করিবার বিস্তর উপযুক্ত গুহা দেখিতে পাওয়া যায়। সাধু ও ঋষিগণ ঐ সমস্ত গুহায় অবাধে বাস করিয়া থাকেন। এখানে যত মঠ আছে, অপর কোন তীর্থে এত অধিক আছে কিনা সন্দেহ। হরিদ্বারে কোন গৃহস্থকে স্থায়ীভাবে বাস করিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। কথিত আছে, হরিদ্বার স্বর্গের দ্বার-স্বরূপ। কাশীর অবিমুক্তক্ষেত্র যেরূপ বারাণসী সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়, হরিদ্বারে জগজ্জননী গঙ্গাদেবীর কৃপায় সেইরূপ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হওয়া যায়। হরিদ্বারে আহারীয় দ্রব্য-সামগ্রীর জন্য কাহাকেও কোনরূপ কষ্ট পাইতে হয় না। কেন না—এখানে ফল, মূল হইতে ঘৃতপক্ক যাবতীয় দ্রব্যই প্রচুর পরিমাণে এবং সুবিধা দরে পাওয়া যায়।

ইতিহাস পাঠে উপদেশ পাওয়া যায়—এই ধর্ম্মক্ষেত্রে পূর্ব্বে অনেক কুরুক্ষেত্রের অনুষ্ঠান হইয়াছে। গোস্বামী ও বৈরাগী নামক এই দুই সম্প্রদায় কয়েকবার এখানে রীতিমত যুদ্ধ বাধাইয়াছিলেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে তাহাদের রণোন্মত্ততা চরমে উঠিয়াছিল,অর্থাৎ শিখেদের তলোয়ারের মুখে পাঁচ শত গোস্বামী—ধর্ম্মের জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। মুসলমানের ধর্ম্মদ্বেষিতা এ তীর্থে আপনার জয়চিহ্ন রাখিতে ভুলে নাই। তৈমুর কর্ত্তৃক প্রবাহিত—ভারতবিদারি শোণিতস্রোতে হরিদ্বারে অনেক ভক্ত যাত্রী আপনাদের হৃদয়-রক্ত মিশাইতে কুণ্ঠিত হন নাই।

হরিদ্বার নাম মাহাত্ম্য অপেক্ষা—স্থান মাহাত্ম্যের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ।

আমরা সদলে এই হরিদ্বারে উপস্থিত হইয়া যথানিয়মে মণিরাম কৃপারাম সাড়ে পাঁচ ভ্রাতার পুত্র—আত্মারাম প্রতাপচাঁদকে পাণ্ডাপদে বরণ করিয়াছিলাম। তাঁহার ঠিকানা—বাঙ্গালীঘাট, আদি নিবাস

কন্‌খল্ মঙ্গলদৎ-বিষ্ণুদৎ"। ইনি যাত্রীদিগের বিশেষ যত্ন লইয়া থাকেন এবং মিষ্টভাষী।

পূর্ব্বকালে সূর্য্যবংশে ভগীরথ নামে এক পরম ধার্ম্মিক এবং মহা প্রভাবশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ "সগরনন্দনগণ" অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্যাপৃত হইলে—কপিলমুনির ক্রোধাগ্নিতে সমূলে দগ্ধ হন। রাজা ভগীরথ ইহা অবগত হইয়া মনে মনে নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে—যাঁহারা ব্রহ্মশাপাগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছেন, এক ত্রিমার্গগামী "গঙ্গা" ব্যতিরেকে তাঁহাদিগকে আর কেহই ত্রিদিবধামে লইয়া যাইতে সমর্থ হইবেন না? সেই জলরূপিণী শিবাত্মিকা গঙ্গাদেবীই আমার পরম শক্তি—কেন না, তিনি ত্রিশক্তিরূপিণী, করুণাময়ী, সুখাত্মক কৈবল্যস্বরূপা ও শুদ্ধধর্ম্মস্বরূপিণী। আমি বিশ্ব রক্ষার্থে সেই পরম ব্রহ্মস্বরূপিণী জগদ্ধাত্রীদেবীকে লীলাবশে মস্তকে ধারণ করিতে পারিলেই নিশ্চয়ই আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইব। এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া তিনি স্বীয় অমাত্যকরে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক পিতামহগণের উদ্ধারার্থ—নাগাধিরাজ হিমালয়ে উপস্থিত হইয়া সেই ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি গঙ্গাদেবীর তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। কারণ কথিত আছে, হর-পার্ব্বতী ও গঙ্গা এই ত্রিশক্তিই একত্র বিদ্যমান আছেন এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ যাবতীয় পুরুষার্থ সমস্তই সূক্ষ্মরূপে গঙ্গায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন মহামতি রাজা ভগীরথ এখানে সেই গঙ্গাদেবীর আরাধনার ফলে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণকে ব্রহ্মশাপ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

বহিঃস্থিত জল যেমন নারিকেল ফলের অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকে, পরব্রহ্মরূপ জল সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্যস্থ হইয়াও জাহ্নবীতে অধিষ্ঠান করিতেছে। কলিযুগে যাহাদের চিত্ত কলুষিত, যাহারা পর দ্রব্য গ্রহণে

রত এবং বিধিহীন ও ক্রিয়াবিহীন—একমাত্র গঙ্গা ব্যতিরেকে তাহাদের আর কোন উপায় নাই। "গঙ্গা গঙ্গা" এই পবিত্র নাম জপ করিলে কালফণী রাক্ষসীসদৃশী অলক্ষ্মী, দুঃস্বপ্ন ও দুশ্চিন্তা কখনই তাহাকে আক্রমণ করিতে সাহস করে না। ভক্ত্যানুসারে গঙ্গা—ইহলোক ও পরলোক উভয়েরই ফলদাত্রী। এই কলিযুগে দান, যজ্ঞ, তপ, জপ, যোগ কিছুই গঙ্গাসেবার তুল্য নহে। যে ব্যক্তি গঙ্গাদেবীর অর্চ্চনা না করেন, তাহার কুল, যজ্ঞ, তপস্যা সকলই বৃথা হয়। সন্দিগ্ধ ব্যক্তিরাই মোহিত হইয়া গঙ্গাকে সামান্য নদীর তুল্য বিবেচনা করেন।

ধর্ম্মাত্মা মহারাজ ভগীরথের প্রার্থনায় সেই পরম পবিত্র গঙ্গাদেবীকে হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশের সিয়ালিক পর্ব্বতের গোমুখী হইতে কুলকুল শব্দে ভারতের সমতলক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইয়াছিল। এখানে ঐ স্রোতস্বিনী গঙ্গার দৃশ্য অতি মনোহর। এ দৃশ্য যিনি একবার দর্শন করিয়াছেন, ইহজন্মে তিনি কখন উহা ভুলিতে পারিবেন না। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত সেই স্রোতস্বিনী গঙ্গার একখানি চিত্রপট প্রদত্ত হইল।

হরিদ্বারে গঙ্গার দুইটী ধারা আছে, তন্মধ্যে পশ্চিমধারার তীরে তীর্থ সকল বিদ্যমান আছেন। এখানে ব্রহ্মকুণ্ড ও কুশাবর্ত্ত নামে যে দুইটী বিখ্যাত ঘাট আছে—তথায় তীর্থপদ্ধতি অনুসারে সঙ্কল্প করিয়া স্নান করিতে হয়। ইহার ফলে ভাগীরথীর কৃপায় সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। পতিতপাবনী—সর্ব্বপ্রথমেই কৈলাসের গোমুখী হইতে অবতরণপূর্ব্বক এই হরিদ্বারে আসিয়া পতিত হন, এই নিমিত্ত এই স্থান স্বর্গদ্বার নামে কথিত এবং এই নির্দ্দিষ্ট স্থানটীই ব্রহ্মকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ।

ব্রহ্মকুণ্ড নামক তীর্থতীরে যথানিয়মে গো-দান, অন্নদান, প্রভৃতি দানকার্য্য সমাপনান্তে দক্ষিণাসহ একটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে

পারলে তাঁহার বিষ্ণুলোকে গতি হয়। ইহার দক্ষিণদিকে অল্পদূরে—কুশাবর্ত্ত নামে আর একটী তীর্থঘাট আছে। ভক্তগণ যথানিয়মে তথায় পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। কথিত আছে, জনৈক ঋষি এই নির্দ্দিষ্ট তীর্থতীরে বসিয়া যোগসাধন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে গঙ্গাদেবী কৈলাসপর্ব্বত হইতে স্রোতস্বিনী হইয়া প্রফুল্লমনে এই স্থান অতিক্রম করিবার সময় ঋষিবরের কুশ—সেই স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যান। এদিকে ধ্যানভঙ্গ মুনি—তাঁহার কুশ দেখিতে না পাইয়া ক্রোধে কুশসহ গঙ্গাদেবীকে আকর্ষণ করেন। তখন ভাগীরথী ঋষির নিকট স্বীয় আগমনবার্ত্তা প্রকাশ করিয়া তাঁহার কুশ প্রত্যার্পণপূর্ব্বক এই ঘাটের নাম কুশাবর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ করিতে অনুরোধ করেন এবং হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে এই বরপ্রদান করেন—অতঃপর যে কেহ এই ঘাটের উপর শুদ্ধচিত্তে পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ বা তর্পণ করিবে,আমার বরপ্রভাবে পিতৃগণের সহিত নিশ্চয় সে বিষ্ণুলোকে স্থান প্রাপ্ত হইবে। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত সেই জগদ্বিখ্যাত কুশাবর্ত্ত ঘাটের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল।

কুশাবর্ত্তঘাটের উপরিভাগে সর্ব্বনাথ নামে শিবলিঙ্গ বিরাজমান। এই ঘাটে যথানিয়মে কুম্ভযোগের সময় স্নান করিতে পারিলে তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। প্রতি বারবৎসর অন্তর এখানে কুম্ভ মেলা হয় এবং প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতেও একটী মেলা হয়। উক্ত মেলায়—বহু সংখ্যক অশ্ব এখানে নানা দেশ হইতে আনীত হইয়া খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে।

কুশাবর্ত্তঘাটের আশে-পাশে বিস্তর বড় বড় নানা ধরণের মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়। তীর্থ স্থানের মৎস্য বলিয়া ইহাদের প্রতি কেহ অত্যাচার করেন না। যাত্রীরা এখানে আসিয়া এই সকল মৎস্যগণকে

এবং স্থানীয় বানরকুলকে নানা প্রকার আহারীয় দ্রব্য-সামগ্রী প্রদানে কত আমোদ কৌতুক অনুভব করিয়া থাকেন।

এই ঘাটের উপরিভাগে যেরূপ সর্ব্বনাথদেব বিরাজমান, গঙ্গাদ্বার নামক ঘাটের উপরিভাগে সেইরূপ এক মন্দির মধ্যে ভগবান বিষ্ণুর চরণ-চিহ্ন দেদীপ্যমান। ভক্তগণ এ তীর্থে উপস্থিত হইয়া যথানিয়মে এই দুইটীর পূজার্চ্চনা করিতে অবহেলা করিবেন না।

সন্ধ্যাকালে—যখন নক্ষত্রমালা ধীরে ধীরে আকাশে উঠিতে থাকে, সেই সময় এই পবিত্র কুশাবর্ত্তঘাটের তীরে—কত শত দীর্ঘাঙ্গী, বিকশিতযৌবনা, প্রফুল্লপুষ্পাননা পাঞ্জাবী ও মারহাট্টা সুন্দরীগণ ওড়না উড়াইয়া দীপাধার হস্তে একত্রিত হন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সকল সুন্দরীর দল ঘাটে উপস্থিত হইলে একদিকে সহসা স্তোত্রপাঠ সুরের কম্পন উঠে, অপরদিকে যাবতীয় দেবালয়ে সন্ধ্যা-আরতি আরম্ভ হয়। বলাবাহুল্য, তাঁহাদের শুভাগমনে এই সৌন্দর্য্যশালী ঘাটটীর শোভা শতগুণে বর্দ্ধিত হয়। এই নির্দ্দিষ্ট সময়ে—দর্শকমাত্রেরই যে কি এক স্বর্গীয় ভাবের উদয় হয়, তাহা লেখনীর দ্বারা বুঝান অসাধ্য! কি গম্ভীর ভাব! কি মুহুর্মুহু শঙ্খনাদ! ভক্তবৃন্দের কি গগণভেদী এক-তানের স্তোত্রপাঠ! যিনি দেখিবেন বা শুনিবেন—তিনিই মুগ্ধ হইবেন, সন্দেহ নাই।

হরিদ্বারে নারায়ণশীলা নামে যে এক উচ্চ পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার উপরিভাগে মায়াদেবী ও ভৈরবদেবের এক প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মায়াদেবীর মন্দির মধ্যে চতুর্ভুজা ত্রিমস্তকধারিণী দুর্গার করালমূর্ত্তির দর্শন পাওয়া যায়—এই মূর্ত্তির এক হস্তে নরকপাল, দ্বিতীয় হস্তে ত্রিশূল, তৃতীয় হস্তে চক্র শোভা পাইতেছে, চতুর্থ হস্তে জীবদিগের হৃদয়ে মায়াতে আচ্ছন্ন করিতেছেন। মন্দিরের সম্মুখে সর্ব্ব-

নাথশিবের অষ্টবাহু মূর্ত্তি এবং এক নন্দী মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। মন্দিরের বাহিরে মহাবোধি বৃক্ষতলে ভগবান বুদ্ধদেবের একটী পবিত্র মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। এই মূর্ত্তি দর্শনে ভক্তির উদয় হয়।

মায়া—মায়ার কেন্দ্র কোথায়? মায়ার উচ্ছেদসাধন করিতে হইলে কার্য্যতঃ কত দূর উচ্ছেদিত হয়; মায়া কত—কতদূর বিস্তৃত, তাহা কেহই জানিতে পারেন না। এই সন্ধিক্ষণে কেবলমাত্র মনের অনুভব করে, সংসার ত্যাগ করিলেই মায়ার উচ্ছেদ হয় না। মায়া বাহিরে নয়—মায়া ভিতরে। বহির্জগতে মায়া বলিয়া কোন কিছুই নাই। মায়ার ক্ষেত্র মানব হৃদয়ে—ইন্দ্রিয় সকল বহির্জগৎ হইতে যে সমস্ত জিনিষ আনিয়া মানব-হৃদয়ে সংস্কারাকারে সাজাইয়া দিয়াছে—সেই সংস্কারগুলিই মায়া।

হরিদ্বারের চতুর্দ্দিকই পাহাড়বেষ্টিত। এখানে ভীমঘোড়া নামক স্থানে যে কুণ্ডে শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে, সেই কুণ্ড মধ্যেও বিস্তর মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় পূজারীদিগের নিকট উপদেশ পাইলাম, এই কুণ্ডের সহিত স্রোতস্বিনী গঙ্গার এক সুরঙ্গ পথ আছে, উহাতেই মৎস্যগণ ইচ্ছামত বিচরণ করিয়া থাকে।

ভীমঘোড়া

ভীমঘোড়া নামক তীর্থ—একটী অশ্ব খুড়াকৃতি জলাধার বিশেষ। ইহার মধ্যভাগে এক মন্দিরের ভিতরের শিবলিঙ্গ দর্শন ব্যতীত আর কোন কিছুই নাই। ভীমঘোড়া সম্বন্ধে প্রবাদ—কোন এক সময় দ্বিতায় পাণ্ডব ভীমসেন অশ্বারোহণে যখন এই স্থান অতিক্রম করিতেছিলেন, তখন তাঁহার অশ্বের খুড় এই মন্দিরচূড়ায় আবদ্ধ হইয়া

নিশ্চল হইয়াছিল। মহাবীর ভীমসেন ইহার কারণ অবগতির জন্য অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া এক মন্দির চক্র দর্শন করিলেন এবং সেই প্রোথিত প্রাচীন মন্দিরটীর উদ্ধারসাধন করিয়া আপন কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন। এই নিমিত্ত এ তীর্থ টী ভীমঘোড়া নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

গঙ্গাতীর হইতে এই ভীমঘোড়া যাইবার পথে যে রললাইন এক পাহাড়ের মধ্যস্থল ভেদ করিয়া প্রসারিত হইয়াছে, উহার স্থাপত্য কৌশল নয়নপথে পতিত হইলে রেলওয়ে কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ারগণের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

চণ্ডীর পাহাড়—কুশাবর্ত্তঘাট হইতে অন্যূন এক ক্রোশ দূরে এই পাহাড়টী অবস্থিত। ইহার অপর নাম নীল-ধারার পর্ব্বত। পাহাড়ের উপরিভাগে অর্থাৎ শিখরদেশে জগজ্জননী চণ্ডীকাদেবী ও বিশ্বেশ্বর মহাদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, এতদ্ভিন্ন বিল্বপর্ব্বত নামে যে পর্ব্বত এখানে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার শিখরদেশে আরোহণ করিলে গঙ্গার নীলধারা স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

পাহাড়ের উপর হইতে এই নীলধারাটী যেন কলকলনাদে নীচে অবতরণ করিতেছে। নীলধারার কি প্রবল উচ্ছ্বাস! কি অনিবার গতি! এই গতি আবার সহসা মধ্যস্থ শিলা প্রাচীরে আহত হইয়া ক্রুদ্ধ অজগরের মত যেন সেই পতনশীল নীলধারা রুদ্ধাক্রোশে গর্জ্জিয়া উঠিতেছে এবং সূর্য্যকরপ্রোজ্জ্বল সেই উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত বারিধারা ফেণপুঞ্জ তুষার শুভ্র হইয়া ক্রমশঃ নীচের দিকে গড়াইয়া পড়িতেছে—কি অপরূপ দৃশ্য! প্রকৃতির কেবল এই রঙ্গভঙ্গীটী দেখিলে তীর্থ দর্শনের যাবতীয় কষ্ট ও অর্থ ব্যয় সার্থক বিবেচনা হয়। হরিদ্বারে যেখানে যত ধারা আছে, সেই সকল ধারার নির্ম্মল বারিরাশি বর্ষাকাল ব্যতীত কাচের মত পরিষ্কার।

হরিদ্বারের পূর্ব্বদিকে নীল্লোকেশ্বর, পশ্চিম-দক্ষিণে বিল্লোকেশ্বর ও গৌরীকুণ্ড এবং ঠিক দক্ষিণে পিছোড়নাথ মহাদেবের পূজার্চ্চনা করিতে হয়।

ব্রহ্মকুণ্ড নামক ঘাট হইতে দেড় মাইল দক্ষিণে গঙ্গার তীরে কন্‌থল্ নামে একটী পবিত্র স্থান আছে। ধর্ম্মাত্মা বিদুর এই স্থানে যোগ-সাধন করিতেন, মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন স্বর্গারোহণকালে তাঁহার দুর্জ্জয় গদা এই স্থানেই পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। প্রস্তরাকৃতি সেই বিখ্যাত প্রকাণ্ড গদা অদ্যাপি এখানে জীর্ণাবস্থায় বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই কন্‌থলে মহাত্মা বিবেকানন্দ স্বামীর প্রতিষ্ঠিত একটী সেবাশ্রম আছে, আবার এই কন্‌থলেই—গঙ্গার ত্রিধারা সম্মিলিত হইয়াছে। সঙ্গম স্থানে জলের বিস্তার অত্যন্ত অধিক, বলাবাহুল্য—এই নির্দ্দিষ্ট সঙ্গম স্থানে অবগাহন করিলে ভক্তমাত্রেরই পূর্ব্বজন্মের পাপরাশি ক্ষয় হয়, অধিকন্তু গঙ্গাদেবীর কৃপায় অন্তিম সময়ে স্বর্গে স্থান পাওয়া যায়।

কন্‌থলের বাড়ী ঘরগুলি সুগঠিত, পথঘাট সুনির্ম্মিত। বাজার হাট সমস্তই বর্ত্তমান থাকিয়া অধিবাসীদিগের অভাব দূর করিতেছে। ফলকথা, হরিদ্বার অপেক্ষা কন্‌থল্ সহর সকল দিকে উন্নত।

কন্‌থল্—সেই মহাস্থান, যে স্থানে দক্ষপ্রজাপতি শিবহীন যজ্ঞ করিয়াছিলেন, যে যজ্ঞে এক শিব ব্যতীত সকল দেবতাই আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, এখানে যে স্থানে দক্ষনন্দিনী "সতী", পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, আবার রোষভরে শূলপাণি যে যজ্ঞ-নাশ করিয়াছিলেন, সেই স্থানের দক্ষিণ সীমানায় দক্ষেশ্বর নামে দক্ষ-রাজ কর্ত্তৃক এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের কোন বিশেষত্ব নাই—আছে কেবল স্মৃতি।

সেই স্মৃতির যবনিকাখানি তুলিলে প্রাচীন অভিনীত একখানি বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্য যেন মনশ্চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে।

কথিত আছে, মহাদেবের অভিশাপে রাজা ছাগমুণ্ড প্রাপ্ত হইলে—মহেশ্বরের ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য দক্ষরাজ এখানে এই লিঙ্গমূর্ত্তিটী স্থাপিত করেন। নগরের দক্ষিণ কোণে সীতাকুণ্ড নামে যে কুণ্ড আছে, সেই কুণ্ডের ভস্মরাশি স্পর্শ করিতে হয়।

কন্‌খলে—দক্ষেশ্বর শিব ও সীতাকুণ্ড ব্যতীত অনেকানেক দেবালয় স্থাপিত আছে। এ স্থান অতি পবিত্র বলিয়া মনে হয়। যে সকল যাত্রী এখান হইতে হৃষীকেশ ও লক্ষ্মণঝোলা নামক পবিত্র স্থান দর্শন করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাদিগকে এই স্থান হইতেই তথায় যাত্রা করিতে হইবে, যদ্যপি কেহ ঘোড়ার গাড়ীর সাহায্যে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি যেন হরিদ্বার হইতে কন্‌খল্ হইয়া হৃষীকেশ যাওয়া আসার ভাড়া করেন, ইহাতে বিশেষ সুবিধা হইবে। বলাবাহুল্য, চারি জন আরোহী অক্লেশে যাইতে পারেন, এরূপ একখানি ঘোড়ার গাড়ীর ভাড়া হরিদ্বার হইতে ৫৲ দিলেই পাওয়া যায়। আমরা এ তীর্থে যাহাদের সহিত আসিয়াছিলাম, তাহাদের এখানকার সমস্ত তীর্থ জানা না থাকায়, প্রথমবারে স্থানীয় অধিকাংশ তীর্থ স্থান দর্শন ঘটে নাই, অথবা যাহা দর্শন করিয়াছি, উহাতে কত কষ্ট, কত বাজে খরচ সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই দুঃখেই দুর্ব্বল হস্তে লেখনী ধারণ করিয়া এই পুস্তকের সৃষ্টি, এই পুস্তকখানি সঙ্গে থাকিলে সাধারণের উপকার হইবে, এরূপ আশা হয়।

দ্বিতীয়বারে এখানকার অবশিষ্ট তীর্থ যাহা দর্শন বা সেবা করিয়াছি—উহা দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই স্থানে

একটী কথা বলিবার আছে—সকল স্থানেই পাণ্ডা বা সেতুয়াদিগের গতিবিধি থাকে, কিন্তু হরিদ্বারে—চৈত্র হইতে বৈশাখ মাস ভিন্ন অপর সময় তাঁহাদের দেখিতে পাওয়া যায় না।

হরিদ্বারের দুই ক্রোশ উত্তরে সপ্তস্রোতা বা সপ্তধারা, তাহার ১৪ মাইল উপরিভাগে হৃষীকেশ তীর্থ অবস্থিত। এ তীর্থে গঙ্গা কলকল রবে তরঙ্গ উচ্ছলিত করিয়া পাহাড় হইতে অবতরণ করিতেছে, সে দৃশ্য অতীব মনোহর! কেবল এই দৃশ্যটী নয়নপথে পতিত হইলে মনে হইবে —আমার সকল কষ্ট ও সকল অর্থ ব্যয় সার্থক হইল। ভগবান হৃষীকেশের কৃপা ব্যতীত কাহারও ভাগ্যে এ তীর্থ দর্শনলাভ হয় না। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত ভগবান হৃষীকেশ-মন্দিরের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল।

এখানে গঙ্গায় স্নান ও তর্পণাদি কার্য্য যথানিয়মে সম্পন্ন করিতে হয়। এই হৃষীকেশ হইতে আরও তিন মাইল উত্তরে লক্ষ্মণঝোলার দর্শন পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালে (অনন্তদেব) বা মহামতি লক্ষ্মণদেব এই স্থানে বসিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, এই কারণে এই স্থানটী লক্ষ্মণ-ঝোলা নামে খ্যাত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে বদরীকাশ্রম পথে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। এইরূপে এখানকার তীর্থ স্থানগুলি একে একে দর্শন করিয়া আমরা এই স্থান হইতে দিল্লী বা ইন্দ্রপ্রস্থে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম
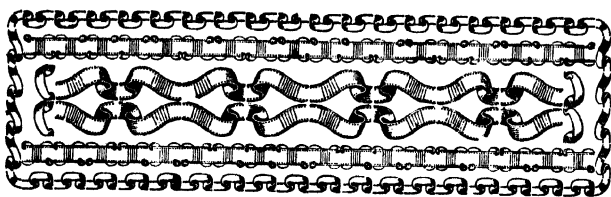
দিল্লী

দিল্লী যমুনার পশ্চিমতীরে অবস্থিত। কলিকাতা হইতে রেলপথে ৪৭৭ ক্রোশ দূরে এই প্রাচীন সহরটী আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে। হরিদ্বার হইতে পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্র দর্শন করিতে যাইতে হইলে দিল্লী জংশন ষ্টেশনে রেলগাড়ী বদল করিতে হয়; সুতরাং তীর্থ যাত্রীগণ এই ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেই দিল্লী সহরের শোভা দর্শন করিয়া থাকেন। কেন না, এই প্রাচীন সহরটী পর্য্যায়ক্রমে হিন্দু, মুসলমান ও শেষে ইংরাজরাজের রাজধানী হইয়াছে; ফলতঃ এখানে মন্দির, মস্‌জিদ এবং গির্জ্জাগুলির সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। দিল্লী সহরে যত প্রকার ঘোড়ায় টানা গাড়ী আছে, একা ব্যতীত সকলগুলিই বগী নামে প্রসিদ্ধ।

যে সহর পাণ্ডবদিগের ইন্দ্রপ্রস্থ বলিয়া কথিত, যে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, যে রাজ্যে রাজসূয় যজ্ঞ হইয়া ত্রিভুবনের দেবগণ, নৃপতিগণ একত্রিত হইয়াছিলেন, যে সহরে কুতব-মিনারের তুলনা রহিত, যথায় মোগল সম্রাটগণ তাঁহাদের রাজত্বকালে মনের সুখে সুন্দর সুন্দর মস্‌জিদ, অট্টালিকা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া নানাপ্রকারে সুসজ্জিতপূর্ব্বক আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন,

যে স্থানে অত্মাপি কেল্লা মধ্যে ঐ সকল মহিমান্বিত বাদশাহদিগের বিচার-গৃহ, বিলাসভবন, নাট্যশালা, ভজনাগার, স্নানাগার প্রভৃতি যমুনা তীরে দেদীপ্যমান থাকিয়া তাঁহাদের মহিমা প্রকাশ করিতেছে, যথায় খাস দেওয়ান নামে নানাবিধ কারুকার্য্যে পরিশোভিত একটী চমৎকার দালান আছে, যে দালানের ছাদের চারিদিকে স্পষ্টাক্ষরে খোদিত আছে, "যদি পৃথিবীতে স্বর্গের বৈকুণ্ঠ তুল্য কোন সুখ স্থান থাকে, তাহা হইলে সেটী এই প্রাসাদ মধ্যেই অবস্থিত," যে প্রাসাদের ভিতর এক উদ্যানের মধ্যস্থলে আগ্রার জগদ্বিখ্যাত তাজমহলের অনুকরণীয় হুমায়ুনের সমাধিক্ষেত্র অবস্থিত, যে প্রাচীন নগরে বর্ত্তমানকালে ইংরাজরাজের কৃপায় ট্রামগাড়ী, একা গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, কলের জল, গ্যাসের আলো এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হইয়াছে, যথায় অত্যুচ্চ সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা সকল নির্ম্মিত হইয়া ইহার কত শোভাই বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; যথায় আহারীয় সামগ্রী এবং পুলিসকোর্ট, জজকোর্ট, স্কুল, পোষ্টাফিস ইত্যাদি যাহা কিছু আবশ্যক, সমস্তই বর্ত্তমান থাকাতে প্রজাগণ সুখ-স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতেছেন। বর্ত্তমানকালে যে সহরে অসংখ্য ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাত্রীদিগের বিশ্রামের জন্য কত সুবিধাই হইয়াছে, যে দিল্লী সহর—মোগল সম্রাটদিগের রাজত্বকাল হইতে সোণা, রূপা ও গিল্টীর তারের উপর উৎকৃষ্ট অলঙ্কার প্রস্তুত হইবার জন্যই চিরবিখ্যাত; সেই সহরে পদার্পণপূর্ব্বক দুই-একদিন অবস্থান করিয়া এই সমস্ত শোভা দর্শন করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়?

পাণ্ডবগণ—শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ মত কুরুরাজের নিকট বিনা যুদ্ধে সন্ধি প্রার্থনা করিলে—কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে পাণিপত, সোনপত, ইন্দ্রপত্ত, তিলপত ও ভাগপত নামে যে পাঁচ খণ্ড জমি প্রদান করিয়া-

ছিলেন, তন্মধ্যে টিলপাত ও ভাগপত নামক এই দুই খণ্ড জমী অদ্যাপি এখানে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহাদের মহিমা প্রকাশ করিতেছে। পাণি-পথ নামক স্থানটী বর্ত্তমান দিল্লী সহরের ৩০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত, অব-শিষ্ট দুই খণ্ড জমী যমুনা গর্ভে লীন হইয়াছে। এই পাণিপথের প্রকাণ্ড প্রান্তরে বারত্রয় সাংঘাতিক যুদ্ধের পর ভারতের উচ্চতর প্রদেশে ভাগ্য নিরূপিত হয়, পরে ইহার বিস্তৃত ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে।

যমুনা নদীর দক্ষিণ স্থানটী ইন্দ্রপ্রস্থ নামে বিখ্যাত, অর্থাৎ বর্ত্তমান দিল্লী সহর হইতে এই স্থান অন্যূন এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। সহর হইতে এই স্থানের শোভা দর্শন করিতে যাইবার সময় পাণ্ডবদিগের সেই প্রাচীন ধ্বংসাবশিষ্ট গৃহগুলি স্তূপাকারে ইষ্টকে পরিণত দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানের চতুর্দ্দিকে পাণ্ডবদিগের গড়বেষ্টিত পুরাতন কেল্লা ছিল, ঐ কেল্লাটী মুসলমানদিগের কৌশলে এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, পূর্ব্বে উহা হিন্দুরাজার কেল্লা ছিল বলিয়া কিছুমাত্র চিনিবার আশা নাই। বর্ত্তমান সহরে যথায় হুমায়ুন সমাধিক্ষেত্র অবস্থিত, প্রবাদ এই-রূপ—ঐ স্থানটী পূর্ব্বে তৃতীয় পাণ্ডব মহাবীর অর্জ্জুনের দুর্গ ছিল, আর সের-শা নামে যে রাজবাটী দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাণ্ডু পুত্রগণ, নারায়ণ এবং মহর্ষি ব্যাস কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেন, কিন্তু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এখানে যে স্থানে রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া-ছিলেন, তাহার কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত সন্ধান করিতে পারিলাম না। অব-গত হইলাম, সেই যজ্ঞ স্থানেই দিল্লী সহরটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মহাভারত পাঠে জানিতে পারা যায় যে, গঙ্গাতীরবর্ত্তী হস্তিনানগর ত্যাগ করিয়া পাণ্ডু পুত্রগণ পঞ্চ ভ্রাতায় এই স্থানে উপস্থিত হন, এবং নগর নির্ম্মাণ করিয়া উহাকে ইন্দ্রপ্রস্থ নামে প্রসিদ্ধ করেন, আবার এই ইন্দ্রপ্রস্থেই রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া যুধিষ্ঠির প্রথম রাজা হইয়াছিলেন।

কথিত আছে, পাণ্ডবদিগের পরবংশীয়েরা ৩০ পুরুষ পর্য্যন্ত এখানে নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কালক্রমে সেই প্রাচীন নগর এক্ষণে ইংরাজদিগের আমলে ভারতের রাজধানীরূপে পরিণত হইয়াছে। খ্রীষ্ট জন্মের প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতের ইতিহাসে দিল্লী নগরের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। ইহার পরেও কয়েকটী হিন্দু রাজবংশ এই নগরে থাকিয়া রাজত্ব করেন। চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে ধব নামে এক রাজা দিল্লীর লৌহস্তম্ভ স্থাপন করেন, এই স্তম্ভটীর ব্যাস ১৬ ইঞ্চি এবং উচ্চতায় ৫০ ফিট; তৎপরে বহুকাল পর্য্যন্ত নগরটী রাজাহীন অবস্থায় থাকায়, ইহা ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, শেষে ৭৩৬ খৃঃ মহাবীর অনঙ্গপাল নামক এক হিন্দু রাজা সেই ধ্বংস রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজারা এখান হইতে কনোজ নগরে গিয়া রাজ্য স্থাপন করেন।

কথিত আছে, ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদঘোরী পাণিপথের মহা যুদ্ধে পৃথ্বীরাজকে নিহত করিলে পর, তিনি কুতুবুদ্দিন নামক একজন সেনাপতিকে এই নবাবিষ্কৃত দেশের শাসন কর্ত্তারূপে নিযুক্ত করিয়া প্রস্থান করেন। কুতুবুদ্দিনের অবস্থানকালে এ নগরের অনেক শ্রীবৃদ্ধিসাধন হয়, এমন কি তিনি এক ক্ষমতাশালী রাজবংশ দিল্লীতে স্থাপন করিয়া আপন কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, এই হেতু দিল্লী তাঁহার নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী।

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এখানে যে ঘাটে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই ঘাটটী অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্যস্বরূপ বিরাজ করিতেছে। এক্ষণে ঐ ঘাটটী আগমবোড়ের ঘাট নামে খ্যাত। বাদশা সেরসা—এই ইন্দ্রপ্রস্থ নাম পরিবর্ত্তন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিজ নামানুসারে নগরটী সিয়ারগড়

নামে প্রচার করিয়াছিলেন,তথাপি সাধারণের নিকট উহা সেই প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ নামেই প্রসিদ্ধ আছে।

দিল্লীর কেল্লাটীর চারিদিকে গড়বেষ্টিত এবং যমুনা নদীর সহিত সংলগ্ন আছে। এই কেল্লা মধ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত বাদশাদিগের বিলাস-ভবন, মস্‌জিদ, বিচার গৃহ, ময়ূর-সিংহাসন, দেওয়ানীখানা প্রভৃতি শোভা পাইতেছে। দিল্লীতে যে সকল আশ্চর্য্য সুন্দর মারবেল প্রস্তরের উপর হীরা, মাণিক, মুক্তা এবং সোণা, রূপা প্রভৃতির সংযোগে প্যালেসটী অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত ছিল, এক্ষণে কালের কুটিলচক্রে—সেই সকল কক্ষে মূল্যবান পাথর সকল অপহৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে যথায় সেই সকল প্রীতিপ্রদ দৃশ্যাবলী শোভা পাইত, এক্ষণে ঐ সকল স্থান—ইংরাজদিগের কেল্লার সীমামধ্যে অবস্থান করিতেছে। এই কেল্লাটীর চারিদিকে চারিটী ফটক ভিন্ন ভিন্ন নামে আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে। কালের গতি কে রোধ করিতে পারে, বর্ত্তমানকালে সেই প্রাচীন হিন্দু বা মোগল সম্রাটদিগের কীর্ত্তি স্তম্ভে তাঁহাদের পরিবর্ত্তে এক্ষণে কেবল ইংরাজ সিপাহীগণ বিরাজ করিতেছেন। সে যাহা হউক, যাত্রীগণ এই প্যালেসের সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে ইচ্ছা করিলে—কেল্লার ইংরাজরাজপুরুষদিগের অনুমতি লইতে হয়। ঐ সকল রাজপুরুষগণ যাত্রীদিগের আবেদন পত্র পাইলেই বিনা আপত্তিতে ভিতরে প্রবেশ করিবার ছাড়পত্র দিয়া থাকেন। বলা-বাহুল্য, যে কর্ম্মচারীর এই ছাড়পত্র দিবার অধিকার আছে, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলে, তিনি শীঘ্র ইহা বাহির করিয়া দিয়া থাকেন।

মহাপ্রতাপশালী স্বনামখ্যাত ডুলুরাজার রাজত্বকালে—তাঁহার নামানুসারে এই নগরটীর নাম দিল্লী হইয়াছে।

দিল্লী সহরের এক স্থানে একটী বৃহৎ কূপ দেখিতে পাওয়া যায়

ঐ কূপটী "নিজাম-উদ্দীন কূপ" নামে প্রসিদ্ধ। প্রতি বৎসর মুসলমানেরা দলে দলে এই স্থানে আসিয়া সম্রাট নিজামের আত্মার মঙ্গল কামনা করিয়া একটী মেলা বসান এবং উক্ত কূপে স্নান করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিয়া থাকেন।

দিল্লী সহরের ফিরোজাবাদ নামক পল্লীমধ্যে ২০টী রাজবাটী, ১০টী মনুমেণ্ট এবং পাঁচটী প্রসিদ্ধ মস্‌জিদ আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে। সহরের যে অংশ "সাতপুলের বাঁধ" নামে খ্যাত। কথিত আছে, মহাবীর তৈমুরলঙ্গ দিল্লীতে আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য এই স্থান আক্রমণ করিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণনাশ এবং বিস্তর সুসজ্জিত অট্টালিকাগুলি ধ্বংস করিয়া ঐ সকল অট্টালিকার ভিতরকার বহু মূল্য দ্রব্য-সামগ্রীগুলি লুণ্ঠন করিয়া আপন জয় ঘোষণা করেন। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, তৈমুরের অত্যাচারের পর এই নগরটী সেরশাহের পুত্র মহম্মদ সলিমান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এই স্থানেই বাদশা ঔরঙ্গজেবের আদেশে মোরাদ এবং দারার পুত্র অবরুদ্ধ থাকেন; এই স্থানই ভারতের রঙ্গভূমি নামে খ্যাত, অর্থাৎ এই নির্দ্দিষ্ট স্থানেই মোগল পাঠান এবং হিন্দু রাজগণ অনেক রঙ্গখেলাই দেখাইয়া গিয়াছেন।

সাতপুরার সন্নিকটে "হুমায়ুন টুম্ব" নামে একটী অত্যাশ্চর্য্য সুশোভিত প্রকাণ্ড মস্‌জিদ আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে। প্রবাদ এইরূপ—এই জগদ্বিখ্যাত মস্‌জিদটী নির্ম্মাণ করিতে সম্রাট অকাতরে অতি কম ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। মস্‌জিদের মধ্যস্থলে সম্রাট হুমায়ুনের প্রিয় বেগম হামিদাভানু ও দারার কবর অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, এতদ্ভিন্ন ফেরোজশা, জাহান্দারশা প্রভৃতি অনেকগুলি নামজাদা বাদশাগণেরও কবর এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। যে সম্রাট ফেরোজশার রাজত্বকালে—ইংরাজেরা ভারতবর্ষ মধ্যে স্বাধীনভাবে

বাণিজ্য করিবার সানন্দ প্রাপ্ত হন, সেই ফেরোজশার মসজিদটীর শোভা লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করা অসাধ্য। কথিত আছে, বাদশা হুমা-য়ুন এরূপ কঠিনভাবে তাঁহার রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন যে, অদ্যাপি বঙ্গবাসীরা "ঐ হুমো আস্‌ছে" বলিয়া তাঁহাদের সন্তান সন্ততীদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত সেই জগদ্বিখ্যাত হুমায়ুন মস্‌জিদের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল।

ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহারাজ পৃথ্বীরাজের রাজত্ব-কালে এখানে ২৭টী প্রসিদ্ধ হিন্দু দেবদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল; কালের কুটিল পরিবর্ত্তনে সে সমুদয়ই এক্ষণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া ঐ পবিত্র স্থানটী "ভূতখানা" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে সেই প্রাচীন ভূত-খানার ভিতর স্থানে স্থানে—নারায়ণ, ইন্দ্র এবং ব্রহ্মার পবিত্র বিগ্রহ মূর্ত্তির দর্শন পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান দিল্লীর অপর নাম "সাত-কেল্লা-সহর"। অদ্যাপি সহরের যে অংশে ৫২টী গেট ও ৭টী কেল্লা বিরাজ করিতেছে, সেই স্থানই 'সাত-কেল্লা-সহর নামে প্রসিদ্ধ।

দিল্লীর ইতিহাস

অতি প্রাচীনকালে আর্য্যেরা এই স্থানে অবস্থান করিয়া ভারতে সভ্যতা বিস্তার করেন। বর্ত্তমান দিল্লী সহরের চতুষ্পার্শ্বে কেবল সেই সকল প্রাচীন ভাঙ্গা বাড়ী ও ইটপাথর পতিত অবস্থায় থাকিয়া অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তৈমুরলেনের ভারত-বিজয় বৃত্তান্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্বয়ং তৈমুর বহু সংখ্যক তাতার সৈন্য লইয়া ১৩৯০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ জয় করিতে উপস্থিত হন। কুতুবুদ্দিনের

[২১২ পৃষ্ঠা।

দিল্লীর হুমায়ন মস্‌জিদের দৃশ্য।

আমলে যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই রাজবংশের মধ্যে মহম্মদ টোগলকের রাজত্বকালে—তিনি দিল্লীনগরের প্রসিদ্ধ প্রাচীরের সন্নিকটেই মহম্মদ টোগলককে সসৈন্যে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজধানীতে প্রবেশ করেন এবং বন্ধুবান্ধবসহ তথায় আমোদপ্রমোদে রত থাকেন, এদিকে তাঁহার বিজয়ী-সৈন্যেরা ক্রমাগত একাধিকক্রমে পাঁচদিন নগর লুঠপাট ও গ্রামবাসীদিগকে বধ করিতে থাকে। কথিত আছে, এই সকল বিজয়ী উন্মত্ত সৈন্যেরা এখানে এত নরহত্যা করিয়াছিল যে, ঐ সকল মৃতদিগের কেবল ছিন্ন মস্তক দ্বারা এক প্রকাণ্ড স্তূপে পরিণত হইয়াছিল। তৎপরে তৈমুর-সসৈন্যে মিরাট দখল করিয়া তথাকার পুরুষ লোকদিগকে জীবন্ত অবস্থায় তাড়াইয়া দিয়া কেবল সুন্দরী যুবতী ও পুত্রগণকে দাস করিয়া লইয়া যান, অধিকন্তু প্রত্যাবর্ত্তনকালে নগরের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া এবং চতুর্দ্দিকে আগুন দিয়া নগরটী ভস্মাবশেষ করিয়া প্রস্থান করেন।

তৈমুরবংশীয় মোগল সম্রাট বাবর—পাণিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিমের লোকদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, এই দিল্লীনগরে প্রবেশ করেন। বাবরের রাজধানী সেই সময় আগ্রা নগরে ছিল, সুতরাং তাঁহার পুত্র হুমায়ুন দিল্লীনগরে রাজ্য স্থাপনপূর্ব্বক বসবাস করিতে থাকেন, শেষে এই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সম্রাট হুমায়ুন জীবিতাবস্থায় এক উদ্যান মধ্যে আগ্রার তাজমহলের অনুকরণীয় আপন পছন্দানুযায়ী এক সুন্দর সমাধি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য, ঐ সমাধিতেই তাঁহাকে কবর দেওয়া হয়। যাত্রীগণ অদ্যাপি এখানে উপস্থিত হইয়া এই সমাধির শোভা দর্শন করিয়া থাকেন। সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীর সচরাচর আগ্রা, লাহোর ও আজমীরে বাস করিতেন, সুতরাং সাজেহান নামে এক ব্যক্তি দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। এক্ষণে যে

ভাবের দিল্লী আমাদের নয়নপথে পতিত হয়, উহা সেই সাজেহান শাহার আমলেই নির্ম্মিত। নগরের চারিদিকের প্রাচীর ও দুর্গ তাঁহারই দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ১৩ বৎসরের মধ্যে আফগান জাতীয় লোকেরা পাঁচবার প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া দিল্লী ও তন্নিকটবর্ত্তী যাবতীয় অঞ্চলগুলি অধিকার করিয়া লন। এই যুদ্ধে যেরূপ নিষ্ঠুরভাবে হত্যাকাণ্ড ও রক্তপাত হয়, এমন আর কোন স্থানে কখন হয় নাই। কথিত আছে, এবারকার আক্রমণকালে—দিল্লীবাসীরা নিরুপায় হইয়া আফগনদিগকে অতিথিরূপে গ্রহণ করিয়া নগরের দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন—তথাপি নির্দ্দয় আফগানেরা কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া ঐ সকল নিঃসহায় লোকদিগের উপর অতি পাশবোচিত ব্যবহার করিয়াছিল, বিশেষতঃ আফগান অশ্বারোহীরা কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, কি দরিদ্র সকলকেই মনের সাধে বিনাশ, গৃহ লুণ্ঠন ও গ্রাম সকল দগ্ধ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়—হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থ স্থান সকল নষ্ট করাই তাহাদের প্রিয় কার্য্য হইয়াছিল।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইবার পর ১৭৮৮ খৃঃ মহারাষ্ট্রীয়েরা বাহুবলের পরিচয় দিয়া এই সকল অত্যাচারী আফগানদিগের নিকট হইতে দিল্লী নগর অধিকার করিয়া লন, এই সময় মোগল সম্রাট— সিন্ধিয়ার মহারাষ্ট্রীয় রাজার আদেশে বন্দী হইয়া থাকেন। এইরূপ জয় পরাজয়ের পর শেষ ১৮০৩ সালে ইংরাজেরা দিল্লী নগরটী অধিকার করিয়া লন। ইংরাজদিগের অধীনে দিল্লীবাসীরা নির্ব্বিঘ্নে পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাল শান্তিসুখ উপভোগ করেন। তৎপরে ১৮৫৭ খৃঃ মে মাসে সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে মিরাট হইতে দলে দলে বিদ্রোহীরা দিল্লী সহরে প্রবেশ করতঃ ইউরোপীয় স্ত্রী, পুরুষ, বালক ও

বালিকাদিগকে অতি নিষ্ঠুরভাবে বিনাশ করে, ঠিক ইহার দুই-তিন মাস পরে ইংরাজেরা নগরটী পুনর্ব্বার অধিকার করিয়া বিদ্রোহীদিগের সাহায্যকারী মোগল সম্রাটকে রেঙ্গুণে নির্ব্বাসিত করিয়া পূর্ব্ব শোকের শান্তিলাভ করেন। কথিত আছে, ১৮৮৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারত-সম্রাজ্ঞী বলিয়া এই দিল্লী নগরে ঘোষণা করা হয়।

বর্ত্তমান দিল্লী সহর—যে অংশে দেশীয় লোকের বাস, সে অংশের অধিকাংশ বাটী ইষ্টক নির্ম্মিত হইলেও ভাল মালমসলায় প্রস্তুত বলিয়া অনুমান হয়। রাস্তাগুলি ছোট ছোট, অতিশয় সঙ্কীর্ণ ও বক্রভাব, কিন্তু রাজপথগুলি পরিষ্কার, প্রশস্ত ও আনন্দদায়ক। এখানকার চক-বাজারে প্রবেশ করিলে কত প্রকার যে অদ্ভুত সুন্দর সুন্দর দ্রব্য-সামগ্রী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই। সহরের স্থানে স্থানে রাস্তার উপরিভাগে পাঞ্জাবী, দিল্লীবাসী বা পসারীর দোকান সকল এবং আঙ্গুর, কিস্‌মিস্‌, পেস্তা, সারদল, নাশপাতি, আপেল প্রভৃতির আমদানী থাকায় সকল দ্রব্যই সস্তা দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, এ সহরে যে সকল মৃণ্ময় হাড়ী প্রস্তুত হয়, উহাতে বঙ্গবাসী-দিগের রসুই করিবার বড় অসুবিধা। কারণ ইহার তলদেশ এত পুরু যে, দুই পয়সার কাষ্ঠ না জ্বালাইলে উহা উষ্ণ হয় না।

জুম্মা মসজিদ

দিল্লীর জুম্মা মস্‌জিদের ন্যায় প্রকাণ্ড মস্‌জিদ ভারতবর্ষ মধ্যে আর দ্বিতীয় নাই। আমরা শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথদেবের মন্দিরকে যেরূপ ভক্তির চক্ষে দর্শন করিয়া থাকি, মুসলমানেরা সেইরূপ এখানকার এই জুম্মা মস্‌জিদকে ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। জুম্মা মস্‌জিদ অর্থাৎ

আল্লার মস্‌জিদ। এই মস্‌জিদটী সমস্তই শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহা আগ্রার তাজমহল অপেক্ষা নীচু, কিন্তু দিল্লী সহরের যাবতীয় অট্টালিকা অপেক্ষা উচ্চ। মস্‌জিদটী লম্বে ২০১ ফিট এবং প্রস্থে ১২০ ফিট। ইহার মস্তকে তিনটী গিল্টী করা লাল ও কাল পাথরের সুসজ্জিত স্তম্ভ শোভা পাইতেছে। কথিত আছে, এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ করিতে দশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

লালকোট

দ্বিতীয় অনঙ্গপালের রাজত্বকালে, এই লালকোট নামক দুর্গটী প্রস্তুত হয়। ইহার পরিধি আড়াই মাইল, ৬০ ফিট উচ্চ প্রাচীর এবং চতুর্দ্দিক গড়বেষ্টিত ছিল, এক্ষণে ইহার তিনদিকের গড় বর্ত্তমান আছে, তাহাতে আবার অনেকগুলি গেট দেখিতে পাওয়া যায়; এই সকল ফটকের মধ্যে পশ্চিমদিকের গেটটী "রণজিৎ গেট" নামে খ্যাত।

অনঙ্গপাল দিঘী

লালকোটের সন্নিকটে এই বৃহৎ দিঘীটী অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া তোমরবংশীয় মহারাজ অনঙ্গপালের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। দিঘীটী লম্বে অন্যূন ১৬৯ ফিট এবং ১৫২ ফিট গভীর। কথিত আছে, মহারাজ দ্বিতীয় অনঙ্গপালের পুত্রের রাজত্বকালে যখন ৭৩৬ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ-ঘোরী দিল্লীনগর আক্রমণ করেন, সেই সময় রাজা সপরিবারে এই অজেয় লালকোট নামক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করিয়াছিলেন। অদ্যাপি সাধারণে ঐ কেল্লাটীকে "চোহান রাজপুত শ্রেষ্ঠ রায় পৃথ্বীরাজের কেল্লা" বলিয়া প্রকাশ করেন।

দিল্লীর চক

এখানকার এই চকবাজার—এক অপূর্ব্ব দৃশ্য ! কেন না, যে দিল্লী সুন্দরী বাইজীদিগের সুললিত কণ্ঠস্বরের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ। এই স্থানের প্রশস্ত রাজপথের উভয় পার্শ্বে সেই সকল সুন্দরীরা অবস্থান করেন। চকবাজারে স্তূপাকারে আঙ্গুর, কিস্‌মিস্‌, পেস্তা, সরদাল, নাশপাতি, আপেল প্রভৃতি মেওয়া সকল তাজা ও বৃহদাকার এবং অল্প মূল্যে খরিদ করিতে পাওয়া যায়। আমরা এই চকবাজারের শোভা সৌন্দর্য্য দর্শন করিবার সময় এখানকার "দিল্লীকা লাড্ডু" খরিদ করিয়া তাহার আস্বাদে তৃপ্তিলাভপূর্ব্বক পাঠক সমাজে প্রকাশ না করিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না। লাড্ডুগুলির উপরিভাগটী দেখিতে ঠিক যেন ক্ষীরের নাড়ুর মত, কিন্তু ভিতরে একপ্রকার কাষ্ঠের গুড়ার মত—তাহার আস্বাদ কটু।

কুতুবমিনার

এই অত্যুচ্চ ভুবনবিখ্যাত মিনারটী পাণ্ডুবংশীয় এক রাজা তাঁহার কন্যার অনুরোধে—ইহার উপর হইতে সূর্য্যোদয়ের সময় গঙ্গাদেবীকে দর্শন ও উপাসনা করিবার অভিপ্রায়ে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই মিনারের উত্তরদিকের দ্বারগুলি অনেকটা হিন্দুদিগের প্রণালীতে প্রস্তুত, অদ্যাপি উহা দেখিলেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে এক স্থানে একটী ঘণ্টা আছে, ঐ ঘণ্টা দেখিয়া ইহাকে হিন্দু নির্ম্মিত বলিয়া অনুমান হয়। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ভূমিকম্পের সময় মিনারের চূড়াটী ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তৎপরে সম্রাট

কুতব ইস্‌লামের রাজত্বকালে সেই মিনার আবার সংস্কৃত হইলে ইহার সৌন্দর্য্য এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, ইহাকে হিন্দুনির্ম্মিত বলিয়া কিছুতেই অনুমান করিতে পারা যায় না। এই জগদ্বিখ্যাত মিনারের উচ্চতা ১৫২ হাত এবং পরিধি অন্যূন ৯৮ হাত। ইহার মধ্যে বিবিধ রঙ্গের যে পাঁচটী থাক আছে ঐ সকল থাক এক-একটী কক্ষে পরিণত, আবার এই সকল কক্ষগুলির মধ্যে কোনটী কোণবিশিষ্ট, কোনটী অৰ্দ্ধ চন্দ্রা-কার, কোনটী বা সম্পূর্ণ অৰ্দ্ধ চক্রাকার, কোনটী বা গোলাকার দেখিতে পাওয়া যায় মিনারের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিতে সমতলভূমি হইতে ৩৭৬টী সোপান অতিক্রম করিতে হয়। বর্ত্তমান দিল্লী সহরের পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণদিকে এই মিনারটী অবস্থিত। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত এই অত্যুচ্চ মিনারের একটী চিত্র প্রদত্ত হইল।

আমার ন্যায় সল্প সময়ের ভ্রমণকারী এবং সল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারা দিল্লী সহরের বর্ণনা অসাধ্য, তবে ইহারই মধ্যে যে সকল স্থান দর্শন করিয়াছি, উহাই সংক্ষেপে প্রকাশ করিলাম।

এ সহরের চৌক নামক স্থানটী অতি প্রশস্ত ও রমণীয়। ইহার মধ্যমস্থলের উভয় পার্শ্বে তরুরাজিশোভিত সুন্দর পথ। বাদশাহের সওয়ারি বাহির হইবার উপযুক্তই পথ। নিকটেই মলকা-বাগ নামে মহিষীর একটী উদ্যান, তন্মধ্যে বিচিত্র চিত্র শালিকা প্রতিষ্ঠিত রহি-য়াছে। এই গৃহে দিল্লীশ্বরের ময়ূর আসনের শিরঃ শোভাকারী একটী ক্ষুদ্র ময়ূর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে দিল্লী সহরের শোভা সন্দর্শন করিয়া আমরা এখান হইতে কুরুক্ষেত্র যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।
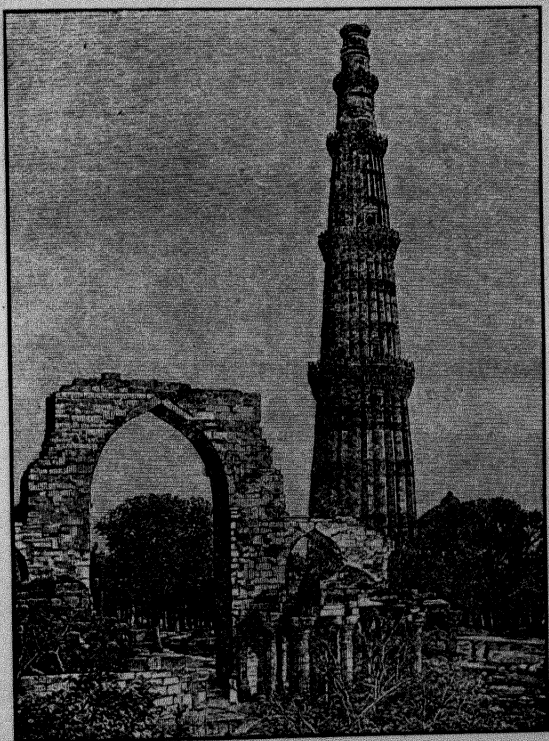
কুতুব মিনারের দৃশ্য।

[২১৮ পৃষ্ঠা।

কলিকাতা প্রেস।
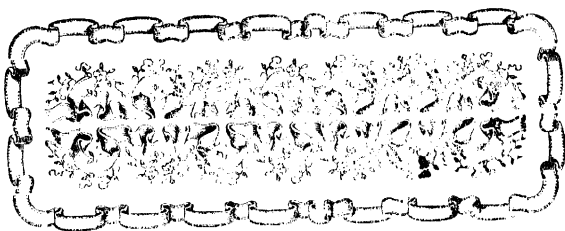
কুরুক্ষেত্র

কুরুক্ষেত্র—যে ক্ষেত্রে "কুরু"। কুরু অর্থাৎ "কর", "কর" এর প্রতিনিয়ত ধ্বনি—তাহাকেই কুরুক্ষেত্র বলে।

বিরাট পুরুষ "শ্রীকৃষ্ণ" রূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণে এমন একটী অপূর্ব্ব লীলা দেখাইয়া গিয়াছেন, যাহা প্রত্যেক পরমাণুতে ব্যষ্টিভাবে এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে সমষ্টিভাবে অভিনীত হইতেছে। জীব—ধীরে ধীরে যে প্রকারে মুক্তির দিকে অগ্রসর হয় বা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যে প্রকারে মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছে—সাধকপ্রবর অর্জ্জুনকে "শ্রীকৃষ্ণ" কুরুক্ষেত্ররূপ রণাঙ্গণে তাহারই একখানি আদর্শ ছবি দেখাইয়া গিয়াছেন।

দিল্লী হইতে কুরুক্ষেত্র নামক তীর্থ স্থান দর্শনার্থ যাইতে হইলে, ই, আই রেলযোগে আম্বালা ষ্টেশনে উপস্থিত হইতে হয়।

অম্বালা নগরে অনেক গোরা এবং দেশীয় পল্টন আছে। দিল্লী হইতে অম্বালা—রেলপথে ৬৮ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে এই নগরটী ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের হস্তগত হওয়ার পর তাঁহাদের কৃপায় প্রজারা শান্তিসুখ অনুভব করিতেছেন। অম্বালার উত্তর-পশ্চিমে শতদ্রু নামক নদীতীরে প্রসিদ্ধ স্থান—লুধিয়ানা। এখানকার তৈয়ারী শাল জগদ্বিখ্যাত। পূর্ব্বে এই নগরের নিকটস্থ স্থানে শিখ ও ইংরাজদিগের

সহিত তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল, এ যুদ্ধে উভয়পক্ষেরই বিস্তর ক্ষতি হয়। কথিত আছে, ভারতবর্ষের মধ্যে এরূপ সাহসী শত্রুর সঙ্গে ইংরাজদিগকে আর কখন যুদ্ধ করিতে হয় নাই, কিন্তু সেই অসমসাহসী শিখজাতি এক্ষণে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অতি বিশ্বস্ত প্রজা। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহকালে এই জাতি ইংরাজদিগের অনেক উপকার করিয়াছিল।

অম্বালা ষ্টেশন হইতে ভিন্ন ব্রাঞ্চ লাইনে থানেশ্বর নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হইবে। থানেশ্বর ষ্টেশন হইতে কুরুক্ষেত্র নামক ক্ষুদ্র সহরটী দেড় মাইল দূরে অবস্থিত। এই দেড় মাইল পথ গাড়ী বা একার সাহায্যে যাইতে হয়। প্রসিদ্ধ পাণিপথ নামক নগরের দ্বাদশ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে থানেশ্বর গ্রামটী অবস্থিত। কুরুক্ষেত্রের বিখ্যাত স্থাণু তীর্থ হইতে এই নগরের নাম থানেশ্বর হইয়াছে। কথিত আছে, কুরুপাণ্ডবের মহাযুদ্ধে—ভারত প্রায় বীরশূন্য হইয়াছিল। থানেশ্বর ষ্টেশনের অনতিদূরে কুরুপাণ্ডবের নির্দ্দিষ্ট রণভূমির বালুকারাশি ক্ষত্রিয় বীরগণের রক্তস্রোতে লালবর্ণ রূপ ধারণ করিয়া অদ্যাপি অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্যস্বরূপ বিরাজ করিতেছে।

থানেশ্বর ষ্টেশন হইতে নগরে প্রবেশ করিবার সময় পথিমধ্যে ভীষ্মদেবের শরশয্যা স্থান ও পাণ্ডুমহিষী—কুন্তীদেবীর প্রতিষ্ঠিত শিবালয় দর্শন করিবেন। এই শিবালয়ের সন্নিকটে এক হ্রদ দেখিতে পাওয়া যায়; প্রবাদ এইরূপ—কুরুরাজ দুর্য্যোধন পঞ্চপাণ্ডবদের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া এই হ্রদ মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া আত্মরক্ষা করিতেছিলেন।

কুরুক্ষেত্র—ত্রিলোকপূজ্য, প্রাচীন, প্রশস্ত পবিত্র তীর্থ বলিয়া কথিত। এই তীর্থে শুদ্ধচিত্তে গমন করিলে স্থান মাহাত্ম্যগুণে সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এ তীর্থের মাহাত্ম্য এত অধিক যে,

দ কোন ব্যক্তি ভক্তিসহকারে এই পবিত্র স্থানে যাইবার অভিলাষ রেন, তাহা হইলেও অন্তিমে তিনি সকল পাপ হইতে পরিত্রাণ াইয়া স্বর্গে পুণ্যাত্মাদিগের সহিত স্থানপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন এই দবতুল্য স্থানের তুলনা রহিত, প্রমাণস্বরূপ দেখুন—সকল মন্ত্র উচ্চারণ রিবার পূর্ব্বে "কুরুক্ষেত্র" এই পবিত্র নাম প্রথমেই উচ্চারিত হইয়া াকে, এমন কি ইহার বায়ুবিক্ষিপ্ত ধূলিরাশি ও দুষ্কৃতকর্ম্মাকে পরম পদ প্রদান করিতে সমর্থ হয়। পরমপদ শ্রীহরির কৃপা ব্যতীত এই স্থান র্শনলাভ দুরূহ। কথিত আছে, শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এখানে ত্রিরাত্র বাস করিলে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। উত্তরে সর-স্বতী, দক্ষিণে দৃষদ্বতী, এই উভয় পুণ্যতোয়া নদীর মধ্যস্থলে কুরুক্ষেত্র তীর্থ স্থানটী অবস্থিত। এই ত্রিলোকপূজ্য কুরুক্ষেত্রের মাহাত্ম্য অবগত হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ, ঋষিগণ, চারণগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরাগণ, যক্ষগণ ও পন্নগগণ সতত আসিয়া ইহার পূজার্চ্চনা করিয়া থাকেন।

কুরুক্ষেত্রে—ছোট বড় অনেকগুলি তীর্থ বিরাজিত, তন্মধ্যে অগ্নিতীর্থ, অমৃত-কূপ, অরুণা, (অরুণা ও সরস্বতীর সঙ্গম স্থানই অরুণা সঙ্গম নামে খ্যাত) ইন্দ্রবারি, ওঘবতী, উশনস, কাম্যক-বন, কৌবের তীর্থ, কৌশকীসঙ্গম, (কৌশকী ও দৃষদ্বতীর সঙ্গম স্থান কৌশকীসঙ্গম নামে বিখ্যাত) তৈজস-তীর্থ, দধিচী-তীর্থ, পঞ্চবটী-তীর্থ, মাতৃ তীর্থ, যযাতি-তীর্থ, দেবীপাচন-তীর্থ, বিষ্ণুপদ-তীর্থ প্রভৃতি তীর্থ সকল প্রসিদ্ধ।

থানেশ্বরের বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে একটী বৃহৎ দিঘী আছে। ইহার চতুর্দ্দিক বাঁধান সোপানশ্রেণীবিশিষ্ট, দিঘীর মধ্যস্থলে এক চতুষ্কোণা-কৃত দ্বীপ, ঐ দ্বীপের উপরিভাগে মহাবীর মোগল সম্রাটের নির্ম্মিত এক দুর্গ বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিতেছে। এই দুর্গে যাই-বার জন্য উত্তর ও পশ্চিম দুইদিকে দুইটী সেতু আছে। দিঘীর পশ্চিম

পার্শ্বে চন্দ্রকূপ নামে আবার একটী পবিত্র তড়াগ দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্যগ্রহণকালে ভারতের নানা স্থান হইতে নানা জাতীয় হিন্দুরা ইহাতে মুক্তিকামনা করিয়া স্নান, দান ও পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। কথিত আছে, এই গ্রহণকালে ভারতের যাবতীয় তীর্থ সকল এখানে আসিয়া উপস্থিত হন, সুতরাং ঐ সময় এখানে স্নান করিলে বহু পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে। কুরুক্ষেত্রে অজাযুথ ঘাট হইতে রত্নযক্ষ পর্য্যন্ত এই প্রশস্ত ছয় মাইল স্থানের মধ্যে ৯১টী তীর্থ বর্ত্তমান আছে। এ তীর্থে উপস্থিত হইয়া নিয়ম সকল যথানিয়মে পালন করিয়া দক্ষিণাসহ ব্রাহ্মণ ভোজন এবং তীর্থগুরুর নিকট সুফল লইয়া গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিতে হয়।

বীরপ্রকৃতি শিখজাতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ;—

ইংরাজদিগের রাজত্ব হইবার পূর্ব্বে শিখজাতি পাঞ্জাবের শাসন কর্ত্তারূপে বিরাজ করিতেছিলেন। শিখ—শিষ্য শব্দের অপভ্রংশ, অর্থাৎ এই জাতি আপনাদিগকে শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া গুরুভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন।

লাহোরের সন্নিকটে শিখজাতির স্থাপনকর্ত্তা নানকের ১৪৬৯ খৃঃ জন্ম হয়। তিনি ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। নানক তীর্থ পর্য্যটন করিতে অতিশয় ভালবাসিতেন, এমন কি তিনি হিন্দু হইয়া মুসলমানদিগের পবিত্র স্থান "মক্কা" পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই মক্কায় অবস্থানকালে একদা নানক সরিপের দিকে আপন চরণ প্রশস্তপূর্ব্বক শয়ন করিলে, স্থানীয় ফকিরেরা তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া-

ছিল বলিয়া তিনি মিষ্টবাক্যে তাহাদিগকে বুঝাইলেন, "ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী—অতএব তোমরা আমায় শিক্ষা দাও, মনুষ্য আপন পা কোনদিকে প্রশস্তপূর্ব্বক শয়ন করিবে।" তাঁহার এই প্রশ্নের কেহ উত্তর দিতে না পারিয়া নানককে সিদ্ধ পুরুষ জানিয়া ভক্তি করিতে লাগিলেন।

১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে সেই দেশপূজ্য নানক সত্তর বৎসর বয়সে ইহলীলা সম্বরণ করেন। এই সময় দশম গুরু "গোবিন্দের" যত্নে শিখেরা অসমসাহসী এবং যুদ্ধপ্রিয় হইয়া উঠে। শিখশ্রেষ্ঠ গুরু—গোবিন্দ শিষ্যদিগের মধ্যে জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া তাহাদের নামের পর "সিং" উপাধির ব্যবস্থা করেন, তাঁহারই আদেশে শিখেরা ছোট ছোট পা জামা পরিধান করেন এবং সতত সঙ্গে তরবারি রাখেন। এই শিখগুরু "গোবিন্দ" সদাসর্ব্বদা যুদ্ধে ব্যস্ত থাকিতেন এবং তাঁহার অধীনস্থ শিষ্যদিগকে এই বলিয়া উপদেশ দিতেন, "আমার রচিত যে গ্রন্থ বর্ত্তমান থাকিবে—আমার মৃত্যু হইলে তোমরা যেখানেই থাক না কেন, অপর কাহাকেও গুরুপদে নিযুক্ত না করিয়া এই গ্রন্থখানিকে গুরু বলিয়া মান্য করিবে। তোমাদের কোন কিছু আবশ্যক হইলে—এই গ্রন্থেই তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দিবে। এক্ষণে সেই গুরুজীর অবর্ত্তমানে শিখেরা ঐ গ্রন্থখানিকেই মানিয়া চলিতেছেন। এই গ্রন্থখানিতে অন্যূন ৩৫ জন শিক্ষিত প্রাচীন ব্যক্তির উপদেশগুলি সুশৃঙ্খলভাবে সন্নিবেশিত আছে।

শিখেরা আপনাদের ধর্ম্মে—প্রতিমা পূজা নিষিদ্ধ বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা ধর্ম্মগ্রন্থের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করতঃ তাহাকে কাপড় পরান, নানা সাজে সজ্জিত করেন, এমন কি ঐ মূর্ত্তিটাকে হিন্দুদিগের শালগ্রাম মূর্ত্তির ন্যায় ভক্তিসহকারে পূজার্চ্চনা করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে শিখেরা জাতিভেদ মানিত না, কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা জাতিভেদ বিচার করিয়া থাকেন এবং অনেক বিষয়ে হিন্দুদিগের আচার-

ব্যবহারের অনুকরণ করিয়া থাকেন। শিখেদের মতে গাভী দেবতা বিশেষ. এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বে তাঁহারা—পাঞ্জাবে স্ত্রীহত্যা অপেক্ষা গোহত্যা অধিকতর দোষ বলিয়া গণ্য করিতেন। মুসলমান-দিগের সহিত শত্রুতাই ইহার প্রধান কারণ; প্রমাণস্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, মুসলমানেরা কোন শিখদিগের অধিকৃত স্থান দখল করিলে জয় চিহ্নস্বরূপ ঐ স্থানে গোহত্যা করিয়া থাকেন, আর শিখেরা কোন মুসলমানদিগের স্থান অধিকার করিলে সুযোগমত তাঁহারা মুসলমান-দিগের মস্‌জিদে শূকর হত্যা করিয়া আপনাদিগের জয় ঘোষণা করিয়া থাকেন। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যায়, শিখজাতির স্থাপনকর্ত্তা মহাত্মা নানকের উপদেশ—এক্ষণে হিতে বিপরীত হইয়াছে।

শিখগুরু "গোবিন্দ"জীউর শিষ্যের সংখ্যা অন্যূন ১৮ লক্ষ। ইহারা গুরুর উপদেশ মত অবাধে মদ্যপান করিয়া থাকেন, কিন্তু তামাক খান না; কারণ তাঁহাদের মতে তামাক খাইলে জীবনে যে সমস্ত ধর্ম্ম উপা-র্জ্জন করিয়াছেন, তামাক খাইলে ঐ সমস্ত পুণ্য কর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়। এই অসংখ্য শিখদিগের মধ্যে আবার এক দল উদাসীন সম্প্রদায় আছেন। ইহারা অকালি নামে প্রসিদ্ধ। অকালিরা—ভগবান স্বয়ম্ভু-দেবের উপাসক। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা মাথার পাগড়ীর উপর ইস্পাতের চক্র রাখিয়া থাকেন, সময় মত উহা অস্ত্রের ন্যায় ব্যবহারও করিয়া থাকেন। শিখধর্ম্ম বিরোধীদিগের প্রাণবধ করাই তাঁহাদের মতে অতি পুণ্য কর্ম্ম।

পুরাকালে কুরুদিগের রাজত্বকালে এই থানেশ্বরে অতুল সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। তৎপরে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে এই স্থান বীরশূন্য হইলে—হিন্দুস্থানের অতুল ধনৈশ্বর্য্যই হিন্দুজাতির কালস্বরূপ হইল। কেন না, ধর্ম্মান্ধ মুসলমানবীর সুলতান মামুদ পৌত্তলিক দ্বেষী ছিলেন—তিনি

হিন্দুস্থানের বিশ্রুতবিভব সম্পদ শ্রবণ করিলে—একে একে ঐ সমস্ত স্থান যথা ; থানেশ্বর, কনোজ, মথুরা, আজমীঢ়, সোমনাথ প্রভৃতি সহর-গুলির শিল্পনৈপুণ্যালঙ্কৃত মণিমাণিক্যমণ্ডিত আনন্দ কোলাহল মুখরিত অমরাবতী তুল্য শোভা দর্শন করিয়া লুণ্ঠন ও ধ্বংসপূর্ব্বক প্রাচীন হিন্দু কীর্ত্তিগুলি লোপ করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় হিন্দুগণ এই আক্রমণকারীর করাল হস্ত হইতে ধন, মান এবং প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর "ধর্ম্ম" রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। এই দেববিগ্রহ ভঙ্গকারীর ভয়ে এক সময় ভারতভূমি কম্পান্বিতকলেবরা হইয়া উঠিয়াছিল, কারণ তাঁহার অত্যাচারে ও প্রতাপে হিন্দুস্থানের পবিত্র মৃত্তিকা কোটি কোটি ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর রক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল।

সুলতান মামুদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ;—

সুলতান মামুদ—আফগানখণ্ডের গজনির সুলতান ছিলেন। বোগদাদের কালিফারা ইঁহাকেই গজনির প্রধান স্বাধীন সুলতান বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন। কথিত আছে, যেদিন মামুদের জন্ম হয়, সেইদিন রাত্রিকালে সিন্ধুনদতীরবর্ত্তী পুরুষপুরের (বর্ত্তমান পেশোয়ার) দেবমন্দির অকস্মাৎ ভূমিস্যাৎ হয়। এই অত্যাশ্চর্য্য দৈবঘটনায় বিধাতার কার্য্য কারণ সংঘটনের প্রকৃষ্ট প্রমাণ, অর্থাৎ কালে যে এই বালক হিন্দুস্থানের অসংখ্য দেবমন্দির ধ্বংস করিবে, বিধাতা সেইজন্যই তাহার জন্মদিনে অনুসূচিত করিয়া রাখিলেন।

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, মহাবীর মামুদ জীবনের শেষ দশায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া এইরূপ অনুতাপ করিয়াছিলেন যে—আমি এই বিপুল ধনরত্ন, অশ্ব, গজ, সম্পদ বিভব সংগ্রহ করিবার জন্য সহস্র সহস্র নিরীহ জাতিকে চিরঅধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছি, কত শত

সাধ্বী নারীকে পরপুরুষের অঙ্কশায়িনী করিয়াছি, অসংখ্য হিন্দু সন্তানকে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু দিব্যচক্ষে এক্ষণে আমি দেখিতেছি, এই অন্তিম সময়ে ইহার কিছুই ত আমার সঙ্গে যাইতেছে না।"

মামুদ নিজমুখেই প্রকাশ করিয়াছিলেন—'আমি ভারতবর্ষে বিংশতি সহস্র দেবমূর্ত্তি ভঙ্গ করিয়া কোটি সুবর্ণ মুদ্রা ও অগণিত মণি-মাণিক্য লুণ্ঠন করিয়াছি। বলাবাহুল্য, সুলতান মামুদ একা—হিন্দু জাতির এবং হিন্দু স্থানের যেরূপ সর্ব্বনাশসাধন করিয়া গিয়াছেন, এরূপ অপর কেহ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। কত শত সহস্র বর্ষের সঞ্চিত অপরিমেয় ধনরাশি ভারত হইতে—তাহার দ্বারা লুণ্ঠিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে অদ্যাপি শরীর রোমাঞ্চিত হয়। কত অত্যাশ্চর্য্য হিন্দু শিল্পভাস্কর্য্য কীর্ত্তিকলাপ তাহার আমলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে,উহা বর্ণনা করা স্বল্পায়াস সাধ্য নহে; কত শত সহস্র হিন্দু নরনারী সেই নিষ্ঠুরের করালহস্তে প্রাণ বা তদপেক্ষা প্রিয়তর "ধর্ম্ম" বিসর্জ্জন দিয়াছেন,তাহার ইয়ত্তা নাই। সে যাহা হউক, এইরূপে এখানকার দ্রষ্টব্য স্থানগুলির শোভা সন্দর্শনপূর্ব্বক আমরা এখান হইতে মথুরা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। থানেশ্বর হইতে মথুরা যাইতে হইলে হাতরাসের মধ্যপথ দিয়া যাইতে হয়।

হাতরাস

হাতরাসের অপর নাম আলিগড়। পুরাকালে এখানে কেবল কোল নামক অসভ্য জাতিরা বাস করিত, কোলেরা ডাকাইত নামে প্রসিদ্ধ ছিল। মহাপরাক্রমশালী রাজা জরাসন্ধ ইহাদের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই প্রসিদ্ধ রাজা জরাসন্ধের জামাতা—মথুরাধিপতি কংস। যে কংস-

াজের জীবদ্দশায় দেব, দৈত্য, অসুর সকলেই কম্পান্বিত হইতেন, দেবগণ যাঁহার প্রভাবে এবং অত্যাচারে কাতর হইয়া ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে,তিনি স্বয়ং তাহাকে বিনাশ করিবেন বলিয়া দেবগণকে আশ্বাসিত করিয়াছিলেন এবং যথাসময়ে শ্রীকৃষ্ণ নামে নরদেহ ধারণ করিয়া ঐ কংসরাজকে বিনাশপূর্ব্বক কংসের পিতা বৃদ্ধ উগ্রসেনকে মথুরার সেই শূন্য সিংহাসনে রাজারূপে প্রতিষ্ঠা করিলে, কংস মহিষী আদ্র ও কান্তি শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া পিতা জরাসন্ধের শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হইলেন। মহাপরাক্রমশালী রাজা জরাসন্ধ কন্যা-দ্বয়ের নিকট যথাযথ বিজ্ঞাপিত হইয়া ক্রুদ্ধ মনে দেবগণকে সমূলে নির্ম্মূল করিবার অভিপ্রায়ে যখন মথুরাপুরী সসৈন্যে অবরোধ করেন, তখন এই হাতরাস নামক স্থানেই তাঁহার যাবতীয় সৈন্য লইয়া শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান এই হাতরাস নামক স্থানে বিস্তর অট্টালিকা শোভা পাইতেছে, এখানকার মৃত্তিকার দুর্গটী জগদ্বিখ্যাত। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সেনাপতি লর্ড লেক্ এখানকার সেই বিখ্যাত কেল্লাটী আপন বাহুবলের পরিচয় দিয়া অধিকার করেন। হাতরাস নামক ষ্টেসনের প্রায় এক ক্রোশ দূরে সহরের মধ্যভাগে অদ্যাপি সেই ধ্বংসাবশিষ্ট কেল্লাটীর সৌন্দর্য্য এবং শিল্পনৈপুণ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

হাতরাস—যুক্তপ্রদেশভুক্ত। বর্ত্তমানকালে এখানকার রাজা মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রপ্রতাপ সিং বাহাদুর দক্ষতার সহিত প্রজা-পালন করিতেছেন। ইনি সৎকর্ম্মসাধন করিতে মুক্তহস্ত। এই রাজারই চেষ্টায় সম্প্রতি বৃন্দাবনে কেশীঘাটের উপরিভাগে "প্রেমবিদ্যালয়" নামে একটী অবৈতনিক কারীগরী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

মথুরা
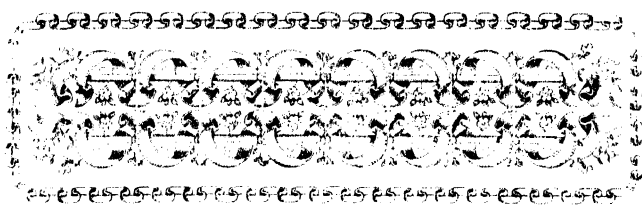
কুরুক্ষেত্রের থানেশ্বর ষ্টেশন হইতে রেলযোগে এই স্থানে কিম্বা হাতরাস হইতে মথুরা যাইতে হইলে মথুরা জংশন নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। মথুরা ষ্টেশন হইতে তীর্থতীর অন্যূন এক মাইল এবং কলিকাতা হইতে ৮২৪ মাইল দূরে অবস্থিত। ট্রেণ হইতে অবতরণ করিবামাত্র যাত্রীগণ শুনিতে পাইবেন—কেহ কাণ্‌মে নাড় সাড়ে আট ভাই, কেহ হরগোবিন্দ চোবে, কেহ হরকিসন চোবে বলিয়া চীৎকার করিতেছে। এই সকল লোক মথুরার তীর্থগুরুর নিযুক্ত। যিনি কাণ্‌মে নাড় বলিতেছেন, তাঁহার পাণ্ডার কাণের উপর একটী (আব) [illegible] আছে, এই নিমিত্ত কাণ্‌মে নাড় বলিয়া তাঁহার পরিচয় দিতেছেন, আর সাড়ে আট ভাই, অর্থাৎ এই পাণ্ডারা নয় সহোদর, তন্মধ্যে আটজনের বিবাহ হইয়াছে, আর একজন অবিবাহিত, যাহার বিবাহ হয় নাই তাহাকে ইহারা অৰ্দ্ধ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস—যাত্রীগণ গয়া, কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানের সেবা করিয়া শেষে মথুরায় আসেন, পরিশেষে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। এই আট ভায়ের মধ্যে আট স্থানে অবস্থান করিয়া যাত্রীদিগকে তাঁহাদের নাম শুনাইতে থাকেন, কেন না, যাত্রীরা ঐ নামানুসারে তাঁহাদেরই মধ্যে একজনকে তীর্থগুরু পদে মান্য করিতে পারেন।

মথুরা—একটী বিখ্যাত সহর, কালিন্দীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত। এখানকার রাস্তা, ঘাট পরিষ্কার এবং প্রশস্ত। এ সহরে আহারীয় খাদ্য-সামগ্রী কিম্বা গাড়ী, পাল্কী বা একা কোন কিছুরই অভাব নাই। এ পর্য্যন্ত যত তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়াছি—তন্মধ্যে মথুরা সহরের ন্যায় সুন্দর এবং মজবুত একা অপর কোন স্থানে দেখিতে পাই নাই। সহরটী যেরূপ জন বসতি, গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরও তদোপযুক্ত পুলিস ষ্টেশন, কোর্ট, জজ-কোর্ট, পোষ্টাফিস প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত করিয়া শান্তিরক্ষা করিতেছেন। যে সকল পাণ্ডা এখানে বাস করেন, তাঁহারা সকলেই চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন বলিয়া—চোবে নামে খ্যাত হইয়াছেন।

মথুরা—মহাবীর কংসের রাজধানী। এখানে ভগবান শ্রীরাম-কৃষ্ণের লীলাস্থান সকল দর্শন করিবার জন্য ভক্তগণ আসিয়া থাকেন। সন্ধ্যাকালে যমুনাতীর হইতে সুনীল অম্বরতলে দীপালোকে শঙ্খ, ঘণ্টা বাদ্যমুখরিত মন্দিরশোভিত মথুরার দৃশ্য বড়ই সুন্দর!

মথুরার পূর্ব্বদিকে যমুনা প্রবাহিতা, এই যমুনাতীরে থরে থরে বিচিত্র সোপানশ্রেণী দ্বারা শোভিত চব্বিশটী ঘাট আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে, তন্মধ্যে তীর্থতীরের পাশাপাশি বারটী ঘাটে সঙ্কল্প করিতে হয়। কলনাদিনী কালিন্দীতটে যেমন দেববাঞ্ছিত মথুরাপুরী, ভারতের সমগ্র তীর্থক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থল, সেইরূপ সৌরাষ্ট্রের সমুদ্রতটে—সোমনাথ পত্তন শোভা পাইতেছে।

বিশ্রাম ঘাট

যমুনার পূর্ব্বতীরে বিশ্রাম ঘাট বিরাজমান থাকিয়া ভগবানের মহিমা প্রকাশ করিতেছে। ইহার শোভা অতুলনীয়, মথুরায় যে বারটী তীর্থঘাট বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে বিশ্রামঘাটের স্থাপত্যনৈপুণ্য এবং

কারুকার্য্য দর্শন করিলে আত্মহারা হইতে হয়। এখানকার সন্ধ্যা-আরতি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! এই আরতি দর্শনের সময় হৃদয়ে এক স্বর্গীয়ভাবের সঞ্চার হয়, অতএব ভক্তগণ এই তীর্থে উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম ঘাটের সন্ধ্যা-আরতি দর্শন করিতে অবহেলা করিবেন না। কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ দুর্জ্জয় কংসকে বিনাশ করিয়া এই ঘাটের উপর বসিয়া বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিয়াছিলেন। এই নিমিত্তই এই ঘাটের নাম বিশ্রাম ঘাট হইয়াছে। এখানে যথানিয়মে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান, দান এবং পিতৃগণ উদ্দেশে তিলতর্পণ করিলে—শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অন্তে বিষ্ণুলোকে স্থান-লাভ করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি সংসাররূপ মরুভূমে অবতরণ করিয়া ক্লেশভোগ করিতেছেন, যদি তিনি একবার এখানে ভক্তিসহকারে শুদ্ধচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে পূজার্চ্চনা করেন, তাহা হইলে কৃপাময় কৃপা করিয়া তাহাকে বিশ্রাম-সুখ দান করিয়া থাকেন। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত বিশ্রাম ঘাটের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল।

যাত্রীগণকে সর্ব্বপ্রথমে এই বিশ্রান্তি ঘাটের নিয়মগুলি পালন করিয়া, তৎপরে ক্রমে ক্রমে দশটী ঘাটে সঙ্কল্পপূর্ব্বক শেষ ধ্রুব ঘাটে পৌঁছিতে হয়। এই ঘাটের উপরিভাগে এক উচ্চ পর্ব্বতের উপর যথায় বালক ধ্রুব—মাতৃ-উপদেশে স্বেচ্ছায় পদ্মপলাশলোচনের তপস্যা করিয়াছিলেন, অদ্যাপি পাষাণময় তাঁহার সেই তপস্যা মূর্ত্তির দর্শনলাভে জীবন ও নয়ন সার্থক করিবেন। ইহার সন্নিকটেই ভগবান অপরমূর্ত্তিতে সাক্ষীগোপালরূপে বিদ্যমান থাকিয়া ভক্তবৃন্দের কীর্ত্তিকলাপ সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত অবস্থান করিতেছেন।

ভক্তগণ এখানে আসিয়া ঐ পুণ্যময় ধ্রুব ঘাটে সঙ্কল্পসহকারে স্নান করেন এবং তীর্থতীরের উপরিভাগে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পিতৃপক্ষে, বিধবা স্ত্রীলোক হইলে—শ্বশুরকুলের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ সমাপন করিয়া পিতৃলোক-

[২৩০ পৃষ্ঠা।

বিশ্রাম ঘাটের দৃশ্য।

কলিকাতা প্রেস।
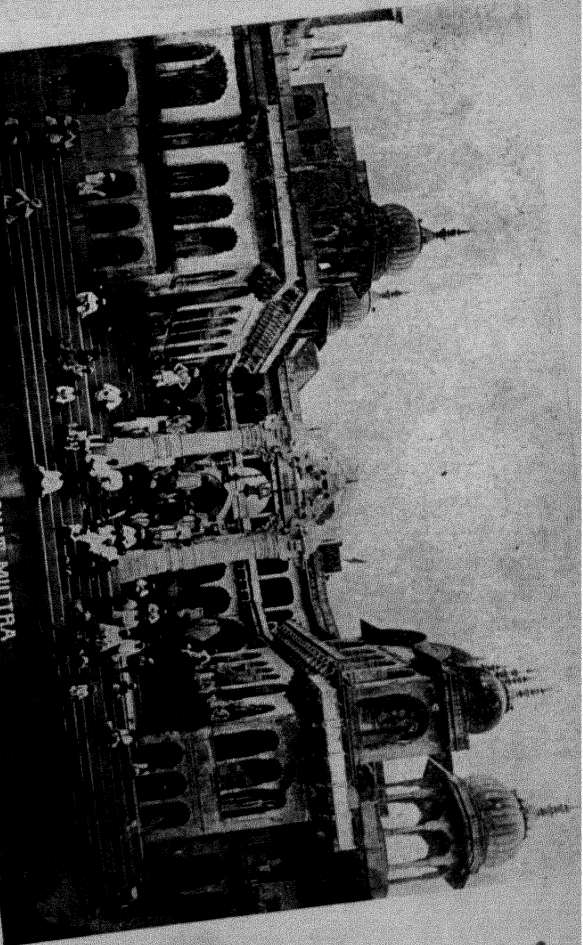
দিগকে উদ্ধার করেন, তৎসঙ্গে আপন মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়া থাকেন। তাহার পর নিকটস্থ সাক্ষীগোপালের নিকট তাঁহার পূজার্চ্চনাপূর্ব্বক আপন আগমনের বিষয় তাঁহাকে সাক্ষ্য করিয়া থাকেন। এইরূপে এখানকার নিয়মগুলি পালনসহকারে তীর্থগুরু চোবে পাণ্ডাকে সাধ্যানুসারে সস্ত্রীক দক্ষিণাসহ ভোজন করাইয়া সন্তুষ্ট করিতে হয়।

মথুরা ষ্টেশন হইতে বরাবর সহরের দিকে অগ্রসর হইবার সময়, প্রশস্ত রাস্তার উপর যে বিখ্যাত হাডিঞ্জ নামক ফটক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার উপরিভাগে একটী ঘড়ী শোভা পাইতেছে, ঐ ফটকের মধ্যে প্রবেশ করতঃ এখানকার অফুরান্ত দেবালয়গুলিতে বিগ্রহমূর্ত্তির দর্শন করিতে করিতে ক্রমে সহরের বড়বাজার নামক চকে উপস্থিত হইবেন। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত হাডিঞ্জগেটের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল।

শেঠজীর বৃহৎ রূপার তালগাছবিশিষ্ট দেবালয়ে—ভগবান দ্বারকাধীশ নামক বিগ্রহমূর্ত্তির দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিবেন। এ সহরের মধ্যে শেঠবংশের স্থাপিত শ্রীদ্বারকাধীশ দেবালয়ই আয়তনে, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শোভনীয়—বিশ্রাম ঘাটের সন্নিকটে এই দেবালয়টী অবস্থিত। মথুরায় যতগুলি দেবালয় প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার সকলগুলিই সদর রাস্তা হইতে অত্যন্ত উচ্চে স্থাপিত। সন্ধ্যার পর—এই সকল দেবালয় ও রাজপথের মধ্য দিয়া যাত্রাকালীন—সহরের উভয় পার্শ্বের সুসজ্জিত দোকানগুলির শোভা দর্শনে আনন্দ অনুভব করিয়া মনে মনে ভাবিবেন, যেন এই নগরই যথার্থ স্বর্গপুরী; যদিও স্বর্গ কিরূপ, উহা আমরা দর্শন করিতে সমর্থ হই না, তথাপি অতি সুখভোগই স্বর্গ বলিয়া কথিত আছে।

শ্রীশ্রীকেশবদেব

শ্রীকেশবদেবই মথুরাপুরীর প্রাচীন দেবতা। মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের প্রাদুর্ভাবকালে তিনি আপন কীর্ত্তি স্থাপিত করিবার উদ্দেশে হিন্দুদিগের এই পূজনীয় বিগ্রহদেবের মন্দিরটী ধ্বংস করিয়া ঐ স্থানে এক প্রকাণ্ড মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন, যাত্রীগণ ঐ যবন কীর্ত্তিস্তম্ভ—মস্‌জিদটী অদ্যাপি এখানে দেখিতে পাইয়া থাকেন। হিন্দুদিগের উপাস্য দেবতা ভগবান শ্রীকেশবদেব এক্ষণে কাশীর বিশ্বেশ্বরের ন্যায় ঐ মস্‌জিদের অনতিদূরে এক ক্ষুদ্র মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভক্তগণকে দর্শনদানে উদ্ধার করিতেছেন।

মথুরা সহর মধ্যে বানরকুলের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে থাকাতে—যাত্রীদিগেকে সতত সতর্ক থাকিতে হয়, নচেৎ এই সকল বানরগণের নিকট ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। এখানে যত দেবালয় আছে, তাহার কোন স্থানে ভেটের প্রথা নাই। ভক্তগণ সাধ্যমত যাহা প্রণামী দেন, উহাতেই পূজারীগণ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

মথুরা তীর্থের দ্রষ্টব্য স্থান ;—

১। শ্রীকেশবদেব, ২। দ্বারকাধীশ, ৩। বিশ্রাম ঘাট, ৪। ধ্রুব ঘাট, ৫। যমুনাবাগ, ৬। মথুরানাথ, ৭। রঙ্গেশ্বর মহাদেব, ৮। কংসটীলা, ৯। রামেশ্বর মহাদেব, ১০। কনখলক্ষেত্র, ১১। তিন্দুক তীর্থ, ১২। সূর্য্য ঘাট, ১৩। রঙ্গভূমি, ১৪। সরস্বতী সঙ্গম, ১৫। দশাশ্বমেধ ঘাট, ১৬। কৃষ্ণগঙ্গা, ১৭। মুক্তিতীর্থ, ১৮। বৈকুণ্ঠ ঘাট, ১৯। বরাহক্ষেত্র, ২০। বাসুদেব ঘাট, ২১। গোকুল, ২২। গোকর্ণেশ্বর মহাদেব ইত্যাদি।

রঙ্গভূমি

ধ্রুব ঘাটের পশ্চিম ভাগে—প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে—রঙ্গভূমি বর্ত্তমান থাকিয়া অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই স্থানেই অক্রূর কংস কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া গোকুল হইতে শ্রীরামকৃষ্ণকে সঙ্গে দর্শন করাইবার হেতু রথারোহণে আনয়ন করেন এবং এই স্থানেই বালক শ্রীরামকৃষ্ণরূপী সাক্ষাৎ ভগবান—কংসের যাবতীয় বীরযোদ্ধাগণকে সসৈন্যে বিনাশপূর্ব্বক আপন মহিমা প্রকাশ করেন। এই রঙ্গভূমিতেই অদ্যাপি কংস ও তাঁহার যোদ্ধাগণের মৃণ্ময় প্রতিমূর্ত্তি, যজ্ঞস্থল এবং কুবলয়পীড় নামক হস্তী মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল চিত্র মূর্ত্তিগুলি দর্শন করিতে হইলে—পূজারিরা প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতে পৃথক্ এক আনা দর্শনী আদায় করিয়া থাকেন। বলাবাহুল্য যে, এই যজ্ঞস্থান ও রণরঙ্গভূমি দর্শন করিবার সময়—হৃদয়ে এক স্বর্গীয় ভাবের উদয় হইতে থাকে। ইহার সন্নিকটে কংসটীলা দেখিতে পাইবেন।

মথুরা সহরে সেই প্রাচীন কংসালয় মহাবীর ঔরঙ্গজেব—সমস্তই ধ্বংস করিয়া ঐ স্থানে একটী প্রকাণ্ড মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইয়া আপন কীর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছেন। বিশ্রাম ঘাটের পার্শ্বে কংসরাজের সেই প্রাচীন বাস-ভবনের ভগ্নাংশ অদ্যাপি কিছু কিছু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

মথুরা-মাহাত্ম্য

যে সকল ধর্ম্মাত্মা এই পবিত্র পুরী দর্শন করেন বা শ্রীকৃষ্ণের মহিমাদি শ্রবণ করেন, অথবা ভক্তিপূর্ব্বক শুদ্ধচিত্তে অবস্থান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা কিম্বা তাঁহার লীলা সকল কীর্ত্তন করেন, সেই পুণ্যাত্মারাই ধন্য। এই পুরার মধ্যে যে স্থান অর্দ্ধচন্দ্রাকারে অবস্থিত, যাঁহারা ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানমধ্যে বসবাস করেন, অন্তিমে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সকল পাপ হইতে মুক্তি পাইয়া থাকেন।

যে ব্যক্তি এই অর্দ্ধচন্দ্রাকারবিশিষ্ট স্থানে শুদ্ধাহারী হইয়া পুণ্যতোয়া যমুনাজলে স্নান করেন বা এই স্থানে জীবন বিসর্জ্জন করেন, তাঁহারা নিঃসন্দেহে বিষ্ণুলোকে স্থান পাইয়া থাকেন। কথিত আছে, যতদিন এখানে পাপীর অস্থি বর্ত্তমান থাকে, ততদিন সে ব্রহ্মলোকে পূজিত হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি শুদ্ধচিত্তে এই স্থানে আসিয়া ভগবান শ্রীহরির বিগ্রহমূর্ত্তি দর্শন করেন, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তিনি নিশ্চয়ই মথুরা প্রদক্ষিণের ফললাভ করিতে সমর্থ হন। হে মহামহিমান্বিত! তোমার কৃপা না হইলে কি কখন কেহ এই পুণ্যময় স্থানে আসিতে পারে?

যে ব্যক্তি শুদ্ধচিত্তে সম্বৎসরান্তে কার্ত্তিক মাসের শুক্ল অষ্টমীতিথিতে আসিয়া এখানকার তীর্থ নিয়ম সকল শুদ্ধচিত্তে পালন করিতে পারেন, তিনিই তপস্যাকারী। যদিও এ জন্মে তিনি কোন তপস্যা না করিয়া থাকেন, কিন্তু জন্মান্তরে যে তিনি নানা প্রকার তপস্যা করিয়াছেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

যে ব্যক্তি কার্ত্তিক শুক্ল নবমীতিথিতে এই মথুরাপুরী প্রদক্ষিণ

করেন, তিনি ব্রহ্মহত্যাকারী, গোহত্যাকারী, মদ্যপায়ী, ব্রতভঙ্গকারী মহাপাপী হইলেও স্থান মাহাত্ম্যগুণে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সমস্ত কুলের সহিত বিষ্ণুলোকে পূজিত হইয়া থাকেন।

যে ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে একবারমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্ম গৃহে প্রবেশ করিতে পারেন, অথবা গোকুলে তাঁহার বাল্যলীলা সকল দর্শন করিতে সমর্থ হন, তিনি পরম অব্যয় কৃপাময়ের কৃপায় তাঁহারই শ্রীচরণে স্থান পাইয়া থাকেন।

ভক্তগণ! মথুরাপুরীতে একটীমাত্র উত্থান একাদশীর ব্রত অপেক্ষা ইহসংসারে এরূপ কর্ত্তব্য কাজ আর দ্বিতীয় নাই, স্থির জানিবেন। একাদশী ব্রত পালন করিয়া শ্রীহরির বিগ্রহমূর্ত্তির শ্রীচরণে তুলসাপত্র প্রদান না করিলে—ব্রতকারীর কোন ফলই হয় না; অতএব এই ব্রত করিয়া বিগ্রহমূর্ত্তির শ্রীচরণে তুলসাপত্র প্রদান এবং হরি সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে রাত্রি জাগরণ করিয়া নিয়ম পালন করিবেন। ইহার ফলে ব্রতকারীকে আর কখন সংসারমায়ায় আবদ্ধ হইতে হয় না।

আহা! মথুরাপুরী কি পবিত্র স্থান! যে স্থানে বলরাম শ্রীকৃষ্ণসহ পণ্ডিত লোকদিগের হিতার্থে নানাবিধ লীলা করিয়াছিলেন, যথায় শ্রীকৃষ্ণ উগ্রসেনের ক্ষেত্রজপুত্র কংসকে যাবতীয় অসুরগণের সহিত বিনাশ করিয়া ব্রজবাসীদিগকে নির্ভয় করিয়াছিলেন, যে স্থানে ঐ সকল অসুরগণ তাঁহার পবিত্র করস্পর্শমাত্র উদ্ধার হইয়া যোগীদিগের গতি প্রাপ্ত হইয়াছে—সন্দেহ নাই; সেই পবিত্র স্থানের মাহাত্ম্য লেখনীর দ্বারা প্রকাশ অসাধ্য।

ব্রজমণ্ডলে—দ্বাদশবনের মধ্যে প্রথমেই মধুবন। বিশ্বব্যাপী হরি—এই স্থানে মধু নামক দুর্জ্জয় দৈত্যকে বিনাশ করিয়া মথুরাবাসীদিগকে যাবতীয় আপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। যাত্রীগণ সেই বিপদভঞ্জন

শ্রীমধুসূদনের লীলা স্থান একবার দর্শন করিয়া নয়ন ও জীবন চরিতার্থ বোধ করিবেন।

মথুরা সহরে অধিকাংশ ধর্ম্মশালা, দেবালয়, তীর্থ ঘাট সকল মহারাজ ভরতপুরাধিপতি, জয়পুরাধিপতি ও অপরাপর ভাগ্যবান পুরুষদিগের দ্বারা নির্ম্মিত হওয়া এই সহরের এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করাইয়াছেন। যমুনা নদীর পরপারে পুলের উপর হইতে মথুরা সহরের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে যেন কাশী সহর বলিয়া ভ্রম হয়। কেন না, কাশী সহরের পুলের পরপার হইতে যেরূপ মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মসজিদ শোভার দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, এখানেও ঠিক সেইরূপ তাঁহার মসজিদ শোভার কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইতিহাস পাঠে জানা যায়—প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক "হিউয়েন সাং" মথুরার বিভব ঐশ্বর্য্য ও মন্দিরাদির আশ্চর্য্য শিল্পনৈপুণ্য দর্শনে বিস্ময়পুলকে অভিভূত হইয়াছিলেন। এইরূপ আবার বিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক মিঃ টলেমি মথুরার ধনৈশ্বর্য্যের কাণ্ড অবলোকন করিয়া ইহাকে (Medoura of the Gods) অর্থাৎ অমরাপুরী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

যমুনা-বাগ

মথুরায় শেঠবংশের ইহাও এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্তম্ভ। যমুনাতীরের উপরিভাগে এই বৃহৎ বাগানবাড়ীটি আপন শোভা বিস্তার করিয়া অদ্যাপি তাঁহাদের মহিমা প্রকাশ করিতেছে। পূর্ব্বে এই মনোহর উদ্যান মধ্যে পৃথিবীর অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ফল, পুষ্প, লতা, বৃক্ষ এমন কি পশু, পক্ষী স্থান পাইয়াছিল, আরও মিউজিয়মের ন্যায় নানা প্রকার শিল্পজাত দ্রব্য পর্য্যন্ত সংগৃহীত ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানকালে ইহার মধ্যে

কেবল কয়েকখানি ছবি, হিমঘর, কৃত্রিম পাহাড়, ঝরণা, সরোবর, দুইটী শিবমন্দির ও এক স্থানে কাচ-ঘরের মধ্যে নানা জাতীয় লতা, গুল্ম অবস্থান করিয়া তাঁহাদের মহিমা প্রকাশ করিতেছে। পাঠক-বর্গের প্রীতির নিমিত্ত এই যমুনাবাগের একখানি মনোমুগ্ধকর চিত্র প্রদত্ত হইল।

যে মথুরা—কংসের নিমিত্তই প্রসিদ্ধ। যে কংসরাজকে বিনাশ করিবার কারণ অনাদিদেব পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নামে নরদেহ ধারণ করতঃ পিতামাতা ও পুরবাসীগণকে কংসের যাবতীয় যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিয়া এই পুরী পবিত্র করিয়াছেন, সেই কংস কিরূপ প্রকারে বিনাশ হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইল।

কংস বধ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবনীতে অবতীর্ণ হইবার পর—একদা দেবর্ষি নারদ কংসসমীপে উপনীত হইয়া বলিলেন, "হে রাজন্! দেবকীর অষ্টম গর্ভে যে কন্যা হইয়াছে বলিয়া শ্রবণ করিতেছি, বস্তুতঃ ঐ কন্যা দেবকীর গর্ভজাত কন্যা নয়, সেটী নন্দরাণী যশোদার কন্যা—ইহা স্থির জানিবেন। দেবকীতনয় রামকৃষ্ণকে বসুদেব তোমার ভয়ে গোপনে গোকুলনগরে গোপরাজ নন্দালয়ে রাখিয়া নিশ্চিন্তমনে অবস্থান করিতেছেন। আমি অবগত আছি, তোমার যে সমস্ত বিশ্বস্ত চরগণ তাঁহাদের সন্ধানে গিয়াছিল, ঐ দুইজন বালকের হস্তে তাহারা সকলেই বিনষ্ট হইয়াছে—ইহাতে কি বুঝিতে পারিতেছ না যে, তোমাকেও উহাদের হস্তে মরিতে হইবে?"

ইহা শুনিয়া কংস ক্রোধান্ধ হইয়া বসুদেব বধার্থে শাণিত অসি

উত্তোলন করিবার উপক্রম করিলে—নারদ মুনি তাঁহাকে নানাপ্রকার উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক শান্ত করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। দুরাত্মা কংস তখন মনে মনে ভাবিলেন যে, আমার ভগ্নী ও বসুদেবকে এক লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া কারাগারে নজরবন্দী রাখাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করি। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি তদনুরূপ করিলেন এবং ভোজপতি ও অমাত্যগণকে ডাকাইয়া বলিলেন, "হে বীরগণ! নারদ মুখে শুনিলাম—রামকৃষ্ণ নামে যে দুই পুত্র গোকুলে নন্দালয়ে বাস করিতেছে, ঐ দুজনার হস্তে আমার মৃত্যু হইবে। অতএব আমার উপদেশ মত তোমরা সত্বর মল্লরঙ্গ নির্ম্মাণ কর; ছলে, বলে, কৌশলে যে কোনরূপে পারি, তাহাদিগকে এই বাল্যকালেই এখানে আনয়নপূর্ব্বক নিঃসহায় অবস্থায় বিনাশ করিতে হইবে; যে মল্লরঙ্গ প্রস্তুত হইবে—তাহার দ্বারদেশে অযুত বলশালী কুবলয়পীড়কে স্থাপন করিয়া তদ্দ্বারা তাহাদের বধ করিবার চেষ্টা কর, ইহাতে ঐ বালকগণ যে আমার দ্বারা হত হইয়াছে, তাহা কেহ জানিতে পারিবে না। যজ্ঞের ভাণ করিয়া চতুর্দ্দিকে কৃত্রিম যজ্ঞ আরম্ভ কর। সেই যজ্ঞে—গোপরাজসহ রামকৃষ্ণকে এখানে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক যে কোনরূপে—আপন কার্য্যসিদ্ধ করিয়া আমার চিন্তা দূর কর।"

অসুরশ্রেষ্ঠ মহাবীর কংস এইরূপ উপদেশ দিয়া তৎক্ষণাৎ অক্রূরকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "হে সুহৃদ! আমার বিপদকালে তুমি সৌহার্দ্দের পরিচয় দাও। বসুদেবের রামকৃষ্ণ নামে যে দুই পুত্র নন্দগৃহে অবস্থান করিতেছে, আমার মথুরাপুরী এবং ধনুর্যজ্ঞের শোভা দর্শন করিবার অছিলায়—তাহাদিগকে সত্বর সসম্ভ্রমে এখানে আনয়ন কর, অধিকন্তু আমার উপদেশ মত মহারাজ নন্দ প্রভৃতি গোপদিগকে উপঢৌকনসহ কৌশল করিয়া আনয়নপূর্ব্বক প্রিয় সুহৃদের কার্য্য সম্পন্ন

কর। তুমি তাহাদের এখানে ভুলাইয়া আনিতে পারিলেই আমি কুবলয়পীড় (হস্তী) দ্বারা ঐ দুই বালকের প্রাণসংহার করিয়া সকল চিন্তা দূর করিব। যদি ইহাতেও তাহারা কোনরূপে রক্ষা পায়, তাহা হইলে বজ্রসম মল্লগণ দ্বারা নিশ্চয়ই রামকৃষ্ণকে শমনভবনে প্রেরণ করিব।"

পরম বৈষ্ণব অক্রূর—কংসের দুরভিসন্ধি শ্রবণ করিলে তাঁহার বিনাশকাল উপস্থিত স্থির জানিয়া—সেই পূর্ণব্রহ্ম তেজোময় শ্রীকৃষ্ণ চরণে প্রণত হইয়া রথারোহণপূর্ব্বক গোকুলনগরে নন্দগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে নারদ ঋষি—শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে করিতে নিবেদন করিলেন, "প্রভো! আপনি রজরূপী দৈত্য ও রাক্ষসগণকে বিনাশ এবং সাধুদিগকে রক্ষার নিমিত্তই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যে কেশী-দৈত্যের ভয়ে ব্রজবাসী ও দেবগণ সতত কম্পান্বিত হইতেন, আপনি অনায়াসে সেই দুর্জ্জয় কেশী-দৈত্যকে বিনাশ করিয়াছেন। হে জগৎপতে! এক্ষণে আশা করিতেছি, আপনি শীঘ্রই চাণুর, মুষ্টিক, গজ ও কংসকে সংহার করিবেন; তৎসঙ্গে শঙ্খ, যবন, মুর, নরক প্রভৃতিকেও বিনাশ করিবেন। এইরূপ নানা বিষয় উল্লেখ করিয়া নারদ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।"

লঙ্কেশ্বর রাজা বিভীষণ ও মহাপরাক্রমশালী কিষ্কিন্ধ্যাপতি সুগ্রীব—একদা দূত মুখে অবগত হইলেন যে, "পূর্ণব্রহ্ম" লীলাবশে পুনর্ব্বার নরাকারে রামকৃষ্ণ নামে ধরায় অবতীর্ণ হইয়া গোকুলনগরের নন্দালয়ে অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু দুর্জ্জয় কংসাসুর তাঁহাদের বাল্যাবস্থায় আপনালয়ে নিমন্ত্রণের ভাণ করিয়া—কৌশলে আনয়নপূর্ব্বক বিনাশ করিবে। এই দুঃসম্বাদে অজ্ঞ সুগ্রীব অধীর হইয়া শ্রীরাম চরণ ধ্যান করিতে করিতে সসৈন্যে তাঁহাদের সাহায্যের নিমিত্ত গোকুলনগরে

উপস্থিত হইলেন, কিন্তু ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ—পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের বিক্রম অবগত ছিলেন, সুতরাং কেবল তাঁহাদের শ্রীচরণ বন্দনা করিবার অভিলাষে তিনি তাঁহার বীররাক্ষস সৈন্যগণসহ পুষ্পক রথারোহণে তথায় উপস্থিত হইলেন। এইরূপে গোকুলনগর ভক্তগণের শুভাগমনে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। অন্তর্য্যামী ভগবান ভক্তগণের আগমনবার্ত্তা অন্তরে অবগত হইয়া পথিমধ্যে এক স্থানে শ্রীরাম লক্ষ্মণরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের পূজা গ্রহণপূর্ব্বক ভক্তের আশা পূর্ণ করিলেন। এদিকে পুরবাসীগণ বিভীষণের ঐ সকল বীররাক্ষস সৈন্যগণকে—কংসের চর অনুমান করিয়া ভীতমনে তাঁহাদের একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা রামকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের একে একে সকলকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক মধুর বচনে তুষ্ট করিয়া বিভীষণকে লঙ্কাপুরে প্রস্থান করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু সুগ্রীব সৈন্যের কোনরূপ আপত্তি না পাইয়া তাহাদিগকে তথায় অবস্থান করিতে আজ্ঞা করিলেন। এইরূপে কপিসৈন্যগণ তদবধি ব্রজমণ্ডলে স্থান প্রাপ্ত হইয়া মনের সুখে তাঁহাদের নিত্য পূজার্চ্চনা করিতে লাগিল। এখানে একটী প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়—ব্রজমণ্ডলে কোন ব্রজবাসী প্রাণত্যাগ করিলে তাহারাই বানররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, উহা কল্পনা মাত্র।

এদিকে জগচ্চিন্তামণি—নারদের মুখে এই সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিয়া তিনি কি নিমিত্ত নরদেহ ধারণ করিয়াছেন, উহা একবার চিন্তা করিলেন এবং মথুরা যাত্রার নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন। অপরদিকে ভক্তপ্রবর অক্রূর রথারোহণে যথাসময়ে নন্দগৃহে উপস্থিত হইয়া ভক্তিসহকারে তাঁহাদের উভয়ের শ্রীচরণ বন্দনাপূর্ব্বক আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিয়া তাঁহারা মথুরাপুরীর কুশল জিজ্ঞাসা করিলে—বৈষ্ণবচূড়ামণি অক্রূর যথাযথ

কংসের মন্ত্রণা সকল প্রকাশ করিলেন। তৎশ্রবণে তিনি মৃদুহাস্যসহকারে মহারাজ নন্দের নিকট মথুরাপুরীর শোভা এবং ধনুর্যজ্ঞ-স্থান দেখিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। গোপরাজ নন্দ শ্রীকৃষ্ণের মায়া বুঝিতে না পারিয়া রামকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত অধীনস্থ গোপবৃন্দকে শকটারোহণে মথুরা যাত্রার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। তৎপরে ইচ্ছাময়ের ইঙ্গিতপ্রাপ্তে অক্রূর—তাঁহাদিগকে লইয়া রথারোহণে মথুরা যাত্রা করিলেন।

রামকৃষ্ণ এইরূপে মথুরায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক রজক—উত্তম উত্তম বস্ত্র সকল লইয়া কংসালয়াভিমুখে গর্ব্বভরে অগ্রসর হইতেছে, তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই তাহার নিকট কিছু বস্ত্র যাচ্ঞা করিলেন; কেন না, তিনি পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন যে, ঐ সকল বস্ত্র তাঁহার মাতুল কংসরাজার; মাতুলের সম্পত্তিতে ভাগ্নের নিশ্চয়ই অধিকার আছে—তাই তিনি রজকের নিকট বস্ত্র চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মোহাচ্ছন্ন রজক সেই নবজলধর শ্যামরূপধারী শ্রীকৃষ্ণের মায়াপ্রভাবে তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া রোষান্বিতকলেবরে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন, এমন কি তাঁহাকে তিরস্কার পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত না হইয়া সে যে কংসরাজের রজক—উহাই প্রকাশ করিয়া আস্ফালন করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ রজকের আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া হস্ত দ্বারাই তাহার মস্তক ছেদন করিয়া আপন মহিমা প্রকাশ করিলেন। তদ্দর্শনে রজকের অনুচরেরা প্রাণভয়ে তথায় বস্ত্রাদি ফেলিয়াই "হা—মা—কা" "হা—মা—কা" এইরূপ অস্পষ্ট শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে কংসরাজের শরণাপন্ন হইল। তখন রামকৃষ্ণ—সম্মুখে মাতুলের সম্পত্তি পাইয়া আপনাপন পছন্দানুযায়ী উত্তম উত্তম পরিচ্ছদগুলি পরিধান করিয়া নিকটস্থ এক মালাকরের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। মালাকর ঐ বালকদ্বয়ের অপ-

রূপরূপ দর্শনে মোহিত হইয়া সাধ্যানুসারে তাঁহাদের উভয়কে সজ্জিত করিলে—তাঁহারা মনের সুখে মথুরাপুরীর শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবামাত্র এক যুবতী (কুব্জা সুন্দরী)কে বিলেপন হস্তে রাজবাড়ী যাইতেছে দেখিয়া উভয়েই তাহাকে বলিলেন, "সুন্দরি! তুমি আমাদিগকে উত্তম অনুলেপন দান করিয়া সুসজ্জিত কর।"

কুব্জা—পূর্ব্ব হইতেই বলরামের রূপে মুগ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের মধুর বচনে আরও মোহিত হইয়া বিনা আপত্তিতে তাঁহাদের উভয়কেই সাধ্যানুসারে অনুলেপন করাইবার সময় স্পর্শ সুখে আত্মহারা হইয়া একদিনের জন্য তাহার আলয়ে অবস্থান করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তখন যুবতীকে আশ্বাস প্রদান করিয়া সে দিবস তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে তাঁহারা সুসজ্জিত হইয়া রাজপথের শোভা দেখিতে দেখিতে যজ্ঞশালায় উপস্থিত হইয়াই সম্মুখে এক ইন্দ্রধনুর ন্যায় অপূর্ব্ব ধনু শোভা পাইতেছে দেখিয়া—শ্রীকৃষ্ণ কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া আপন মনে ঐ অদ্ভুত ধনু উত্তোলন এবং জ্যা-রোপণসহকারে আকর্ষণপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে উহা দ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিলেন। ইহাতে এক ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হইয়া কংস হৃদয় ব্যথিত করিল। ধনুরক্ষকেরা এই অদ্ভুত দৃশ্য অবলোকন করিয়া চমৎকৃত হইল, কারণ যে ধনু পুরাকাল হইতে কখন কোন বীর নড়াইতে সমর্থ হন নাই, আজ কিনা এক সামান্য বালকে উহা খণ্ড খণ্ড করিতে সমর্থ হইল। রক্ষকেরা রাজার নিকট কৈফিয়ৎ দিবার ভয়ে একযোগে সকলে মার মার শব্দে বালকদ্বয়কে আক্রমণ করিলে—শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ ভগ্ন ধনুর সাহায্যে সেই সকল রক্ষকগণকে বিনাশ করিয়া আপন বাহুবলের পরি-

য় প্রদান করিলেন। রাজা কংস—এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া মনে মনে ভীত হইলেন এবং আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাঁহার উত্তম উত্তম বাছাই বলিষ্ঠ অনুচরগণকে সত্বর রামকৃষ্ণকে বিনাশ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। কালের গতি কে রোধ করিতে পারে—যে কৃষ্ণ এই সকল অসুরদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্তই নরদেহ ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট কি এই সকল যোদ্ধাদিগের বলাবিক্রম প্রকাশ পাইতে পারে? বলাবাহুল্য, এবারও তিনি অনায়াসে ঐ সকল সৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়া তথা হইতে সুস্থশরীরে নিক্রান্ত হইয়া অক্রূরালয়ে বিশ্রাম-সুখে রাত্রিযাপন করিলেন।

অসুররাজ কংস যখন শ্রবণ করিলেন যে, ঐ সামান্য বালকদ্বয় তাঁহার বারবীর্য্য বীর অনুচরদিগকে সংহার করিয়াছে, যাহাদের বাহুবলে ত্রিভুবন সতত কম্পিত হইত, আজ কিনা তাহারা সামান্য ক্ষুদ্র প্রাণীর ন্যায় রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিল। কালের কি বিচিত্র গতি! এই সকল বিষয় তিনি যত ভাবিতে লাগিলেন, তত্ই ভীত হইতে লাগিলেন, এমন কি এই ভাবনাতেই তাহাকে উন্মাদগ্রস্ত হইতে হইল, আবার সেই রাত্রিতে তিনি জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় মৃত্যুর বিবিধ দুর্লক্ষণ দেখিতে লাগিলেন। এইরূপে অতি কষ্টে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া রজনী প্রভাত হইবামাত্র রাজা মল্লক্রীড়ার মহোৎসব আরম্ভ করিতে আদেশ দিলেন। আজ্ঞাপ্রাপ্তে বীরপুরুষেরা যথাস্থানে রঙ্গস্থানের পূজা, মঞ্চ এবং তোরণদ্বারগুলি পুষ্পমালা ও পতাকা দ্বারা সুশোভিত করিয়া অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত করাইলেন। তখন চিরপ্রথানুসারে রঙ্গস্থলে মুহুর্মুহুঃ তূরি, ভেরী ও নানাবিধ রণবাদ্য বাজিতে লাগিল, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও নানা জাতি পুরবাসীগণ আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট হইলে—দুরাত্মা কংস অমাত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজমঞ্চে উপবেশন করি-

লেন। চাণুর, মুষ্টিক প্রভৃতি বীরযোদ্ধাগণ মল্লবেশ ধারণ করতঃ প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া তথায় উপস্থিত হইবামাত্র—চতুর্দ্দিক হইতে জয় ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। এইরূপে সেই সকল বীরগণের একত্র সম্মিলনে রণস্থল যেন প্রলয়মূর্ত্তি ধারণ করিল।

রামকৃষ্ণ উভয়ে—পরামর্শ করিলেন, ইতিপূর্ব্বে আমরা যখন ইন্দ্র ধনুর্ভঙ্গপূর্ব্বক বলপ্রকাশ করিলাম, উহা চাক্ষুস করিয়াও রাজা আমাদের পিতামাতাকে কারামুক্ত করিলেন না, অধিকন্তু গর্ব্বভরে আমাদের বিনাশোদ্যোগ করিতেছেন, তথন তিনি মাতুল হইলেও তাঁহার বিনাশে আমাদের কোনরূপ পাপ স্পর্শিবে না। এইরূপ যুক্তি হইতেছে, এমন সময় রণস্থল হইতে ঘন ঘন দুন্দুভির শব্দ হইতে লাগিল, ঐ শব্দ শ্রবণ করিয়া তাঁহারা উভয়ে একযোগে রণস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, হস্তীপকচালিত "কুবলয়পীড়" দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ ঐ হস্তীচালকের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ত্বরায় মল্লবেশ ধারণ করতঃ উহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, ওহে হস্তীপক! আমাদিগকে যজ্ঞস্থান দর্শন করিতে দাও, নতুবা হস্তীসহ তোমাকে শমনসদনে প্রেরণ করিব। তৎশ্রবণে চালক আরও কুপিত হইয়া কুবলয়পীড়কে—শ্রীকৃষ্ণের দিকে চালিত করিল, গজরাজ শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে পাইয়া আপন শুণ্ড দ্বারা তাঁহাকে বেষ্টন করিলে—শ্রীহরি তাহার সকল বল হরণ করিয়া নিজবলে সেই হস্তীকে ভূমে পাতিত করিলেন, অধিকন্তু তাহার দন্ত উৎপাটিত করিয়া ঐ দন্তাঘাতেই তাহাদের উভয়কে বিনাশ করিলেন। তৎপরে সেই দন্তস্কন্ধে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় রুধিরাক্ত-কলেবরে বলরামের সহিত যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করিলেন।

চাণুর তখন রামকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে বালকদ্বয়! তোমরা উভয়েই বাহুযুদ্ধে দক্ষ, কংসরাজ ইহা অবগত হইয়া পরীক্ষার

নিমিত্ত তোমাদিগকে এখানে নিমন্ত্রণ করিয়া আহ্বান করিয়াছেন।”

ইহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, হে বীর! আমরা বনচর (গোকুল অরণ্য মধ্যে স্থাপিত) ও বালক এবং কংসরাজারই প্রজা। তিনি যাহা আদেশ করেন, উহা আমাদের পক্ষে অনুগ্রহ মাত্র। আমরা বালক, এই নিমিত্ত তোমাদের রাজার নিকট নিবেদন, আমাদের সমান বলশালী বালকদের সহিত ক্রীড়া করিতে প্রার্থনা করিতেছি. ইহাতে এই সভাসদদিগের কোনরূপ অধর্ম্ম হইবে না। শ্রীকৃষ্ণ কংসের বীরমল্লদিগকে দেখিয়া—ভয়ে এরূপ বলেন নাই; কেন না. যে কৃষ্ণ সহজে ইন্দ্রধনুর্ভঙ্গ, কুবলয়পীড় হস্তী ও খ্যাতনামা যোদ্ধাদিগকে অবলীলাক্রমে বিনাশ করিলেন, এক্ষণে যে তিনি এই সকল মল্লদিগকে দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন, তাহা কখনই সম্ভবে না। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল, বৃথা জীবহিংসা না করিয়া যে উদ্দেশে তিনি এখানে আসিয়াছেন—উহাই সিদ্ধি করা; কিন্তু কালের গতি কে রোধ করিতে পারে, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে কেহই কোন বাধা মানে না। প্রমাণস্বরূপ দেখুন, এই মল্লগণ তাঁহার উপদেশ বাক্যে মল্লযুদ্ধ প্রতিনিবৃত্তির পরিবর্ত্তে বরং অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল, সুতরাং তাঁহারা বাধ্য হইয়া বহুক্ষণ মল্লযুদ্ধ ক্রীড়ায় নিরত থাকিয়া একে একে যাবতীয় মল্লগণকে বিনাশ করিলেন।

কংসরাজ তদ্দর্শনে রণবাদ্য নিবারণ করাইয়া উন্মাদের ন্যায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, “এই বালক দুটাকে মথুরা নগর হইতে দূর করিয়া দাও, যে সকল গোপ ইহাদের সহিত এখানে আসিয়াছে, তাহাদের ধনসম্পত্তি সমস্ত লুট করিয়া লও, দুষ্ট বসুদেবকে, আমার সম্মুখেই শীঘ্র বিনাশ কর, পিতা—আমার পরপক্ষ-

পাতী, অতএব উগ্রসেনও তাঁহার অনুচরগণকে নির্দ্দয়ভাবে সংহার কর।”

শ্রীকৃষ্ণ—কংসের ঐরূপ অহঙ্কারপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে কম্পিতকলেবরে এক লম্ফে রাজমঞ্চে আরোহণ করিলেন, তখন কংস সেই মৃত্যুরূপী কৃষ্ণকে সমীপবর্ত্তী দেখিয়া ত্বরায় অসিবর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন ; ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে রাজমঞ্চ হইতে ভূমে নিক্ষেপ করতঃ কংসের উপর আপনিও পতিত হইয়া পেষন করিতে লাগিলেন। এইরূপে যখন তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ হইতেছিল, সেই সময়ে কংসের অষ্টভ্রাতা এককালে সকলে মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিল। রোহিণীনন্দন—এই গর্হিত কর্ম্মে বাধা দিবার জন্য একা তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া দর্শকবৃন্দকে স্তম্ভিত করিলেন। এবার রামকৃষ্ণ উভয়ে মহাবীর্য্য কংসকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ; ঠিক ঐ সময় সর্ব্বসংহারকারী পার্ব্বতীপতি—পৃথিবী ভেদ করিয়া সভা স্থলে রামকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “হে বীরদ্বয় ! একের সহিত উভয়ে মিলিত হইয়া যুদ্ধ নিয়ম বিরুদ্ধ। এরূপ অন্যায় কার্য্য করিলে সর্ব্বজনে অপযশ কীর্ত্তন করিবে—অতএব আমার উপদেশ মত একের সহিত একজনে যুদ্ধ করিয়া আপন বিক্রম প্রকাশ কর,” এইরূপ উপদেশ দিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কংসরাজকে বিনাশ করিয়া শঙ্করের আদেশ পালন করিলেন।

দুরাত্মা কংস এইরূপে বিনষ্ট হইলে—আকাশ হইতে দুন্দুভি বাজিতে লাগিল। ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ রামকৃষ্ণের উপর পুষ্পবর্ষণ ও তাঁহাদের স্তব করিতে লাগিলেন। এবার রামকৃষ্ণ স্বাধীন ভাবে প্রথমে দেবকীর শৃঙ্খলবন্ধনমোচন করাইয়া কংসাদির বণিতা

দ্বারা যথানিয়মে তাহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করাইলেন এবং বৃদ্ধ উগ্রসেনকে ঐ শূন্য সিংহাসনে অভিষেক করিলেন।

মথুরা সহরের পশ্চিমভাগে ভূতেশ্বর মহাদেবের মন্দির বিরাজিত। স্বয়ং কংস ইহার প্রতিষ্ঠাতা। কথিত আছে, কংসরাজ নিত্য এই দেবকে ভক্তিসহকারে পূজার্চ্চনা করিতেন। ভাদ্র মাসে যে সকল যাত্রী বন পরিক্রম করিতে যাত্রা করেন, তাঁহারা সকলেই এই মহাদেবকে দর্শন করিতে সক্ষম হন, কিন্তু যাঁহারা কেবল মথুরায় আসেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ভগবান ভূতেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করিতে পান না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, সকলেই ঐ মন্দিরের সন্ধান পান না; অতএব মথুরায় উপস্থিত হইয়া আপন পাণ্ডার সাহায্যে এই দেবের অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাঁহার পূজার্চ্চনা করিবেন। প্রবাদ—মথুরায় উপস্থিত হইয়া এই ভূতেশ্বরদেবের অর্চ্চনা না করিলে তিনি ভক্তের সকল তীর্থফলই হরণ করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণগঙ্গা

মানব পঞ্চতীর্থে স্নান করিয়া যে ফললাভ করেন, মথুরায় "কৃষ্ণগঙ্গা" নামে যে বিখ্যাত তীর্থ বিরাজমান আছে—উহাতে স্নান করিলে অপর তীর্থ স্নানাপেক্ষা দশগুণ অধিক ফললাভ হয়। দশহরা দিবসে এদেশবাসী বহু সংখ্যক লোক তথায় স্নান করিয়া আপনাপন মুক্তিপথ পরিষ্কার করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণগঙ্গার কিম্বদন্তী এইরূপ ;—

একদা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম যমুনাতীরে স্ব স্ব বৎস সকল চারণ করিতেছিলেন. সেই সময় কংস চর এক দৈত্য—বৎসরূপ ধারণপূর্ব্বক তাঁহাদের বৎসগণের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ দৈত্যের মায়া জানিতে পারিয়া বলদেবকে উহা দেখাইলেন এবং সহসা তাহার পশ্চাদ্ভাগের দুইটী পদ ধারণ করিয়া শূন্যমার্গে ঘুরাইতে ঘুরাইতে এক কপিত্থ বৃক্ষে নিক্ষেপ করিয়া দৈত্যকে সংহার করিলেন।

অনন্তর তাঁহার বয়স্যগণ উপহাসচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিল, "সখে ! বৎসাসুরকে বধ করায় তোমার গোহত্যা পাপ হইয়াছে, অতএব গঙ্গা স্নানপূর্ব্বক তুমি এই পাপ হইতে মুক্ত হও।" শ্রীকৃষ্ণ বয়স্যগণ কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইলে—তিনি গঙ্গাদেবীকে এই স্থানে আনয়ন করিয়া তাহাতে স্নানপূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত এই তীর্থের নাম "কৃষ্ণগঙ্গা" হইয়াছে।

যে সকল যাত্রী এখান হইতে গোকুল (শ্রীকৃষ্ণের জন্ম স্থান) দর্শন করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা মথুরা হইতেই গোপরাজ নন্দগৃহে যাত্রা করিবেন। মথুরা সহর হইতে গোকুলনগর মাত্র পাঁচ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। মথুরাস্থ যমুনার পূর্ব্ব পার যাবতীয় স্থানই—গোকুল নামে খ্যাত। ইহার অপর নাম মহাবন। মহাবনের এই প্রশস্ত পথ অতিক্রম করিবার সময় কাম্যবনের শোভা দর্শন করিতে ভুলিবেন না। কাম্যবন দ্বাদশবনের মধ্যে চতুর্থ বন। ইহার ন্যায় সুন্দর বন—ব্রজমণ্ডলে আর দ্বিতীয় নাই। কথিত আছে, রাজা যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় পথের ভিখারী হইবার পর এই বনে বাস করিবার সময় শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বাল্যকালে শ্রীকৃষ্ণের এই বন

অতি প্রিয় ছিল, এখানে শ্রীকৃষ্ণের অনেক লীলাস্থানের চিহ্ন অদ্যাপি দর্শন পাওয়া যায়, এমন কি এখানে অন্যূন সহস্র তীর্থ বিরাজিত ; এতদ্ভিন্ন কাম্যবনে গোপবালা যশোমতীর একটী রমণীয় সরোবর আছে। ভক্তিপূর্ব্বক ঐ সরোবরে স্নান করিলে নন্দরাণীর কৃপায় ভক্তের অভীষ্ট ফললাভ হইয়া থাকে।

কাম্যবনে—শ্রীগোবিন্দজীউর রূপ ও বেশভূষা দর্শনে আত্মহারা হইতে হয়। মন্দিরের সন্নিকটেই বৃন্দাদেবী এক মনে শ্রীকৃষ্ণের তপস্যায় রত আছেন। এ তীর্থে এই শ্রীগোবিন্দজীউর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে প্রত্যেক যাত্রীকে চারি আনা ভেট দিতে হয়। এতদ্ভিন্ন এই বনমধ্যে চৌরাশীথাম্ব অর্থাৎ চৌরাশীটী কারুকার্য্যবিশিষ্ট প্রস্তরের থামযুক্ত যে একটী সুন্দর গৃহ আছে, উহার শিল্পনৈপুণ্য দর্শন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ভক্তগণ কাম্যবনে আসিয়া যেরূপে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীগোবিন্দজীউর পূজার্চ্চনা করেন, সেইরূপ এখানকার প্রতিষ্ঠিত কামেশ্বরদেবকেও অর্চ্চনা করিতে অবহেলা করিবেন না।

যে সকল যাত্রী মথুরা হইতে গোকুল নগরের শোভা দর্শন করিতে ইচ্ছা করিবেন,তাঁহারা অশ্বযান বা একায় আরোহণপূর্ব্বক যাত্রা করিয়া থাকেন, কিন্তু যমুনার উপর যে পোল আছে, ঐ প্রশস্ত পোলটীর উপর দিয়া ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী, একা গাড়ী, রেল গাড়ী এবং মনুষ্যদিগের যাতায়াতের পৃথক্ পৃথক্ স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে ; এই পোলটী পার হইবার সময় যাত্রীদিগের নিকট হইতে যে কর ধার্য্য আছে, উহা আদায় করিবার জন্য রেল কোম্পানীর লোক নিযুক্ত আছে। গোকুলবাসী পাণ্ডার নিকট উপদেশ পাইলাম, যথায় পোলটী এক্ষণে স্থাপিত হইয়াছে, পূর্ব্বে এই স্থানেই কংসরাজের কারাগার ছিল, আর যে রেল পথটী ইহার উপর দিয়া প্রসারিত হইয়াছে—উহা বরাবর বৃন্দাবন

পর্য্যন্ত গিয়া শেষ হইয়াছে। আমরা সকলে পদব্রজে প্রত্যেকে এক পয়সা কর দিয়া এই সেতু পার হইলাম এবং ইহার পরপারে যথায় ঠিকা গাড়ীর আড্ডা আছে, ঐ স্থান হইতে কাম্যবন দর্শন ও গোকুলনগর যাতায়াতের গাড়ী ভাড়া করিলাম। মথুরা সহর হইতে যে গাড়ীখানি ৪৲ টাকা ভাড়া ধার্য্য আছে, এখান হইতে সেই গাড়ীখানি ১।৷৽ টাকা ভাড়ায় পাওয়া যায়। ইহার প্রধান কারণ এই যে, প্রত্যেক গাড়ী-খানি এই সেতুর উপর দিয়া যাতায়াত করিলে তাহাকে ৷৽ আনা কর দিতে হয়, এই নিমিত্ত মথুরা সহরের গাড়োয়ানেরা ঐ ৷৽ আনা কর দিয়া যাত্রীর নিকট ২৲ টাকা উচ্চ হারে আদায়ের চেষ্টা করিয়া থাকে।

আর এক কথা—যে সকল যাত্রী অপর তীর্থস্থান হইতে প্রথমেই মথুরায় আসিবেন এবং শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরিগোবর্দ্ধন প্রভৃতি তীর্থগুলির সেবা করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা এই মথুরা সহর হইতেই ঐ সকল তীর্থগুলির সেবা করিতে যাত্রা করিবেন, কারণ এখানে যেরূপ ভাল ভাল একা ও ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া পাওয়া যায়, বৃন্দাবন হইতে যাইলে সেরূপ সুন্দর একা বা গাড়ী ভাড়া পাওয়া যায় না—অধিকন্তু তথা হইতে যাতায়াতের জন্য ভাড়াও অধিক দিতে হয়।
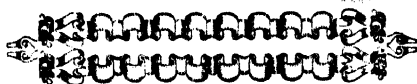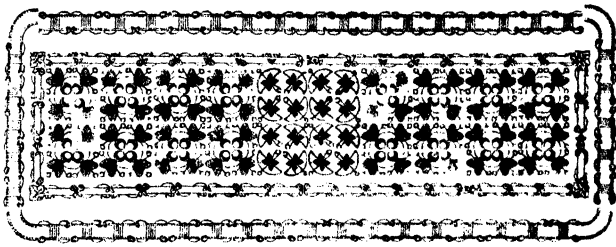
গোকুল

গোপরাজ নন্দভবন—গোকুলনগরের এক উচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এ তীর্থে উপস্থিত হইয়া দুধের গোপাল, ননীর পুত্তলী শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্ত্তিদ্বয়কে ভক্তিসহকারে দর্শন করিলে—তাঁহাদের কৃপায় মানব জীবনের সকল কষ্ট দূর হয়, মনপ্রাণ শীতল হয়। মহারাজ নন্দ ও মহারাণী যশোমতীর বাৎসল্যভাব চিহ্ন সকল অদ্যাপি এখানে দর্শন করিলে প্রেমে পুলকিত হইতে হয়। বহু ভাগ্য ও পুণ্যফল না থাকিলে এ হেন পবিত্র স্থান, কাহারও ভাগ্যে দর্শনলাভ হয় না। এই স্থান নন্দীশ্বর গ্রাম নামে প্রসিদ্ধ। যে নন্দীশ্বরে—জরা, মৃত্যু, দ্বেষ, হিংসা কোন কিছু নাই, যে স্থান—তেত্রিশ কোটি দেবগণের পূজনীয়, যথায় —সকলই আনন্দময়, যে নন্দীশ্বরবাসীগণমাত্রেই—আত্মসুখ বঞ্চিত, অর্থাৎ সকলেই তথায় শ্রীকৃষ্ণ সুখে সুখী। যেখানে—উপস্থিত হইলে ভবযন্ত্রণা দূর হয়, যে নন্দীশ্বর দর্শন করিলে—জন্মান্তরে ভগবান নন্দীশ্বরের শ্রীচরণে স্থান পাওয়া যায়। মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া সেই পুণ্যময় স্থান একবার দর্শন করা কর্ত্তব্য।

গোকুলনগরে প্রবেশ পথের প্রথমেই গর্গমুনির প্রতিমূর্ত্তিটীর দর্শন পাওয়া যায়, তৎপরে বসুদেব ও দেবকী—কংস কারাগারে যেরূপ বিষাদিতাবস্থায় দিনযাপন করিতেন, ঠিক সেইরূপ তাঁহাদের মূর্ত্তিদ্বয়ের

মলিন মুখ দেখিলে পাষাণ প্রাণেও দয়ার সঞ্চার হইয়া থাকে। এই কারাগারের সন্নিকটে কংসরাজের বহু সংখ্যক মল্ল, ভাগ্যবতী যশোদা-দেবী, মহারাজ নন্দ, পর্জ্জন্যগোপ প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতাদিগের প্রতিমূর্ত্তির দর্শন পাওয়া যায়; এতদ্ভিন্ন কংসের পিতা—বৃদ্ধ উগ্রসেন ও শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ লীলাক্ষেত্র "গাউবনে ঝাউ" ইত্যাদি যখন নয়নগোচর হইবে, তখন আনন্দে অধীর হইবেন।

পর্জ্জন্যগোপ—ইনি নারদ ঋষির শিষ্য ও শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ ছিলেন। পূর্ব্বে পর্জ্জন্যগোপ নন্দীশ্বরে বাস করিতেন, কিন্তু দুরাত্মা কেশী দৈত্যের উৎপাতে বাধ্য হইয়া তিনি আত্মীয়স্বজনগণের সহিত এখানে আগমনপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিতে থাকেন। যাত্রীগণ অদ্যাপি এখানে সেই পুণ্যাত্মার মৃণ্ময় প্রতিমূর্ত্তির দর্শন পাইবেন।

নন্দালয়ে—শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানের নিকটেই একটী বৃহৎ পুষ্করিণী বহু সংখ্যক প্রস্তর নির্ম্মিত সোপানশ্রেণীতে শোভিত হইয়া পোৎরা কুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে; ইহার বিষয় কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হওয়ার পর সূতিকা গৃহের বস্ত্রাদি এই কুণ্ডে ধৌত করা হইয়াছিল, এই নিমিত্ত উক্ত পুষ্করিণীটী পোৎরা কুণ্ড নামে খ্যাত হইয়াছে। গোকুলবাসীরা ইহাকে একটী তীর্থ বলিয়া মান্য করিয়া থাকেন; এমন কি, অনেকে এই কুণ্ডের জল পবিত্র জ্ঞানে স্নান, কেহ বা স্পর্শ করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিয়া থাকেন। ভক্তগণও অল্প সময়ের জন্য এই তীর্থে উপস্থিত হইয়া গোকুলবাসীদিগের ন্যায় ইহাকে পবিত্র মনে করিয়া থাকেন।

গোকুলে আসিয়া যাত্রীগণকে সাধারণত তিন স্থানে ভেট দিতে হয় যথা—১। শ্রীকৃষ্ণ বলরামের, ২। মহারাজ নন্দালয়ে, ৩। পর্জ্জন্য গোপালয়ে। উপরোক্ত এই তিন স্থানে ভেট দিয়া এখানকার পাণ্ডা

ব্রজবাসীকে শ্রদ্ধাসহকারে দক্ষিণাদহ ভোজনে তুষ্ট, তৎপরে অভাব পক্ষে আট আনা সুফলের প্রণামীস্বরূপ দান করিতে হয়।

গোকুলে মহারাজ নন্দের বাটীর সন্নিকটেই, ব্রহ্মাণ্ড-ঘাট নামে একটী পবিত্র স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ, একদা গোপবালক-গণ—শ্রীকৃষ্ণসহ ক্রীড়া কৌতুক করিতে করিতে যশোদা রাণীর নিকট সংবাদ দিল, "মা! তোমার কৃষ্ণ আজ আমাদের সহিত খেলা করিবার সময় ক্ষুধায় কাতর হইয়া মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছে, আজ কি তুমি তাহাকে কিছু খাইতে দাও নাই?"

তৎশ্রবণে রাণী লজ্জিত হইয়া উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন, কিন্তু প্রিয় দর্শন শ্রীকৃষ্ণের মুখখানি স্মরণ হইবামাত্র তাঁহার ক্রোধের শান্তি হইল, সুতরাং তিনি ধীরপদে গোপালের নিকট উপস্থিত হইয়া মধুর বচনে বলিলেন, "গোপাল! তুই কি নিমিত্ত আজ মাটী খাইয়াছিস, তোর মায়ের ঘরে কি অভাব ছিল চাঁদ?"

শ্রীকৃষ্ণ জননীর মনোগত ভাব অবগত হইয়া এক লীলা প্রকাশ করিবার অভিলাষে বলিলেন, "না মা—তোমার ঘরে কিসের অভাব যে আমি মৃত্তিকা ভক্ষণ করিব?" যশোমতী তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলেন না, ইহা স্থির বুঝিয়া তিনি পুনর্ব্বার বলিলেন, "মা! যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে তুমি একবার আমার মুখের ভিতরটী দেখ।" এই কথা বলিয়াই তিনি আপন মুখব্যাদন করিলেন, তখন রাণী ঐ শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুদ্র মুখ মধ্যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়া চমৎ-কৃত হইলেন, এমন কি শ্রীকৃষ্ণের সেই ক্ষুদ্র মুখের ভিতর সমস্ত ব্রজ-মণ্ডলও আপনাকে পর্য্যন্ত দর্শন করিয়াছিলেন। এই সময় নন্দরাণী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, একি! আমি জাগ্রত, না নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছি, না আমার মতিভ্রম ঘটিল? যাহা হউক, রাণী পুত্রের

অমঙ্গল আশঙ্কায়, সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা ভগবানের নিকট তাঁহার মঙ্গল-কামনা করিতে লাগিলেন এবং প্রাণের প্রাণ শ্রীকৃষ্ণের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। হায়! মায়ার কি বিচিত্র গতি! জগৎ যাঁহার নিকট কুশল যাচ্ঞা করে—আজ যশোদাদেবী তাঁহারই কুশল তাঁহার নিকটই কামনা করিতেছেন। ধন্য মায়া! শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ঐশ্বর্য্যমায়া বিস্তার করিয়াও যখন যশোদাদেবীর বাৎসল্যভাবের কিছুমাত্র হ্রাস হইল না দেখিলেন, তখন তিনি স্বীয় মায়া সঙ্কোচ করিলেন। যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ এই আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রদর্শন করাইয়াছিলেন, সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানের ঘাটটী "ব্রহ্মাণ্ডঘাট" নামে প্রসিদ্ধ।

শ্রীকৃষ্ণ মায়া সঙ্কোচ করিলে—যশোদা রাণী তাঁহাকে আপন অঙ্কে ধারণপূর্ব্বক সেই কৃষ্ণচন্দ্রের চাঁদমুখখানি বারম্বার নিরীক্ষণ করিতে করিতে স্নেহাভিভূত হইলেন। শ্রীনন্দের নন্দন যে স্থানের মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছিলেন, ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানের মৃত্তিকা অতি সুস্বাদ। যাত্রীগণ এই তীর্থে উপস্থিত হইয়া আগ্রহের সহিত সেই মৃত্তিকা সংগ্রহ করেন এবং আত্মীয়স্বজনকে উপহার দিবার জন্য যত্নের সহিত স্বদেশে লইয়া যান। ভক্তগণ এই ঘাটে স্নান ও শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশে পূজার্চ্চনাপূর্ব্বক যথাশক্তি স্থানীয় পূজারী ব্রাহ্মণকে দান করিয়া থাকেন। ইহার ফলে—অন্তিমে সদ্গতিলাভ করিতে সমর্থ হন।

যদি রূপ ও গুণ কাহারও দুই বর্ত্তমান থাকে, স্বভাবতঃ তিনি সকলকার প্রিয় হইয়া থাকেন, যে শ্রীকৃষ্ণের এত মাহাত্ম্য, তিনি কি আমাদের প্রিয় হইবেন না? আমরা এখানে কি সেই প্রধান পুরুষকে বিস্ময়োৎফুল্লনয়নে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব না? বসুদেব ও দেবকী যাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া বাৎসল্যভাব বিস্মৃত হইয়া ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বহু প্রকার স্তব ও আত্মদুঃখ নিবেদন করিয়া ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রণাম করিয়া-

ছিলেন, সেই আদিপুরুষ বালকরূপ নারায়ণের স্বরূপ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমরা কি একবার তাঁহার স্তবও করিতে পারিব না।

গোকুলে—যে সমস্ত গোপদিগের বাসস্থান আছে, উহার অধিকাংশই খোড়ো ঘর। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অপরাপর প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থানের ন্যায় এখানে কারুকার্য্যবিশিষ্ট প্রস্তর নির্ম্মিত কোন উচ্চ অট্টালিকা প্রতিষ্ঠিত নাই। ইহার কারণ অবগত হইলাম, মহারাজ নন্দের আদেশ মত অদ্যাপি গোপগণ এখানে কাহাকেও ঐরূপ উচ্চ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি দেয় নাই, বা সামর্থ্য থাকিলেও তাহারা নিজে করেন নাই; সুতরাং এই গ্রামে প্রবেশ করিলে ইহা যে গোয়ালার দেশ—তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

এইরূপ আবার গোকুলনগরে যে সমস্ত গোস্বামীগণ বাস করিতেছেন, তাঁহাদের অধিকাংশ শিষ্যই—উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল বা বোম্বাই প্রদেশের গুজরাত বেনিয়া জাতি এবং ক্ষত্রিয়গণকে দেখিতে পাওয়া যায়।

গোকুল হইতে মহাবন অনূ্যন এক ক্রোশ ব্যবধানমাত্র। এই বনে যাইবার নিমিত্ত পাকা প্রশস্ত বাঁধা রাস্তা আছে। মহাবন—যমুনার নিকটবর্ত্তী এক রমণীয় স্থান। এখানে শ্রীবল্লভাচার্য্য গোস্বামীদের কয়েকটী প্রসিদ্ধ দেবালয় বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে শ্রীগোকুলনাথের মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। এখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় মধুবনের শোভা দর্শন করিয়া মথুরায় যাইবেন।

মধুবনে—এক দৈত্যের বাসস্থান ছিল। এ বনের যাবতীয় মধু সেই দৈত্য যত্নের সহিত সংগ্রহ করিয়া রাখিত। একদা বলদেব তাহাকে বিনাশ করিয়া এখানে তাহার সঞ্চিত সমস্ত মধু পান করিয়াছিলেন। অদ্যাপি মধু নামে এক কুণ্ড এখানে বিরাজমান থাকিয়া অতীত ঘটনার

বিষয় সাক্ষ্য দিতেছে। কথিত আছে, পূর্ব্বে এই কুণ্ডে মধুপূর্ণ থাকিত, কিন্তু বলদেব ঐ সমস্ত মধু পান করিয়া নিঃশেষ করাতে এক্ষণে মধুর পরিবর্ত্তে ইহা তীর্থবারিতে পূর্ণ হইয়াছে। যাত্রীগণ যথানিয়মে ঐ কুণ্ডে স্নান, দানাদিক্রীয়াগুলি সম্পন্নপূর্ব্বক চরিতার্থ বোধ করিয়া থাকেন। বলাবাহুল্য, এই মধুকুণ্ড নামক তীর্থটী এখানে অবস্থানের জন্য ঐ বনটী "মধুবন" নামে খ্যাত হইয়াছে। মধুকুণ্ডের এক মাইল ব্যবধানে উচ্চ টিলার উপর বালক ধ্রুবের নির্দ্দিষ্ট তপস্যা স্থান অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সেই স্থানটী পরম রমণীয় ও নির্জ্জন। এখানে উপস্থিত হইলেই প্রকৃত তপস্যা স্থান বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

যে কৃষ্ণ মথুরায় কংসকারাগারে দেবকীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহার চাঁদমুখ নিরীক্ষণ করিয়া বসুদেব মুগ্ধ হইয়া গোকুলনগরে গোপরাজ নন্দগৃহে তাঁহাকে স্থাপন করতঃ কংসরাজের আদেশমত যাবতীয় কষ্টভোগ সহ্য করিয়াছিলেন; যে গোকুলনগরে—শ্রীকৃষ্ণ নন্দরাণী যশোমতীদেবীর যত্নে সুখস্বচ্ছন্দে লালিতপালিত হইয়া গোপবালকগণের সহিত একত্রে গোচারণ করিবার সময় কত আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণ কাহার পরামর্শে কি নিমিত্ত ঐ গোকুলনগর ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে বাস করিতে অভিলাষী হইলেন?

গোকুলনগর হইতে বৃন্দাবন যাইবার কারণ ;—

মায়াময় শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত একদা গোকুলের বনে বনে বৎসচারণ করিবার সময় বলদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে ভ্রাতঃ! আমাদিগের এক্ষণে এ বনে গোপালগণের সহিত ক্রীড়া-কৌতুক করা উচিত বিবেচনা করিতেছি না।" এ কাননের সমস্ত সুখ আমাদের

উপভোগ করা হইয়াছে ; পূর্ব্বের ন্যায় এখানে সেরূপ তৃণ নাই, কাষ্ঠ নাই, সে সকল উচ্চ উচ্চ বৃক্ষও দেখিতেছি না, গোপগণ এখানকার প্রায় সকল বৃক্ষগুলিই ছেদন করিয়াছে। আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, পূর্ব্বে এই স্থানে যে সকল উদ্যান ও উপবন—সুশীতল ছায়াসমন্বিত পাদপরাজি বিরাজিত ছিল, এক্ষণে সে সমস্তই শূন্যপ্রায় হইয়াছে, নিবিড় তরুপল্লবে সমাচ্ছন্ন থাকাতে যে স্থান হইতে বহির্ভাগে দৃষ্টি সঞ্চারিত হইত না, এক্ষণে সেই সকল আশ্রয়তরুর অপসমে চতুর্দ্দিকে পরিদৃশ্যমান হইতেছে কি না? তৃণ বারি আশ্রয়স্থান এ কাননে এক্ষণে নিতান্ত দুর্ল্লভ, পূজনীয় বনস্পতিগণ নিতান্ত বিরল। বৃক্ষগণ ফলশূন্য ও পল্লববিরল হওয়াতে বিহঙ্গগণ স্ব স্ব আলয় পরিত্যাগ করিয়া বনান্তরে প্রস্থান করিয়াছে, এ বনে পূর্ব্বের ন্যায় আর সে সুখ নাই, অরণ্যজাত তৃণকাষ্ঠাদি ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হওয়াতে এই আভীরপল্লীবাসীগণের পক্ষে সে সকল দ্রব্য নিতান্ত দুর্ল্লভ ও নগরের দৃশ্য ক্রমশঃ শ্রীহীন হইতেছে, পর্ব্বতের ভূষণ যেমন—বন, গোপগণের ভূষণ তদ্রূপ গোধন। সেই গোধনই আমাদের—পরম ধন। হে অগ্রজ! তৃণ জলাভাবে যখন সেই গোধনগণেরই কষ্টকর হইতে লাগিল, ইহাতে কি আপনি বুঝিতেছেন না যে, এ স্থানে কোন ক্রমেই আমাদের অবস্থান করা উচিত নয়? যে স্থানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তৃণ, কাষ্ঠ ও সলিলাদি সুলভ, তাদৃশ ভোগবহুল স্থানেই গমন করা আমাদিগের পক্ষে এক্ষণে শ্রেয়ঃ। ধেনুবৎসগণ নিত্য [illegible] তৃণ ভক্ষণে সমুৎসুক, অতএব তাদৃশ তৃণক্ষেত্র সমাযুক্ত বিরামপদ [illegible] বাস করাই নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। অধিকন্তু তত্রত্য গোষ্ঠসমূহের তৃণ-পত্রাদি নিরন্তর গোময় ও গোমূত্র লিপ্ত থাকাতে ধেনুগণ [illegible] উহা প্রায়ই ভক্ষণ করে না, অগত্যা যদিও প্রাণরক্ষা করিবার [illegible] ভক্ষণ করে, তদ্দ্বারা দুগ্ধবতী গাভীগণের দুগ্ধ

সঙ্কোচ হয়; বিশেষতঃ আমি দেখিতেছি, ব্রজবাসী সাধারণ গোপগণের কোন নির্দিষ্ট গৃহ অথবা নিরূপিত ক্ষেত্র নাই, অতএব আমার বিবেচনায় আর এই জঘন্য স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক যথায় সুবিমল শস্পাচ্ছাদিত সমতলক্ষেত্র আছে, তথায় বাস করা কর্ত্তব্য হইতেছে। "হে ধীমান্! আমি বিজ্ঞ লোকদিগের নিকট উপদেশ পাইয়াছি—বৃন্দাবনে যমুনা-তীরে এক রমণীয় কানন বিদ্যমান আছে; তথায় সুকোমল তৃণ, ছায়া-বহুল বৃক্ষ, সুস্বাদু ফল ও নির্ম্মল সলিল প্রচুরপরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমার বিবেচনায় সেই রমণীয় বৃন্দারণ্যে প্রয়োজনীয় কোন বস্তুরই অভাব হইবে না।

ইহার অনতিদূরে মন্দরশৈল সদৃশ গোবর্দ্ধন নামে এক সমুন্নতশিখর, রমণীয় ভূধর বিরাজিত আছে; সেই গিরিগোবর্দ্ধনের শিখরদেশে কাননস্থ দেবদারু মন্দর সদৃশ সুপবিত্র ভাণ্ডীর বট বিদ্যমান। সুরনদী মন্দাকিনী সরিদ্বরা যমুনা ও তদ্রূপ সেই বৃন্দারণ্যের সীমান্তরূপে সুশীতল প্রবাহে বনান্তভাগ নিয়ত পরিবেষ্টিত করিতেছে। হে দেব! এক্ষণে এই কুৎসিত বন পরিত্যাগ করিয়া সাধুবাঞ্ছিত সেই বৃন্দাবনে ঘোষবল সংস্থাপন করাই সৎপরামর্শ বিবেচনা করিতেছি; কেন না তথায় বিচরণ সময়—সুচারু গোবর্দ্ধন, পুণ্যময় ভাণ্ডীরবট এবং সুনীল সলিলা তরঙ্গিণী কালিন্দীকে নয়নগোচর করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিতে সমর্থ হইব, সন্দেহ নাই; কিন্তু উপস্থিত এক্ষণে এ স্থানে কোনপ্রকার বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া গোকুলবাসীগণকে সন্ত্রস্ত না করিলে উহারা সহজে তথায় যাইতে সম্মত হইবে না।"

বিশ্বচক্রী বাসুদেব বলরামকে এই সকল বাক্য নিবেদন করিতেছেন, ইত্যবসরে তাঁহার দেহ হইতে এককালে শত সহস্র বৃক আবির্ভূত হইয়া ব্রজমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিল; সেই শোণিত মাংসলোলুপ

ভীষণ ব্যাঘ্র সকল ব্রজপুরী মধ্যে গাভী, বৎস ও নরনারীগণকে আক্রমণ করাতে সকলেই মহা ভয়ে আকুল হইয়া উঠিল। শ্রীবৎস-লাঞ্ছনাঙ্কিত ভগবদ্দেহোৎপন্ন করালশার্দ্দূলগণ স্থানে স্থানে শত পারামত সংখ্যানুক্রমে দলবদ্ধ হইয়া গোষ্ঠে গোষ্ঠে গাভী ভক্ষণ ও মাতৃক্রোড় হইতে শিশুহরণ আরম্ভ করিতে লাগিল, তাহাতেই ঐ জনাকীর্ণ গোকুল নগর নিতান্ত ভয়স্থান হইয়া উঠিল। কি আশ্চর্য্য, মায়াময়ের মায়া প্রভাবে যে—যেদিকে দৃষ্টিপাত করে, সে—সেইদিকেই যেন মূর্ত্তিমান কৃতান্ততুল্য বিকটাকার বৃকগণ করালবদন ব্যাদন করিয়া জীবকুল গ্রাস করিতে ধাবিত হইতেছে, এইরূপই দেখিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণের এই কৌতুকপূর্ণ বিভীষিকা প্রভাবে ব্রজবাসীগণের মনে এরূপ বিষম শঙ্কাকুল হইল যে, কেহই আর সাহস করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারিল না। বলাবাহুল্য, ইহার ফলে ব্রজবাসীগণের বনগমন, গোচারণ ও যমুনায় স্নান এককালে রহিত হইল।

ব্রজমণ্ডলে আভীরপল্লীবাসীরা তখন সকলে মন্ত্রণা করিয়া স্থির করিল যে, ভয়ানক নখর দংষ্ট্রাসম্পন্ন বিচিত্র পিঙ্গলবর্ণ ব্যাঘ্রগণ সমূলে আমাদের সর্ব্বনাশসাধন করিবার পূর্ব্বে এই বিপদসঙ্কুল স্থান পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কারণ ব্রজমণ্ডলের চারিদিকেই করুণ আর্ত্তনাদ শ্রুত হইতেছে, কেহ—ঐ আমার ভ্রাতাকে আক্রমণ করিল, কেহ—এই আমি জীবনসর্ব্বস্ব স্বামীধনে বঞ্চিত হইয়া ব্যাঘ্র কর্তৃক অনাথা ও বিধবা হইলাম, আবার কেহ বা হায়! হায়! আমার ঐ দুগ্ধবতী গাভীগণকে করাল ব্যাঘ্র গ্রাস করিল; প্রতি রজনীতেই এইরূপ করুণার্ত্তনাদে ব্রজপুরী পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল, রমণীগণের অবিশ্রান্ত রোদনধ্বনিতে ও বৎসহারা গাভীগণের শোকার্ত্ত হাম্বারবে গোকুলে আর কর্ণপাত করা যায় না, অতএব শীঘ্র এই শ্বাপদপূর্ণ আপদাপন্ন ভীষণ স্থান পরি-

ত্যাগ করিয়া গো-ধনগণের সুখসেব্য এবং আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার শঙ্কাশূন্য নিরাপদ স্থানে বাসার্থ গমন করাই যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে। ব্রজবাসীগণ এইরূপ পরামর্শ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণের একবার মতামত জিজ্ঞাসা করিলে—তিনি মৃদুহাস্যসহকারে সেই শান্তি রসাস্পদ পরম সুখস্পদ বৃন্দারণ্যকে নির্দ্দেশ করিয়া সকলকে ঐ স্থানে বাস করিতে উপদেশ দিলেন এবং সেই রমণীয় স্থানে স্নেহাস্পদ পুত্র-কন্যা ও সুখাস্পদ গোধন সমভিব্যাহারে সকলে নিরাপদে পরম সুখে অবস্থান করিতে পারিবেন, তাহাও প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

গোপপতি মহারাজ নন্দ—তখন শ্রীকৃষ্ণের কথামত নগরমধ্যে দূত দ্বারা ঘোষণা করিলেন যে, "ব্রজধাম গোকুল পরিত্যাগ করিয়া গোপগণকে সবান্ধবে ত্বরায় বৃন্দাবনে যাত্রা করিতে হইবে, অতএব হে পুরবাসিগণ! তোমরা সত্বর সুসজ্জিত হও, যত শীঘ্র পার শকট যোজনা কর, গো-গণের রজ্জু মুক্ত করিয়া দাও, আর অপেক্ষা করিবার অবসর নাই। দূতমুখে ঐ গভীর সমুদ্র নির্ঘোষণ বাক্য বিনির্গত হওয়াতে ঘোষ-পল্লী যেন পুনঃ পুনঃ আকুলিত ও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; ব্যাঘ্র ভয় হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া বৃন্দাবন গমনার্থ সকলেই এককালে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। যথানুক্রমে গমনোপযুক্ত সমস্ত আয়োজন সম্পাদন করিয়া গোপগোপীগণ ব্যস্তভাবে স্ব স্ব গৃহ হইতে বহির্গত হইল, তাহা-দের সুবিচিত্র দীপ্তিমান শকটসমূহ দ্রুতবেগে পরিচালিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন মহার্ণবহৃদয়ে দ্রুতগামিনী তরণীবৃন্দ মারুত-হিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া ইতস্ততঃ ভাসমান হইতেছে।

গাভী বৎসসমূহ নানাবর্ণে রঞ্জিত ও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পুচ্ছসঞ্চালন, বিষাণ বিকম্পন—গ্রীবাভঙ্গী করিতে করিতে গমন করাতে বোধ হইল, যেন বিচিত্র রংএর পতাকাবলী পরিশোভিত বিবিধাকার তরণীমালা

সফেন বীচিমালাসঙ্কুল জলধিস্রোত ঘূর্ণায়মান হইয়া প্রবাহিত হইতেছে; পন্থাবিহারী গোপবৃন্দ স্কন্দবিলম্বিত রজ্জুদাম ধারণ করিয়া গমন করাতে দূর হইতে এই দৃশ্য দর্শন করিলে মনে হইতে লাগিল—যেন পল্লবাকীর্ণ বটবৃক্ষের স্কন্দদেশ হইতে সুদীর্ঘ শুভ্রমঞ্জরী নিম্নগামিনী হইয়া ভূমিস্পর্শ করিতেছে। দধিপসরা ও গর্গরীশীর্ষ গোপনারীগণ—কেহ শূন্য হস্তে, কেহ বা পুত্রক্রোড়ে মরালগমনে সুচারুনূপুর সিঞ্চনে দশদিশি প্রতিশব্দিত করিয়া নানা রঙ্গে গমন করাতে বোধ হইতে লাগিল—তাহাদের সুরঞ্জিত চাক্‌চিক্যশালী টাকা পরিশোভিত মনোহর বদনমণ্ডলগুলি যেন—আকাশবিহারী নক্ষত্রমালার ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে; কোথাও বা নবযৌবন-দীপ্তিশালিনী সুচারুহাসিনী পীনোন্নত-পয়োধরা সুন্দরী কামিনীগণের নীলাম্বর, পীতাম্বর, লোহিতাম্বর শোভা যেন—বর্ষাকাল বিরাজিত ইন্দ্রধনুকে উপহাস করিতেছে; সকল গোপ-গোপাঙ্গনাগণের মঙ্গলযাত্রা ও আনন্দ কোলাহলে বহু দূরব্যাপী বৃন্দারণ্য অপূর্ব্ব শব্দ ও অপূর্ব্ব কলরবে পরিপ্লুত হইতে লাগিল। এইরূপে সেই বহু জনাকীর্ণ গোকুলনগর অল্পক্ষণের মধ্যেই জনশূন্য হইল। ব্রজবন শোভা এক্ষণে চঞ্চলা কমলার ন্যায় শ্রীবৃন্দাবনে আশ্রয় করিল; ব্রজবাসীগণ এই বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক গোধনগণের বিরামার্থে তথায় বাসস্থান নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন, গোপগোপীগণের শয়নার্থ বস্ত্র চর্ম্মাবৃত চতুষ্পদী খট্টা সকল ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত সকল যথাযথ স্থানে সংস্থাপিত হইল, শিল্পচতুর গোপগণ বিচ্ছিন্ন বৃক্ষশাখোপরি তৃণ-স্তবন বিস্তার করিয়া মন্থনভাণ্ডের আবরণ প্রস্তুত করিল; নবযৌবনসম্পন্না গোপাঙ্গনাগণ গর্গরা মস্তকে সলিলানয়নার্থে বহির্গত হইয়া বৃন্দাবনের শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন। এইরূপে নিত্য নবলীলা কৌতুকে গোপগোপীকাগণের আনন্দের ইয়ত্তা রহিল না।

গাভীগণ নন্দনসদৃশ বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া মনের সুখে নির্ভয়ে অজস্র ধারে অমৃতধারার ন্যায় দুগ্ধ প্রদান করিতে লাগিল।

সর্ব্বচিত্তরঞ্জন সুকুমার শ্রীকৃষ্ণ—বন বিচরণকালে যখন গোপগণের সহিত বৃন্দাবনে সমাগত হইলেন, তখন নিদারুণ নিদাঘকাল সুখময় বৃন্দাবনকে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডকায় পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। ভগবান মধুসূদন তথায় উপস্থিত হইবামাত্র সুধাধারে বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল; যেন নবজলদকান্তি শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনার নিমিত্ত দেবগণ স্বর্গ হইতে অমৃত বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

রামকৃষ্ণ বৃন্দাবনে এইরূপে বৎসচারণ করিয়া পরম সুখে বিহার করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ কালিন্দীসলিলে—জলবিহার, কুঞ্জে কুঞ্জে—বনবিহার এবং গোষ্ঠে গোষ্ঠে—গোষ্ঠবিহার করিয়া গোপালগণের সহিত দিন দিন মহা আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। ক্রমে বর্ষাকাল সমাগত, গগনমণ্ডল ইন্দ্রধনু সমলঙ্কৃত, জলধরগণ মুহুর্মুহুঃ গভীর গর্জ্জন-সহকারে সুগন্ধি বারিধারা বর্ষণে ধরাতল পরিসিক্ত করিতে আরম্ভ করিল। নবনীর সিক্ত ঝঞ্ঝাবাত প্রবাহে বনভূমি সম্মার্জ্জিত হইয়া যেন নবযৌবনশালিনী সুন্দরী কামিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল, কানন মধ্যে দুঃসহ সৌরানল ও দাবানলের সম্পর্কমাত্র রহিল না।

এইরূপে দিবারাত্রি বৃষ্টি, কখন দিবস, কখন শর্ব্বরী, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। গোপগোপিনীগণ সদাসুখে বিভোর হইয়া দিনমানকেই রজনী বলিয়া অনুমান করিতে লাগিলেন। মায়াময়ের মায়াপ্রভাবে বস্তুতঃ দিবাযামিনীতে কিছুমাত্র প্রভেদ ছিল না। রোহিণীনন্দন বলরাম, কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের সহিত নবব্রজে সমুপস্থিত হইলে—তাঁহারা উভয়ে পরস্পর পরস্পরের চিত্ত প্রীতিসম্পাদনপূর্ব্বক তদানীন্তন জ্ঞাতি গোপবৃন্দের সন্তোষ উৎপাদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে

তাঁহারা এখানে প্রত্যহ গোপালগণের সহিত মিলিত হইয়া বিবিধ কৌতুকে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

একদা স্বেচ্ছাবিহারী বাসুদেব লতাপাদপপরিশোভিত যমুনাকূলে উপস্থিত হইলেন; তথায় সুশীতল জলকণা-স্পর্শী সুখস্পর্শ সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইতেছে, কল্লোলিনী যমুনা-তরঙ্গ অপাঙ্গ বিস্তার করিয়া বক্ষ বিকম্পনপূর্ব্বক বায়ুসহ ক্রীড়াচ্ছলে ধীরে ধীরে নৃত্য করিতেছেন, প্রফুল্ল-কমল-কুমুদ অপরাপর জলদ-কুসুম ও জলচরজীবকুলে যমুনা সমাকীর্ণ; স্থানে স্থানে রমণীয় তীর্থ. বর্ষাবেগপ্রভাবে তীরতরুগণ উৎপাটিত হইয়া স্রোতমধ্যে নিপতিত হইতেছে—হংস, সারস প্রভৃতি পক্ষীগণের কলরবে কলিন্দনন্দিনী যমুনা নিরন্তর নিনাদিত হইতেছেন। বর্ষারম্ভে আদিত্যনন্দিনী যেন মোহিনীরূপ ধারণ করিয়াছেন। খরতরস্রোত তাঁহার—চরণ, সমুন্নততীরভূমি তাঁহার—নিতম্ব, ঘূর্ণায়মান আবর্ত্ত তাঁহার—নাভিপদ্ম, সলিল-বিকশিত তাঁহার—রোমরাজি, তরঙ্গত্রয় তাঁহার—সুললিত-ত্রিবলী, চক্রবাক-যুগল তাঁহার—পয়োধর, তীরপার্শ্ব-সংযোগ তাঁহার—প্রফুল্ল আনন ও হাস্য, রক্তোৎপল তাঁহার—ওষ্ঠ, নীলোৎপল তাঁহার—ভ্রূ, শত দল তাঁহার—নেত্র, সুপ্রশস্ত হ্রদ তাঁহার ললাট, সুনীল শৈবাল তাঁহার—কেশকলাপ, সুদীর্ঘস্রোত তাঁহার—বিস্তীর্ণ বাহু, বিকশিত কাশকুসুম তাঁহার—শুভ্রবাস, শাখাপল্লবাকীর্ণ তীরতরুগণ তাঁহার—অলঙ্কার, মৎস্যগণ তাঁহার—খেলনা, পদ্মপত্র তাঁহার—উত্তরীয়, সারসের সুস্বর তাঁহার—নূপুর, নক্রকুম্ভাদি তাঁহার—অনুলেপন এবং সুবিমল স্বচ্ছসলিল তাঁহার—স্তন দুগ্ধ।

যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ—সেই সমুদ্রমোহিনী আশ্রমশোভিনী যমুনাকে নয়নগোচর করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। তিনি সেই নদীতীরে বিচরণ করাতে শোভাময়ী সূর্য্যতনয়ার লাবণ্যমাধুরী যেন শতগুণে

পরিবর্দ্ধিত হইল। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ গোপ ও গোপিণীগণের সহিত নানা স্থানে নানা প্রকার লীলা প্রকাশ করিয়া সুখানুভব করিতে লাগিলেন।

একদা এই সময় জিঘাংসাপরায়ণ দুর্দ্দান্ত "কেশী-দৈত্য" কংসরাজার নির্দেশানুসারে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া—গোপ, গোপাল ও গোধনগণের প্রাণসংহারপূর্ব্বক তাহাদিগের মাংস ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল; সেই দুরাচার দানবের অনিবারিত উপদ্রবে—বৃন্দাবন মানিবাস্থি পূর্ণ হইয়া যেন শ্মশানভূমি সদৃশ বীভৎসদর্শন হইয়া উঠিল, তাহার প্রচণ্ড খুর-ক্ষেপে ও গতিবেগে বৃক্ষ সকল ভগ্ন এবং অবস্থান স্থানের ভূমিখণ্ড বিদারিত হইতে লাগিল। দৈত্যের সেই ভীষণ চীৎকারে পবনগর্জ্জন পরাভূত করিয়া লম্ফপ্রদানে আকাশপথ অতিক্রম করিতে আরম্ভ করিল, তাহার সেই প্রচণ্ড পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাণ্ড কেশবজাল—সপ্তপত্র পাদপের ন্যায় সমুন্নত, আক্রোশ ও জিঘাংসায়—দ্বিতীয় কংসের ন্যায় ভয়াবহ!

অদ্ভুতকর্ম্মা সেই দুরাত্মা কেশী দৈত্য প্রমত্তভাবে গোপ ও গোধন-গণের জীবনবিনাশে প্রবৃত্ত হইলে—বৃন্দাবন যেন জীবসমাগম শূন্য হইয়া পড়িল। একদা ঐ গোমাংস ও নরমাংসলোলুপ দুরাশয় অশ্বরূপী দানব যেন কালপ্রেরিত হইয়া সাহঙ্কারোন্মত্তভাবে ঘোষপল্লী মধ্যে প্রবেশ করিলে—তথাকার গোপগোপীগণ সেই ভীষণাকার তুরগাসুরকে দর্শন করিবামাত্র ভয়বিহ্বলচিত্তে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে স্ব স্ব পুত্র কন্যা-গুলিকে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইল। তখন অরাতি-নিসূদন শ্রীকৃষ্ণ—তাহাদিগকে সান্ত্বনা বাক্যে অভয়প্রদানপূর্ব্বক প্রফুল্ল-বদনে পাপাশয় কেশীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে, দুরাত্মা কেশী—শ্রীকৃষ্ণকে নিকটে পাইয়া ক্রোধে বিস্ফারিতলোচনে বিকট দর্শন বিকাশপূর্ব্বক গ্রীবা উন্নত করিয়া হ্রেষারব করিতে করিতে পবনবেগে তদভিমুখে

ধাবমান হইল, তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণও নির্ভয়ে তাহার আগমন পথে অগ্রবর্ত্তী হইলেন; সামান্য মানববুদ্ধি গোপগণ তাঁহাকে ঐ ভীষণ অশ্বসুরের সম্মুখীন হইতে দর্শন করিয়া সভয় সংশয়কুলচিত্তে বলিতে লাগিলেন, "হে বৎস! নিবৃত্ত হও, এই দুরন্ত অশ্ব—মহাপরাক্রমশালী, তুরঙ্গদল মধ্যে উহার তুল্য হিংস্র ও বলবান আর দ্বিতীয় নাই; কেহই উহাকে দমন করিতে সমর্থ নহে—তুমি বালক, কদাচ উহাকে পরাভব করিতে পারিবে না। এই দুর্দ্দমনীয় তুরগাধম দুরাচার নৃপাধম কংসের সহোদর-তুল্য প্রিয়তম সহচর, উহাকে বিনাশ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নয়।" সর্ব্বদর্পহারী শ্রীমধুসূদন মানবস্নেহকাতর গোপগণের তাদৃশ সভয়বাক্য শ্রবণে মনে মনে মৃদুহাস্য করিয়া—মুহূর্ত্তমধ্যে ঐ দুর্জ্জয় অসুরকে কটি-দেশ হইতে মস্তক অবধি সমশরীর দ্বিধা করিয়া সংহার করিলেন। তদ্দর্শনে দেবগণ স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বলাবাহুল্য, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কেশী-দৈত্য এইরূপে বিনষ্ট হইলে বৃন্দাবনে সকলেই নিশ্চিন্ত ও নিরুপদ্রব হইলেন। গোপরাজ নন্দ শ্রীকৃষ্ণের এই অলৌকিক ক্ষমতা দর্শনে স্নেহভরে বারম্বার তাঁহার মুখচুম্বন করিয়া সৃষ্টি-স্থিতিলয়কর্ত্তার নিকট তাঁহার মঙ্গলকামনা করিতে লাগিলেন।

বৃন্দাবনে যে স্থানের ঘাটের উপর শ্রীকৃষ্ণ—কেশী-দৈত্যকে সংহার করিয়াছিলেন, সেই অবধি ঐ স্থান কেশী ঘাট নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পাপমতি দুর্জ্জয় কেশী—শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শমাত্র এখানে পরম গতিলাভ করিয়াছিল বলিয়া এই কেশী ঘাটে মস্তক মুণ্ডন এবং স্নানদান করিবার প্রথা হইয়াছে।

এইরূপে গোকুলনগরের শোভা সন্দর্শন করিয়া আমরা সকলে এখান হইতে ব্রজমণ্ডলের তীর্থগুলির সেবা করিতে প্রস্তুত হইলাম।
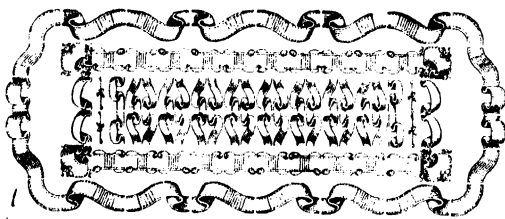
ব্রজ-মণ্ডল

মথুরা, বৃন্দাবন, গোকুল, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরিগোবর্দ্ধন প্রভৃতি স্থানগুলি ব্রজমণ্ডল নামে খ্যাত।

শ্যামকুণ্ড—মথুরা সহর হইতে প্রায় আট ক্রোশ দূরে অবস্থিত। যাত্রীদিগকে মথুরা হইতে তথায় যাইতে হইলে ঘোড়ার গাড়ী, এক্কা গাড়ী, উষ্ট্রের গাড়ী বা গো-শকটে যাইতে হয়। এই প্রশস্ত পথ অতিক্রম করিবার জন্য বাঁধা রাস্তা আছে। শ্যামকুণ্ডের মধ্যপথে গোবর্দ্ধন তীর্থ, শান্তন তীর্থ, মানসী তীর্থ প্রভৃতি তীর্থগুলির সেবা করিতে পাওয়া যায়।

শান্তন-কুণ্ড

শান্তন-কুণ্ডের অপর নাম গন্ধেশ্বরী তীর্থ। শান্তনুমণি এই রমণীয় স্থানে তপস্যা করিয়া বাঞ্ছিত ফললাভ করিয়াছিলেন বলিয়া এই তীর্থের নাম শান্তন-কুণ্ড হইয়াছে। এখানে যে একটী সরোবর আছে, কথিত আছে—ভক্তিসহকারে উহাতে সঙ্কল্প করিয়া তাহার পবিত্রবারি স্পর্শ করিলে, ঋষির কৃপায় ভক্তের মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। এ তীর্থে সঙ্কল্প করিবার পর সাধ্যমত তীর্থগুরুকে এক পয়সা হইতে এক আনা পর্য্যন্ত দক্ষিণা দিবার প্রথা আছে।

গিরি-গোবর্দ্ধন তীর্থ

মথুরার পশ্চিমদিকে—শান্তন কুণ্ড হইতে প্রায় চারি মাইল দূরে এই প্রসিদ্ধ তীর্থটী অবস্থিত। গিরি গোবর্দ্ধন—সাক্ষাৎ ভগবানের স্বরূপ বলিয়া কথিত।

পূর্ব্বকালে মহারাজ নন্দ ও গোপ সকল দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রসন্ন করিবার মানসে তাঁহার পূজা করিতেন; কারণ গোপ সকলের গো-পালন ও কৃষিকর্ম্মই একমাত্র জীবিকা নির্ব্বাহের সম্বল ছিল। তিনি সন্তুষ্ট থাকিলে সময়মত সুবৃষ্টি হইবে, তদ্দ্বারা উত্তমরূপে শস্যাদি উৎপন্ন হইবে—ইহাই উহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল

একদা মহারাজ নন্দ ও গোপ সকল চিরপ্রথানুসারে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ইন্দ্রপূজার আয়োজন করিতেছেন—এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, গোপগণ অতি সমারোহে ইন্দ্রপূজায় ব্যস্ত। তিনি ভাবিলেন, যখন আমি স্বয়ং এখানে অবস্থান করিতেছি, তখন অন্য দেবতার কিরূপে এ স্থানে পূজার্চ্চনা হইতে পারে? এরূপ চিন্তা করিয়া তিনি গোপগণকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া ইন্দ্রপূজার পরিবর্ত্তে গিরি-গোবর্দ্ধনের পূজা করিতে উপদেশ দিলেন, কিন্তু তিনি নিজে যে গোপালরূপে গোবর্দ্ধন, তাহা কোনরূপে প্রকাশ করিলেন না। গোপ-রাজ নন্দ ও অন্যান্য গোপ সকল শ্রীকৃষ্ণের সেই যুক্তিপূর্ণ তর্কগুলি হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইন্দ্রদেবের পরিবর্ত্তে মহাসমারোহে গিরি-গোবর্দ্ধনেরই পূজার্চ্চনা করিলেন।

এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র—তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সময়ে পূজাপ্রাপ্ত না হওয়াতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মেঘ সকলকে প্রবলবেগে বারিবর্ষণ করিতে

আদেশ দিলেন। বর্ষণাধিপতি ইন্দ্রের আদেশপ্রাপ্তে—মেঘ সকল প্রবলবেগে বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে শিলাবৃষ্টি, অশনিপাতও হইতে লাগিল। এইরূপে ব্রজমণ্ডলে মহাপ্রলয়কাণ্ড উপস্থিত হইলে—ব্রজবাসীদিগের হাহাকারধ্বনিতে ব্রজমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। শ্রীকৃষ্ণ—তাঁহাদের ক্লেশ দূর করিবার উপায় স্থির করিয়া গিরিরূপ অপর এক কৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করতঃ সেই গোবর্দ্ধন নামক প্রশস্ত গিরি উত্তোলনপূর্ব্বক চিন্তান্বিত ব্রজবাসীদিগকে তন্মধ্যে ধেনুসহ অব-স্থান করিতে আদেশ করিলেন এবং বালকরূপ রামকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে মহা-রাজ নন্দের নিকট উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। গোপগণ গিরিরূপ সাক্ষাৎ দেবতার আদেশ প্রাপ্তে গোপিনীগণ ও আপনাপন গোধন সহিত ঐ গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে তথায় প্রাণরক্ষা করিতে লাগিলেন।

যাত্রীগণ এ তীর্থে উপস্থিত হইয়া যে প্রশস্ত গিরি গোবর্দ্ধন দর্শন ও প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনরূপ ধারণ করিয়া ইহাকে সাতদিন সাত রাত্রি একাধিক্রমে স্বীয় বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা অবলীলাক্রমে ধারণ করিয়া আপন মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র—শ্রীকৃষ্ণের এই অলৌকিক কাণ্ড দর্শনে মনে মনে লজ্জিত হইয়া মেঘ সকলকে তৎক্ষণাৎ বারিবর্ষণ করিতে নিষেধ করিলেন ; আদেশমাত্র বর্ষণ বন্ধ হইয়া আকাশ পরিচ্ছন্ন হইল। অন্ত-র্যামী শ্রীকৃষ্ণ—দেবরাজের অন্তরের ভাব অবগত হইয়া ব্রজবাসীদিগকে আপনাপন গোধন লইয়া এই গিরিগহ্বর হইতে বাহিরে যাইতে আদেশ করিলেন ; তাঁহারাও বিনা আপত্তিতে দেবাজ্ঞা পালন করিলে —গোবর্দ্ধনরূপ সাক্ষাৎ ভগবান সেই গিরিকে যথাস্থানে স্থাপন করি-লেন। তখন ব্রজবাসীদিগের আনন্দের সীমা রহিল না, কারণ বালক

কৃষ্ণের উপদেশ মত তাঁহারা—যে দেবের পূজার্চ্চনায় রত হইয়াছিলেন, আপৎকালে তিনি স্বয়ং মূর্ত্তিমান হইয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিলেন, ইহা অপেক্ষা আর সৌভাগ্য কি হইতে পারে। গোবর্দ্ধনরূপী শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে ব্রজবাসীদিগকে দেবরাজ ইন্দ্রের কোপানল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া গোপগণ তদবধি দেবরাজের পরিবর্ত্তে ঐ নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রতি বৎসর এখানে গিরিরাজের পূজা করিয়া থাকেন। পাঠক-বর্গের প্রীতির নিমিত্ত গোবর্দ্ধনদেব যেরূপে তাঁহার কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা ব্রজবাসীদিগকে গিরি উত্তোলনপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার একটী চিত্র প্রদত্ত হইল।

কথিত আছে, এই গোবর্দ্ধন নামক প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থানে—শ্রীকৃষ্ণ সদাসর্ব্বদা ব্রহ্মা, শিব ও লক্ষ্মীদেবীসহ বাস করিয়া থাকেন। এ তীর্থে যথায় গিরিরাজের মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানে যে একটী বৃক্ষ আছে, সেই বৃক্ষের পত্রের সহিত অনেক পত্র "প্রস্তুত ঠোঙ্গার ন্যায়" দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ—শ্রীকৃষ্ণ ঐ পত্র ঠোঙ্গায় গোপী-দিগের নিকট হইতে ননী খাইয়াছিলেন। ইহার সন্নিকটে মানসী গঙ্গা নামে আর একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ বর্ত্তমান আছে। যাত্রীগণ তথায় গমন করিয়া কর্ত্তব্যবোধে উহাতে সঙ্কল্পপূর্ব্বক পাণ্ডার সাহায্যে মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক স্নান, কিম্বা ইহার পবিত্র বারি মস্তকে সিঞ্চন করিয়া তৎপরে তীর্থ পাণ্ডাকে সাধ্যমত কিঞ্চিৎ দক্ষিণা প্রদানে এখানকার নিয়মগুলি পালন করিয়া থাকেন।

মানসীগঙ্গা-তীর্থ

যখন মহারাজ নন্দ ও গোপ সকল বালক কৃষ্ণের উপদেশ মত গোবর্দ্ধনদেবের পূজা করিয়াছিলেন, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের মানসেই এই পূজা স্থানে গঙ্গার আবির্ভাব হয়—এই কারণে এই তীর্থকুণ্ডটীর নাম মানসী-গঙ্গা হইয়াছে। মানসী-গঙ্গার একদিক সোপানশ্রেণী দ্বারা আবৃত এবং ইহার তীরে—যাত্রীদিগের বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত উচ্চ অট্টালিকা শোভা পাইতেছে।

মানসী-গঙ্গার উত্তরতীরে চক্রেশ্বর বা চাকলেশ্বর মহাদেব বিরাজমান আছেন। এই প্রশস্ত চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমণ্ডলের মধ্যে ভগবান মহেশ্বর চারি স্থানে চারি নামে অবস্থানপূর্ব্বক পূজ্য হইয়া বিদ্যমান আছেন। যথা—বৃন্দাবনে গোপেশ্বর, মথুরায়—ভুতেশ্বর, গোবর্দ্ধনে —চাকলেশ্বর ও কাম্যবনে—কামেশ্বর নামে খ্যাত হইয়াছেন। কথিত আছে, গোবর্দ্ধন তীর্থে ভক্তগণ যাবতীয় তীর্থ নিয়মগুলি পালন করিয়া যদি এই ভগবান চাকলেশ্বরকে অর্চ্চনা করিতে অবহেলা করেন, তাহা হইলে তিনি কুপিত হইয়া তাহার যাবতীয় তীর্থ ফল হরণ করিয়া থাকেন।

গোবিন্দকুণ্ড—মানসী-গঙ্গার এক মাইল উত্তরে গোবিন্দকুণ্ড নামে আবার একটী তীর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। এই ত্রিলোকপূজ্য কুণ্ডের চারিদিক নানাবিধ তরুমূলে সজ্জাকৃত। এখানে ময়ূর-ময়ুরী ও বানরগণের নানাপ্রকার লম্পঝম্পসহকারে নৃত্য দেখিলে মনে হইবে—যে তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাঁহাকেই অন্বেষণ করিতেছে। এই স্থান অতি রমণীয় এবং এই কুণ্ডের জল অতি নির্ম্মল। কথিত আছে,

গোবর্দ্ধন দেব যেরূপে তাঁহার কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর দ্বারা গিরি উত্তলোন করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহারই দৃশ্য।

গোবর্দ্ধনে শ্রীকৃষ্ণ দেবরাজ ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করিয়া ব্রজবাসীদিগকে তাঁহার কোপানল হইতে উদ্ধার করিলে পর, দেবরাজ তাঁহার ভ্রম জানিতে পারিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে নানাপ্রকার স্তবে তুষ্ট করিয়া স্বর্গের যাবতীয় দেবগণসহ এখানে উপস্থিত হইয়া এই পবিত্র কুণ্ডটী নির্ম্মাণ করেন, অধিকন্তু পৃথিবীর সমস্ত তীর্থবারি আনয়নপূর্ব্বক ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এই কুণ্ডে অভিষেক করিয়া তাঁহাকে গোবিন্দ নামে অভি-হিত করেন। তদবধি এখানকার এই তীর্থকুণ্ডটী "গোবিন্দকুণ্ড" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। স্থানীয় ব্রজবাসীদিগের নিকট উপদেশ পাইলাম, ভক্তিসহকারে এই কুণ্ডে স্নান বা যথানিয়মে ইহাতে তর্পণ করিলে—শ্রীগোবিন্দের কৃপায় বহু যজ্ঞের ফললাভ এবং অন্তে পিতৃপুরুষদিগের সহিত বৈকুণ্ঠে স্থানপ্রাপ্ত হওয়া যায়। আরও অবগত হইলাম, এই গোবিন্দকুণ্ডতীরে বহু পূর্ব্বে গোপাল—মৃত্তিকাচ্ছাদিত অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন। একদা দুগ্ধদানচ্ছলে তিনি মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীকে কৃপাপূর্ব্বক দর্শনদান করিয়াছিলেন, ইহার ফলে পুরীগোসাই তাঁহার অবস্থানের বিষয় স্বপ্নে অবগত হইয়া তথা হইতে তাঁহাকে নিজালয়ে আনয়নপূর্ব্বক মহাসমারোহে অন্নকুট উৎসব করিয়াছিলেন। কথিত আছে, স্বয়ং গোপাল মূর্ত্তিমান হইয়া এই উৎসবে উহা ভোজন করিয়া-ছিলেন। তদবধি এই নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রতি বৎসরই এখানে অতি সমা-রোহে ঐ অন্নকুট উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত মানসী-গঙ্গার একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল।

শ্রীরাধা-কুণ্ড

এই তীর্থে যাত্রীদিগের বিশ্রামের বিশেষ সুবিধা আছে। কেন না, এখানে দ্বিতল পাকা ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত থাকায় যাত্রীগণ সুখ-স্বচ্ছন্দে বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হন, কিন্তু বানরকুলের দৌরাত্ম্যে সতত সাবধানে থাকিতে হয়।

রাধাকুণ্ডের সন্নিকটে শ্যামকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড ও মহলার কুণ্ড নামে সারি সারি চারিটী পবিত্র কুণ্ড আছে, তন্মধ্যে শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড এই দুইটীই বিখ্যাত এবং ভক্তগণ এখানে আসিয়া এই দুই কুণ্ডেরই সেবা করিয়া আপনাপন জীবন সার্থক বোধ করিয়া থাকেন। অপর দুইটী লুপ্ত প্রায়, কেবল চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

কংসচর—অরিষ্টাসুর এখানে যখন তখন উৎপাত করিয়া ব্রজবাসীদিগের অনিষ্ট করিত। একদা শ্রীকৃষ্ণ সেই দুর্জ্জয় অসুরকে সর্ব্বসমক্ষে সংহার করিয়া ব্রজবাসীদিগকে পরিত্রাণ করেন। অরিষ্টাসুরের বৃষের ন্যায় আকৃতি থাকায় সে জনসমাজে বৃষাসুর নামে খ্যাত হইয়াছিল।

এই তীর্থের সন্নিকটে যতগুলি দেবালয় প্রতিষ্ঠিত আছে. ঐ সকল দেবালয়ে কেবল লীলাময় শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিরই দর্শন পাওয়া যায়, আবার বৃন্দাবনের ন্যায় এখানেও শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন দেবের মন্দির আছে, কিন্তু বৃন্দাবনের ন্যায় এখানে কোথাও ভেট দিতে হয় না। ভক্তগণ সাধ্যানুসারে কেবল প্রণামী দিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীদিগের নিকট ননী খাইয়া বৃক্ষের গাত্রে যে যে স্থানে হস্ত মুছিয়াছিলেন, অদ্যাপি এখানে সেই সকল বৃক্ষগাত্রে তাঁহার ননীর হস্তলেপন চিহ্ন বর্ত্তমান থাকিয়া অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান

মানসী গঙ্গার দৃশ্য।

[২৭২ পৃষ্ঠা।
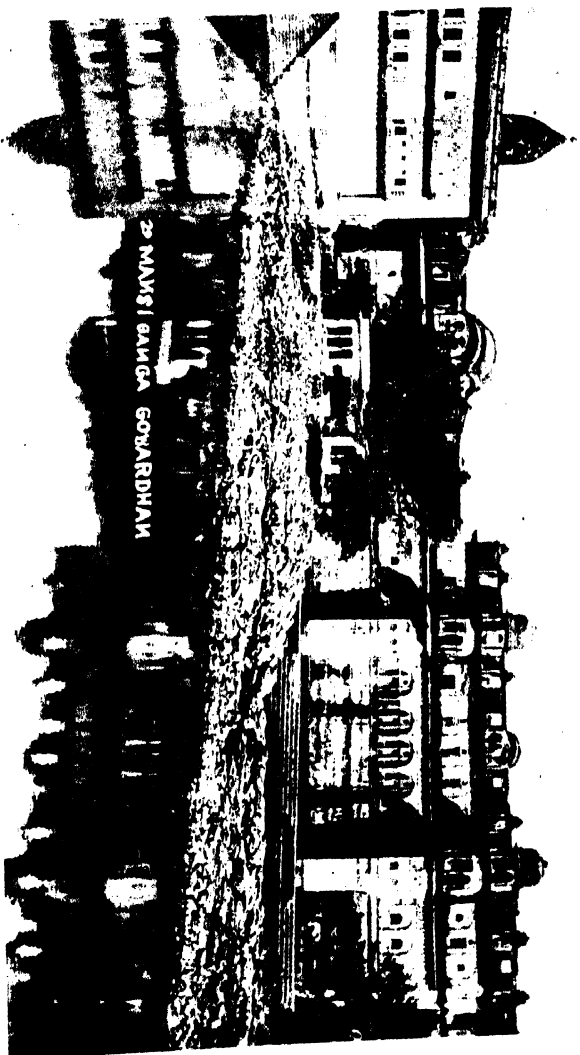
করিতেছে। এতদ্ভিন্ন মণিপুররাজার এখানে যে প্রাসাদ বর্ত্তমান আছে, তথায় যে অপূর্ব্ব বিগ্রহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন, উহা কর্ত্তব্যবোধে দর্শন করিবেন।

শ্যামকুণ্ডের উৎপত্তি

শ্রীকৃষ্ণ বৃষাসুরকে সংহার করিয়া সখা ও ধেনুবৎসাদিগকে স্থানান্তরে প্রেরণপূর্ব্বক তিনি একাকী এখানে ভ্রমণ করিতে করিতে এক স্থানে উপনীত হইয়া দেখিলেন—বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা প্রিয়সখীগণসহ প্রফুল্লমনে তথায় পুষ্পচয়ন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশসহকারে বলিলেন, "কে প্রত্যহ আমার এই মনোহর উদ্যানে শাখাপল্লবাদি ভগ্ন করিয়া পুষ্পচয়ন করে, আমি অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তাহাদের কোন সন্ধান করিতে পারি না? আজ ভাগ্যবলে তোমাদের সন্ধান পাইয়াছি," এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া ধরিতে গেলেন।

শ্রীমতী সখীগণসহ তখন একবাক্যে বলিলেন, "এইমাত্র তুমি বৃষাসুরকে সংহার করিয়া গো-হত্যা পাপগ্রস্ত হইয়াছ, অতএব আমাদের যেন স্পর্শ করিও না।"

শ্রীকৃষ্ণ গোপবালাদিগের বাক্যে কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া বিনয়বচনে তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সুন্দরিগণ! আমি কোন্ প্রায়শ্চিত্ত করিলে—এ পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিব? যদি জানা থাকে, তাহা হইলে আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল, আমি তোমাদেরই উপদেশানুযায়ী উহা সম্পাদন করিব।"

তদুত্তরে ব্রজেশ্বরী বলিলেন, "পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থে স্নান করিলে তুমি এ পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে।" শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীমতীর বাক্যে মনে

মনে ভাবিলেন, যদি আমি এক্ষণে সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়া আসি, তাহা হইলে হয় ত এই গোপবালিকাদের বিশ্বাস না হইতে পারে, অতএব ইহাদের সম্মুখেই এই কার্য্য সম্পাদন করা উচিত। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তিনি স্বীয় বংশী দ্বারা একটী সরোবর প্রস্তুত করিয়া ভূমি-তলে পদাঘাত করিবামাত্র ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় পাতাল হইতে ভোগবতীর জল ও তীর্থ সকল পৃথিবী ভেদ করতঃ একে একে আগমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তীর্থ সকল তথায় উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তন্মধ্যে স্নান করিয়া পুনরায় গোপিনীদিগের নিকট গমন করিবামাত্র—তাঁহারা তীর্থসমূহের আগমন একেবারে অস্বীকার করিলেন; সুতরাং তিনি বাধ্য হইয়া তীর্থগণকে স্ব স্ব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্রীমতীর নিকট উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন। আদেশপ্রাপ্তে তাঁহারা নিজ নিজ মূর্ত্তিতে গোপিনীদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া আপনাপন পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন, তখন আর তাঁহাদের অবিশ্বাসের কোন সন্দেহ রহিল না। এইরূপে শ্যামকুণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছিল। যিনি এ তীর্থে উপস্থিত হইয়া যথানিয়মে ইহাতে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান, তর্পণ করেন, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাহার সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ হয়—কেন না, পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ সকল শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় সলিলরূপে এই কুণ্ডে অবস্থান করিতেছেন। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত শ্যামকুণ্ডের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল।

রাধাকুণ্ডের আবির্ভাব

শ্যামকুণ্ডের সৃষ্টি হইলে—শ্রীমতী রাধিকাও ঐরূপ একটী পবিত্র কুণ্ড প্রস্তুত করিতে অভিলাষ করিয়া সখীগণের সাহায্য প্রার্থনা করি-লেন। শ্রীরাধার অভিলাষ পূর্ণ করিবার মানসে তাহারা সদলে শ্যাম-

শ্যাম কুণ্ডের দৃশ্য।

[১০২ পৃষ্ঠা]
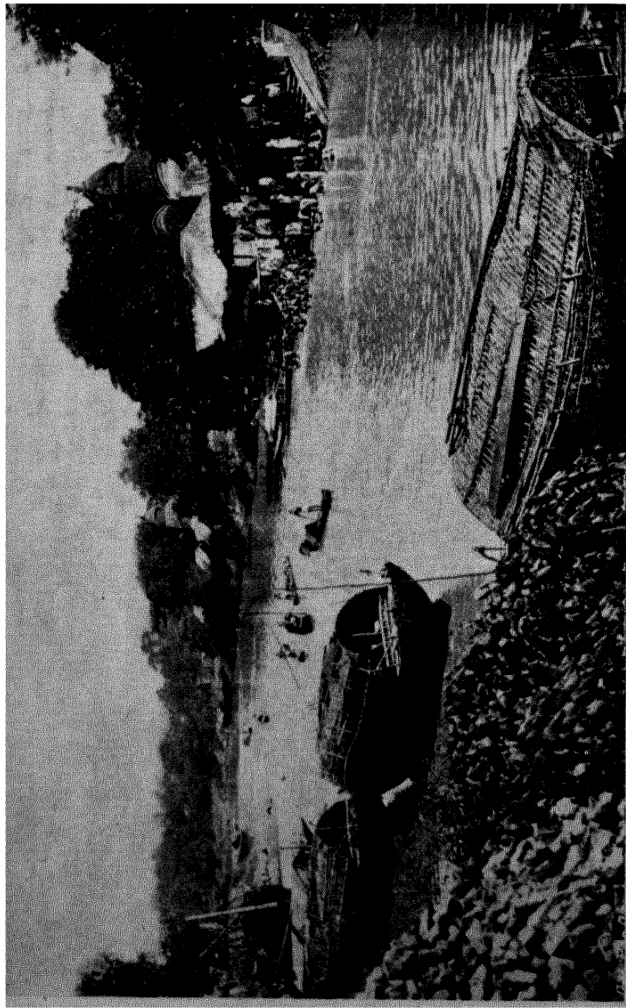
কালীঘাট হইতে পীঠস্থানের মন্দির পর্য্যন্ত সাধারণ দৃশ্য। [১৯ পৃষ্ঠা।

কলিকাতা প্রেস।

ণ্ডের উত্তরে বৃষাসুরের ক্ষুরক্ষত এক স্থান পরিষ্কাররূপে খনন করিয়া কটী মনোহর সরোবর নির্ম্মাণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কৌতুক দেখিবার ন্য ঐ সরোবর জলপূর্ণ হইতে দিলেন না, তখন সখীগণ বিস্ময়াপন্ন ইয়া চিন্তান্বিত হইলেন। জগচ্চিন্তামণি শ্রীমতীকে চিন্তাযুক্তা অব- লাকন করিয়া—ব্যঙ্গছলে বলিলেন, "তুম্যো! তোমাদের সরোবর মামার ন্যায় জলপূর্ণ করিতে পারিলে না, এখন কক্ষে গগরা লইয়া মামার কুণ্ড হইতে জল আনিয়া ইহাকে পরিপূর্ণ কর।"

গোপবালাগণসহ শ্রীমতী রাধিকা তখন একবাক্যে বলিলেন, তোমার কুণ্ডের জল পাতকযুক্ত। কেন না, তুমি গো-হত্যা করিয়া উহাতে স্নান করিয়াছ, ঐ কুণ্ডের জল আনিয়া ইহা পূর্ণ করিলে ইহাও অপবিত্র হইবে। যদি একান্ত ইহা তীর্থবারিতে পূর্ণ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমরা মানস সরোবরের পবিত্র নির্ম্মল জল আনিয়া ইহা নিশ্চয় পূর্ণ করিব। শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীগণের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে— তীর্থ সকলকে ইঙ্গিত করিলেন। তীর্থগণ তাঁহার মনোভাব অবগত হইয়া শ্রীরাধার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে উপনীত হইয়া তাঁহার স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে শ্রীমতী তাঁহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া তীর্থ সকলকে স্বীয় কুণ্ডে আবির্ভাব হইতে আদেশ প্রদান করিলেন; তখন তীর্থগণের শুভাগমনে রাধাকুণ্ডটীও পবিত্র তীর্থবারিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এইরূপে রাধাকুণ্ডের আবির্ভাব হইল।

কথিত আছে, যে ব্যক্তি শুদ্ধচিত্তে ভক্তিসহকারে এই কুণ্ডদ্বয়কে পূজার্চ্চনা করেন, তিনি অক্ষয় হইয়া ত্রিসংসারে সুখে অবস্থান করিতে পারেন, এমন কি শ্রীরাধাকৃষ্ণের কৃপায় অন্তিমে তিনি পিতৃপুরুষদিগের সহিত বৈকুণ্ঠে স্থানপ্রাপ্ত হন।

এই কুণ্ডদ্বয়ের অর্চনার সময়—থালা, গেলাস, সাড়ী, শাঁখা, আতপ-

চাউল, দুগ্ধ, চিনি, ফুল প্রভৃতি উপাদান সকল সংগ্রহপূর্ব্বক তীর্থপদ্ধতি অনুসারে ব্রাহ্মণ দ্বারা মন্ত্র উচ্চারণ এবং পূজা করিতে হয়। কথিত আছে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীসহ ভক্তের ঐ পূজা গ্রহণ করেন। যে ব্যক্তি ব্রজমণ্ডলে উপস্থিত হইয়া এই কুণ্ডদ্বয়ের অর্চ্চনা না করেন, তাহার সমস্ত জীবন বৃথায় নষ্ট হয়

শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড উভয় কুণ্ডই পাশাপাশি অবস্থিত এবং আকৃতিতে বর্ত্তমানকালে প্রায় একই রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। উভয় কুণ্ডেরই চতুর্দ্দিক প্রস্তরময় সোপানশ্রেণী দ্বারা বাঁধান এবং সুশোভিত। ইহাদের তীরভূমিতে যে সকল উচ্চ উচ্চ প্রাচীন বৃক্ষ সকল শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান আছে, তাহাদের অবস্থা দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, যেন তাহারা নতশিরে যথার্থ শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণ ধ্যান করিতেছে। এই তীর্থক্ষেত্রে—কুণ্ডের উপরিভাগের চতুর্দ্দিকে যে সকল পদচিহ্ন দর্শন পাওয়া যায়, সেই সমস্তগুলিই শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাখেলার চরণ চিহ্ন বলিয়া জানিবেন।

আহা! ব্রজবাসীগণ অতি পুণ্যাত্মা, কারণ পদচিহ্নধারী ও বিচিত্র ভূষণধারী কমলাদেবী যাঁহার আজ্ঞাবহ, সেই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহারা এখানে একত্রে গোচারণ করিয়া কত আনন্দ অনুভব করিয়াছেন। ভগবান যুগে যুগেই নরদেহ ধারণ করতঃ জন্ম গ্রহণ এবং পাপীদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কখন কোন জন্মে এত সুখ অনুভব করেন নাই, যেরূপ তিনি দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণরূপে এই ব্রজমণ্ডলে ব্রজবালাদিগকে লইয়া কেলী-কৌতুকে সুখানুভব করিয়াছেন! তাঁহার প্রতি পদবিক্ষেপে এ পুরী যে শুদ্ধ হইয়াছে, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, সুতরাং ব্রজের সমস্ত রজগুলিও পবিত্র হইয়াছে।

বন-পরিক্রমা

ব্রজ চৌরাশী ক্রোশের প্রদক্ষিণকেই "বন-পরিক্রমা" বলে; কেহ কেহ আবার ইহাকে বন যাত্রা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় দশমী তিথির অপরাহ্নকালে বৃন্দাবন হইতে এই পরিক্রমা আরম্ভ হইয়া ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে ইহার সমাপ্ত হয়। কোন্ দিনে কোন্ বনে কিরূপ লীলা দর্শন হয়, পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত নিম্নে উহা সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল।

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাদশমীর অপরাহ্নকালে—যাত্রীগণ ব্রজবাসী পাণ্ডা এবং বনযাত্রার সরঞ্জমসহ বৃন্দাবন হইতে প্রথম যাত্রা করিয়া মথুরা সহরে অবস্থান করেন এবং ভগবান ভূতেশ্বরদেবের মন্দিরে রাত্রিযাপন করিয়া থাকেন। এখানকার ভূগর্ভে পাতালদেবী নামক এক ভগবতী-মূর্ত্তির দর্শন লাভ হয়। বলাবাহুল্য, এই নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীত বৎসরের মধ্যে অপর কোন সময় বন-পরিক্রমার সুবিধা নাই।

পর দিবস একাদশীতিথিতে যাত্রীগণ এখান হইতে তালবন, মধুবন এবং কুমুদবনের শোভা দর্শন করিয়াই বিশ্রাম করিয়া থাকেন।

দ্বাদশীতিথিতে—শান্তনুকুণ্ড এবং বহুলাবন দর্শন করিয়া নিশ্চিন্ত হন। বহুলাবনের অপর নাম "বাটী"। এই বহুলাবনে কৃষ্ণ সরোবরের তীরে কেবল বহুলা নাম্নী একটী প্রস্তর নির্ম্মিত গাভীর দর্শন করিয়া ভক্তগণ আপনাপন ব্রত উদ্যাপন করিয়া থাকেন।

ত্রয়োদশীতিথিতে—শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, মহলারকুণ্ড ও ললিতা-কুণ্ডের সেবা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এ তীর্থে যাত্রী-দিগের বিশ্রামস্থানের জন্য কোনরূপ কষ্টভোগ করিতে হয় না, কিন্তু পূর্ব্বাহ্নে আসিয়া স্থান অধিকার করিতে হয়।

কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতিথিতে—গোবর্দ্ধনপর্ব্বত,মানসী-গঙ্গা, চকলেশ্বর, সনাতন গোস্বামীর ভজনকুটীর, মাধবেন্দ্রপুরীর কক্ষ, আনোরগ্রাম প্রভৃতি বিস্তর তীর্থকুণ্ডের সেবা করিয়া শেষে শ্রীহরিদেবজীউর দর্শন-পূর্ব্বক ব্রতপালন করিতে হয়। এই দিবস যাত্রীগণ মনের সুখে তীর্থ-গুলির সেবা করিয়া একদিকে যেরূপ সন্তুষ্ট হন, অপরদিকে সেইরূপ কষ্টভোগ করিয়া থাকেন।

অমাবস্যাতিথিতে—লঠাবন। এই বনমধ্যে ভরতপুর মহারাজের একটী সুদৃঢ় দুর্গ এবং একটী মনোমুগ্ধকর উপবন দেখিয়া যাত্রীগণ আপনাপন পরিশ্রমের সার্থকতা বিবেচনা করিতে থাকেন। কারণ এই উপবনে বৃন্দাবনের সাহাজীর মন্দিরাভ্যন্তরের ন্যায় যে সমস্ত ফোয়ারা সজ্জিত আছে, চিরপ্রথানুসারে ঐ সমস্ত ফোয়ারাগুলি সেই নির্দ্দিষ্ট দিনে খুলিয়া দেওয়া হয়। এদিন এখানকার এক নয়নানন্দ-দায়ক দৃশ্য।

প্রতিপদতিথিতে—কাম্যবনে অবস্থান করিতে হয়। এই দিবস অপরাহ্নকালে দলে দলে যাত্রীদিগের শুভাগমনে এই বন এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়া থাকে।

দ্বিতীয়া তিথিতে—সেতুবন্ধ, লুকালুকী-কুণ্ড, ব্যোমাসুরের গুম্ফা, মহাদধি তীর্থ, কামেশ্বর মহাদেব, পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস স্থান প্রভৃতি পবিত্র স্থান দর্শন করিয়া—শেষ বিমলাদেবীর দর্শনান্তে বিশ্রাম সুখ অনুভব করিয়া থাকেন।

তৃতীয়া তিথিতে বর্ষাণ—আলতা-পাহাড়ী, কদমখণ্ডী, দেহকুণ্ড, এই কুণ্ডতীরে একটী আশ্চর্য্য বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার ফল-গুলি ঠিক নূপুরের ন্যায় আকৃতি, আবার সেইগুলি শুকাইলে ঠিক নূপুরের ন্যায় শব্দও হইতে থাকে। এই তীর্থে দোহনকুণ্ড নামে যে
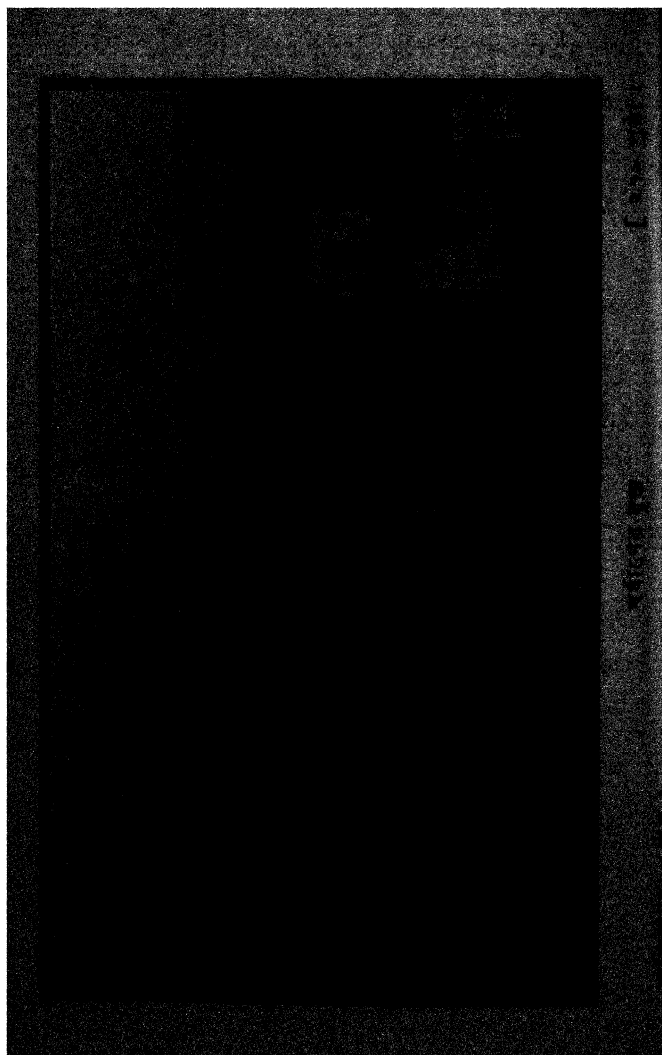
কুণ্ড বর্ত্তমান আছে, তাহার তীরেও একটী অদ্ভুত বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার পাতাগুলি ঠোঙ্গার আকারবিশিষ্ট, যাত্রীগণ এই সকল ঠোঙ্গা সংগ্রহ করিয়া জল, দুগ্ধ, দধি প্রভৃতি রাখিয়া মনের সুখে ভগবানের মহিমা প্রকাশ করিতে থাকেন। বর্ষাণে—বৃষভানুনান্দনীর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিলে নয়ন চরিতার্থ হয়। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত বর্ষাণের একখানি মনোমুগ্ধকর চিত্র প্রদত্ত হইল।

চতুর্থী তিথিতে—নন্দীশ্বর নামক পর্ব্বতে নন্দভবন, নন্দগ্রাম, জবাটগ্রাম, চরণ চিহ্ন, প্রেমসরোবর প্রভৃতি পুণ্য স্থান দর্শন করিয়া থাকেন।

পঞ্চমী দিবস—কোটবন, কোকিলবন, শেষশায়ী প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া আপন ব্রত উদ্যাপন করেন। এখানে একটী পুষ্করিণী আছে, উহার জলের আস্বাদ—যেন লবণে গোলা।

ষষ্ঠী দিবস—কেবল খেলন বন দর্শন করিয়া নিশ্চিন্ত হন।

সপ্তমীর দিবস—রামঘাট অর্থাৎ যে স্থানে বলরাম রাসলীলা করিয়াছিলেন, তৎপরে অক্ষয়বট, বস্ত্রহরণ ঘাট দর্শন করিয়া থাকেন।

অষ্টমী দিবস—পাণীগ্রামে উপস্থিত হইয়া শ্রীমতীর মন্দির, মানসরোবর, তৎপরে বেলবনে—শ্রীলক্ষ্মীদেবীর প্রতিমূর্ত্তির পূজা; সর্ব্বশেষে ভদ্রবন, মাঠবন, ভাণ্ডীর বন—এই বনমধ্যে শ্রীদামের মূর্ত্তি দর্শন পাইবেন। বোধ হয়, পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণের বাল্যসখা ছিলেন এবং যাঁহার অভিসম্পাতে শ্রীমতী রাধিকাকে কেহ "মা" বলিয়া সম্বোধন করেন না।

নবমী দিবস—লোহবন, আনন্দা-বিনন্দীদেবী, রোহিতনন্দন শ্রীবলদেবমূর্ত্তি, ক্ষীরসাগর, ব্রহ্মাণ্ডঘাট ও মহাবন দর্শন করিয়া থাকেন।

দশমীর শেষ দিন—গোকুলনগর, কোলগ্রাম, ভূতেশ্বর মহাদেবের

দর্শন ও অর্চ্চনাপূর্ব্বক মহাব্রত উদ্যাপন করিয়া বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বলাবাহুল্য, এই বন-পরিক্রমার প্রশস্ত সময়ের মধ্যে যাত্রীদিগকে নানারূপ ক্লেশভোগ করিতে হয়, কেন না—কোথাও বর্ষার প্রকোপে ভিজা কাপড় ও ভিজা বিছানায় শয়ন—মশার তাড়না, কোথাও বানরের দৌরাত্ম্য, অনিয়ম আহার,আবার কোথাও বা জল ও কাদায় অবস্থান, এইরূপ নানাপ্রকার বিড়ম্বনাভোগ করিয়া পুণ্য উপার্জ্জন করিতে হয়। এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও এই বন-পরিক্রমার যাত্রী—বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল যাত্রীদিগের মধ্যে বেশীর ভাগই স্ত্রীলোক।

এই স্থানে একটী কথা বলিবার আছে—তীর্থ স্থানমাত্রেই ভগবানের একটী-না-একটী বিগ্রহ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। ইহার প্রধান কারণ এই যে—সেই বিগ্রহ মূর্ত্তিটিকে ভগবানের স্বরূপ মূর্ত্তি বলিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে হয়, কেন না—ভক্তি বিনা মুক্তি হয় না।

গুণময়ী নিতান্ত দুস্তরা ভগবানের এক শক্তি যাহা "মায়া" নামে খ্যাত—প্রত্যেক বিগ্রহ মূর্ত্তিটী প্রতিষ্ঠা হইবার পর, তাহাতে উহাই বর্ত্তমান থাকে। অকপটচিত্তে যাহারা তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহারাই ঐ মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। আর্ত্ত (রোগ, ভয়, বিপদ ও পাপাদিতে কাতর) আত্ম-জ্ঞানাভিলাষী, অর্থাভিলাষী ও জ্ঞানী—এই চারি প্রকার পুণ্যবান লোক ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে অকপট ভক্ত বা জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। কথিত আছে, এই জ্ঞানবান ভক্তই ভগবানের একান্ত প্রিয়। পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার উপাসকই যথাসময়ে তাঁহার কৃপায় মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। জ্ঞানই আত্মস্বরূপ বলিয়া কথিত। স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম—তিনি বহুরূপী! যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে তাঁহার যে মূর্ত্তির উপাসক হয়, তিনি তাহাকে সেই

মূর্ত্তিতে দর্শনদানে উদ্ধার করিয়া থাকেন। অজ্ঞ ব্যক্তিরা ভগবানকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ অবগত না হইয়া কেবল তাঁহার লীলাধৃত মূর্ত্তিকে "অবতার" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি প্রচ্ছন্নভাবে যোগমায়ায় আচ্ছন্ন, সুতরাং কেহই ভগবানের স্বরূপমূর্ত্তির দর্শনলাভ করিতে সমর্থ হন না, অর্থাৎ ভগবান পর্দানশীল যুবতীর ন্যায় চিকের আড়ালে থাকেন বলিয়া কেহ তাঁহার দর্শন পান না।

অবতার—যিনি জন্ম রহিত, নশ্বরস্বভাব ও সকলের ঈশ্বর, প্রকৃতির আশ্রয় লইয়া আত্মমায়ায় জন্মগ্রহণ করেন—তিনিই অবতার। যে যে সময় ধর্ম্মের বিপ্লব, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সময়েই ভগবানকে অবতাররূপে অবতীর্ণ হইতে হয়। সাধুদিগের পরিত্রাণ, অসাধুদিগের বিনাশ ও ধর্ম্মস্থাপনের নিমিত্ত ভগবান—যুগে যুগে অবতাররূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন।
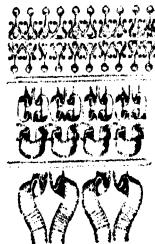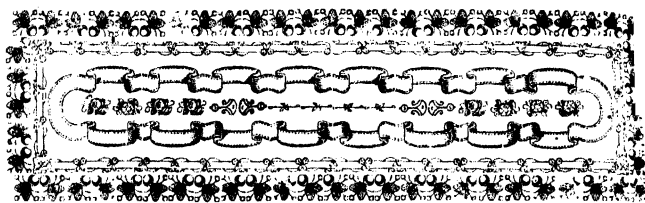
বৃন্দাবন

মথুরা হইতে বৃন্দাবন অন্যূন সাত মাইল দূরে যমুনার তীরে অবস্থিত। এই প্রশস্ত পথ অতিক্রম করিবার জন্য পাকা বাঁধা রাস্তা প্রস্তুত আছে। যাঁহারা মথুরা হইতে রেলযোগে বৃন্দাবন যাত্রা করিবেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে /৫ পয়সা রেলটিকিট খরিদ করিয়া যাইতে হয়. ইহাতে খরচের সুবিধা হয় সত্য, কিন্তু যাঁহাদিগের পর্দ্দানশীল স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকেন, গাড়ী ভিন্ন এক পা অগ্রসর হইবার উপায় নাই, ঐ সকল ব্যক্তি—বৃথা ঘোড়ার গাড়ী ও রেলগাড়ীতে লাঞ্ছনাভোগ না করিয়া মথুরা হইতে বরাবর ঘোড়ার গাড়ীতে আরোহণপূর্ব্বক বৃন্দাবন যাত্রা করিলেই সুবিধা হয়, কারণ মুটে খরচ ও গাড়ী ভাড়া সকল একত্রে হিসাব করিলে প্রায় একই রূপ খরচ হইয়া থাকে। মথুরা হইতে হাঁটাপথে যাত্রা করিতে হইলে এখানে বৃন্দাবন গেট নামে যে ফটক আছে, উহারই মধ্যপথ দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। যে স্থানটী বৃন্দাবন গেট বলিয়া খ্যাত, সেই স্থানে ত্রিলোকপূজ্য গোকর্ণ মহাদেব বিরাজমান। কথিত আছে, এই স্থান বিশ্বনাথ বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয়। যাত্রীগণ কর্ত্তব্যবোধে এখানে এই ভগবান গোকর্ণ মহাদেবের পূজার্চ্চনা করিবেন।

মথুরা হইতে এই প্রশস্ত সাত মাইল পথ অতিক্রম করিবার সময় যমুনা তীরবর্ত্তী ও নগরের মধ্য স্থানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কত লীলা-

খেলার চিহ্ন দর্শন হইয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই। হাঁটাপথে, পদব্রজে বা অশ্বযানে গমন করিলে ইহাই উপরিলাভ বলিয়া ধরিতে হইবে। যাত্রীগণ বৃন্দাবনের এই পথে যতই নিকটবর্ত্তী হইবেন, ব্রজবাসী পাণ্ডাগণকে ততই যেন তৃষিত চাতকের ন্যায় যাত্রী সংগ্রহ করিবার জন্য অবস্থান করিতে দেখিতে পাইবেন। ভক্তগণ বৃন্দাবনে পৌঁছিবামাত্র কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত মহাগোলযোগ উপস্থিত হয়, কারণ এখানে ব্রজবাসী (পাণ্ডা) গণ শ্রাবণ মাসের বারিধারার ন্যায় যাত্রীদিগকে প্রশ্নে প্রশ্নে বিব্রত করিতে থাকেন, তাঁহাদের সকলকারই মুখে এই এক কথা শুনিতে পাইবেন, "আপনার ব্রজবাসী কে? কোন জাতি? পদবী কি? নিবাস কোথায়? ইত্যাদি।" অবশেষে নূতন যাত্রী তাঁহাদের যত্নে মুগ্ধ হইয়া এই সকল ব্রজবাসীর মধ্যে একজনকে তীর্থগুরুপদে মান্য করিয়া লন, কিন্তু যাঁহাদের পুরাতন ব্রজবাসী আছেন, তাঁহারা তাঁহারই সন্ধান করিতে থাকেন।

এই তীর্থগুরু ব্রজবাসীর নিকট যাত্রীগণকে পুত্তলিবৎ ঘুরিয়া-ফিরিয়া বৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান সকল দর্শন করিতে হয়। তাঁহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যাহা দর্শন করান, যাত্রীরা তাহাই দর্শন পাইয়া থাকেন, যে স্থান তাঁহারা না দেখাইবেন—উহা কিরূপে দেখিতে পাইবেন, কারণ সকল যাত্রীদিগের এই প্রশস্ত পঞ্চক্রোশী বৃন্দাবনের সমস্ত লীলাস্থান জানা থাকে না। আমার এই পুস্তকখানি নিকটে থাকিলে সহজেই সেই প্রাচীন লীলাস্থলী ও মন্দিরাদি কোন্ স্থানে কোন্ পথে অগ্রসর হইলে, কোন্ কোন্ দেবমূর্ত্তির দর্শনলাভ হইবে এবং ঐ সকল দেবালয় কতদিন প্রকটিত বা কাহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উহা সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

যাত্রীগণ এখানে উপস্থিত হইবামাত্র প্রথমে শ্রীগোবিন্দজীউর লাল

বর্ণের পুরাতন মন্দির, তৎপরে জগদ্বিখ্যাত শেঠজীর ও অপরাপর উচ্চ মন্দির সমূহের দৃশ্য দর্শন পাইবেন। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত বৃন্দাবনের সেই মন্দিরারণ্যের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল।

বৃন্দাবনে এই সকল মন্দিরের যত নিকটবর্ত্তী হইবেন, ব্রজবাসী ভিক্ষুকগণের সুললিত মধুর সঙ্গীতধ্বনি ততই শুনিতে পাইয়া আপনারা যে প্রকৃত বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াছেন, উহা স্পষ্ট জানিতে পারিবেন। এখানে কোন ভিক্ষুকের নিকট নিম্নলিখিত গানটী শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইবেন।

"শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরিগোবর্দ্ধন।
মৃদু মৃদু বংশীবাজে এই যে বৃন্দাবন॥"

কেহ বা ভূমে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া গাহিতে থাকিবে—

ধূলা নয়, ধূলি নয়, গোপীপদ রেণু।
এই ধূলা মেখেছিল, নন্দ-বেটা-কানু॥

কেহ বা জয় রাধে শ্রীরাধে স্বরে, কেহ বা রাধাশ্যাম স্বরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের গুণগান করিয়া মনমাতোয়ারা স্বরে ভিক্ষা প্রার্থনা করিতে থাকিবে, কেহ বা খোল করতাল লইয়া কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া ব্রজরজে বিলুণ্ঠিত হইয়া হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলিয়া নয়নজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে থাকিবে, আহা! সেই প্রেমপূর্ণচিত্ত সকল দর্শন করিলে পাষাণ প্রাণেও ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। এইরূপ—নানা ছলে নানা প্রকার ভিক্ষার্থী—ভক্তবৃন্দকে বেষ্টনপূর্ব্বক তাঁহাদের চিত্ত আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত বলিতে থাকিবে—

ভক্তবৃন্দ আসি, কহে হাসি হাসি।
গয়া কাশী ছোড়কে সবে হ'ব বৃন্দাবনবাসী॥

যখন এখানে এইরূপ ভক্তিরসপূর্ণ গীত সকল কর্ণকুহরে প্রবেশ

করিবে, তখনই জানিবেন যে, আপনারা যথার্থই শ্রীধাম বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। যে ধাম দর্শনের কাঙ্গাল হইয়া পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি ও সংসারের মায়া ত্যাগ করিয়া কত অর্থ, কত কষ্ট সহ্য করিয়া কত বন, উপবন অতিক্রমপূর্ব্বক কৃপাময়ের কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে এক্ষণে এই পবিত্র ব্রজরজে উপনীত হইলেন, আজ সৌভাগ্যক্রমে লীলাময় শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির শ্রীচরণ দর্শন করিয়া স্বীয় নয়ন ও জীবন সার্থক করুন।

বৃন্দাবন—বৈষ্ণবদিগের একটী প্রাচীন মহা তীর্থ স্থান এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি।

গোবিন্দ—পদরজঃপূত পুণ্যতীর্থ বৃন্দাবন হিন্দুর দৃষ্টিতে শান্তির তপোবন। এই বৃন্দারণ্যের অন্তর্গত বিস্তৃত ভূখণ্ড মধ্যে দ্বাদশটী বিখ্যাত বন আছে—পূর্ব্বে তথায় বিশ্বমাতা রাধার সহিত রাধানাথ মনের সুখে বিহার করিতেন। শ্রীগোবিন্দের এই লীলা-নিকেতনে—ময়ূর-ময়ূরী, মৃগ-মৃগী, বানর-বানরী, পশু পক্ষী এমন কি জীবমাত্রেই নিশ্চিন্ত মনে বিচরণপূর্ব্বক প্রেমময় সেই রাধাকৃষ্ণের লীলাখেলা প্রকাশ করিতেছে। আহা! এ দৃশ্য যিনি একবার দর্শন করিবেন, ইহজন্মে তিনি আর কখন ভুলিতে পারিবেন না।

বৃন্দাবনের যমুনাতীরে অসংখ্য দেবদেবীর মন্দির বিরাজিত। যাবতীয় দেবালয়ের মধ্যে শেঠজীর সুবর্ণ তালগাছযুক্ত দেবালয়, গিরিগোবর্দ্ধন, স্বর্গীয় লালাবাবুর মন্দির, শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর, শ্রীশ্রীমদনমোহনজীউর, শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউর, সাহাজীর, ব্রহ্মচারীর এবং নিকুঞ্জকানন এই কয়টীই প্রধান এবং দর্শনযোগ্য। ব্রজমণ্ডলে সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ সহস্রের অধিক দেবালয় প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার মধ্যে সাতটী দেবালয় প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ যথা—শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন, শ্রীশ্যাম-

সুন্দর, শ্রীগোকুলানন্দ, শ্রীরাধারমণ এবং শ্রীরাধাদামোদর। উপরোক্ত এই সাতটী দেবালয়ই গোস্বামীদিগের প্রতিষ্ঠিত। শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদনমোহন এই তিনটী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ।

এখানে জয়পুর, সিন্ধিয়া, হুলকার এবং বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানের মহারাজদিগের এবং অন্যান্য ভাগ্যবান জমাদারদিগেরও বিস্তর মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে।

বৃন্দাবন—নিত্যধাম ব্রহ্মাণ্ডের উপর বিরাজিত, দেবগণের পূজনীয়, শ্রেষ্ঠ, পবিত্র ও পরমানন্দময়। মর্ত্তধামে এই বৃন্দাবনই পূর্ণধাম বলিয়া জ্ঞান করিতে হয়, কেন না—এই ব্রজমণ্ডলে পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ সকল হৃষ্টচিত্তে অবস্থান করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ দর্শন করিয়া থাকেন। এখানে ব্রহ্মমোহন কুণ্ড, নিধুবন, অঘাসুর নির্ব্বাণ প্রভৃতি অনেকগুলি প্রসিদ্ধ তীর্থ বিরাজিত। বৃন্দাবনে বৈষ্ণব এবং গোস্বামীদিগের মান্য অধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং প্রায়ই তাঁহারা জীবনের শেষ ভাগ এই স্থানে বাস করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারিলে চরিতার্থ বোধ করিয়া থাকেন।

এই পবিত্র ধামে যমুনা ও বৃন্দাবন—দুই স্থানেই ভগবদলীলার প্রাচীন চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। ভক্তগণ এই দুই স্থানেরই শ্রীপাদপদ্ম চিহ্ন দর্শন করিয়া জন্ম সফল বোধ করিয়া থাকেন। ইহা হইতেই প্রমাণ পাওয়া যায়—শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের এই ব্রজধাম কতই না প্রিয় ছিল। কেন না—এখানে ময়ূর-ময়ূরীগণ শিখিপুচ্ছ বিস্তীর্ণ করিয়া স্বভাবসুলভ কেওয়া-কেওয়া স্বরে প্রতিধ্বনিত করিয়া শ্রীরাধামাধবের গুণগানে মত্ত হইয়া তালে তালে নৃত্য করে, ভ্রমর-ভ্রমরী গুণগুণস্বরে গুঞ্জনপূর্ব্বক শ্রীরাধাকৃষ্ণের যশোগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মের মধুপান করিয়া কৃতার্থ হয়।

শ্রীমতী যমুনাদেবী—যিনি বংশীবাদনের মনপ্রাণ মাতোয়ারা সুমধুর স্বরে উত্তাল তরঙ্গমালা উত্থিত করিয়া প্রেমময়ের প্রেমে গদগদ হইয়া স্বায় গন্তব্যপথ পূর্ব্বদিক ভুলিয়া, পশ্চিমদিকে ধাবিত হইতেন। ব্রজবাসীগণ যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ ফণীর ন্যায় মোহিত হইয়া ঐ বংশীতান লহরী শ্রবণ করিয়া কত না সুখ অনুভব করিতেন, ব্রজাঙ্গনাগণ ব্রজেশ্বর ও ব্রজেশ্বরীর কেলীক্রীড়ার স্থান উন্মত্তভাবে দর্শন করিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণের বামে বিদ্যুল্লতারূপিণী বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধারাণীর সম্মিলন—অচৈতন্য অবস্থায় নয়ন ভরিয়া দর্শন করিতেন; গাভীগণ যথায় শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব শুনিয়া হাম্বারবে ঊর্দ্ধে পুচ্ছ তুলিয়া বনের দিকে ধাবিত হইত—সেই বৃন্দাবন কিরূপ রমণীয় স্থান, একবার হৃদয়ঙ্গম করিলে সমস্ত বুঝিতে পারা যায়।

পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহাত্মা জয়দেব গোস্বামী প্রণীত, বৈষ্ণব-গ্রন্থে—বৈষ্ণবদিগের যে মাহাত্ম্য দেখিতে পাওয়া যায়, নিম্নলিখিত ছন্দগুলি পাঠ করিলে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়;—

সদাচার ত্রিভুবনে দেখ পূর্ব্বাপার।
বৈষ্ণব সেবামাত্র ব্রত সবাকার॥
বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট পাদোদক পদরজ।
উল্লাস করিয়া সেব ত্যজ বৃথা লাজ॥
যাহার মহিমা বলে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত।
প্রত্যক্ষ দেখহ তার প্রভাব মাহাত্ম্য॥
বৈষ্ণবের অধরামৃত যেই নাহি খায়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে বহু সংসার না যায়॥

কর্ম্মী, জ্ঞানীমতে আর সকাম বিধানে।
ফিরিয়ে অশুদ্ধ বুদ্ধি মর্ম্ম নাহি জানে ॥
লোকাচার দেখ নারী বালবৃদ্ধ যুবা।
বৈষ্ণবের স্থানে কুণ্ঠ কিবা দেবী দেবা ॥
দানপ্রজা সেবার স্থলে সবার বচন।
বৈষ্ণবের কর বলি সবার বটন ॥
অদ্যাপিহ তার পূর্ব্বাবস্থা সবে জানে।
তথাপি নমস্কারি ঠাকুরাণী ভনে ॥
ধর্ম্মজ্ঞান মিথিলাতে ব্যভিচারী হয়।
শুদ্ধ ভক্ত নহে—সেই কৃষ্ণ পায় ॥
অতএব শুদ্ধ ভক্ত হয় মহা বাধ্য।
সচ্চিদানন্দ ঘনমূর্ত্তি শাস্ত্রেতে প্রসিদ্ধ ॥
এই জ্ঞান কভু বিনা চারি সম্প্রদায়।
কদাচ না হয় কুঞ্জে শৌচ প্রায় ॥
সম্প্রদাবিহীন গুরু আশ্রয় যে করে।
নিষ্ফল তাহার সব ভক্তি নাহি সরে ॥

সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত—উদার বৈষ্ণবধর্ম্মে নরনারী সম্মিলনের পরিণামের নাম "সহজ ভজন"। এখন "সহজ ভজন" পন্থা—রক্তমাংসের দেহে বিশেষ কার্য্যকরী, তাই লোকনিন্দার হাত এড়াইবার জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ দলে দলে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। বুদ্ধ ত একটীমাত্র মুক্তি—নির্ব্বাণ দিতে পারিতেন। বিষ্ণু—সারূপ্য, সালোক্য, সাযুজ্য, সান্নিধ্য—এই চারি প্রকার মুক্তি দিতে পারেন। বিষ্ণুর অপেক্ষা বড় কে? বুদ্ধদেবের উপদেশ—"অহিংসা পরমো ধর্ম্ম।" বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলমন্ত্র—"জীবে দয়া"। বৌদ্ধগণের উপজীবিকা—ভিক্ষা,

বৈষ্ণবগণেরও তাই। বৌদ্ধধর্ম্মে বৈষ্ণবধর্ম্মে—জাতিভেদ নাই। এই দুইটীই শান্তির ধর্ম্ম। এই জন্য বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম্মের আদর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দ্বাদশ শতাব্দীতে এই বৈষ্ণবধর্ম্মের ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হইয়াছিল, বৈষ্ণব সম্প্রদায়—চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। দক্ষিণাপথের তুলা দেশে মাধবাচার্য্য একটী বৈষ্ণব সম্প্রদায় গঠন করিলেন। তাঁহার ধর্ম্মমত বঙ্গদেশে বিখ্যাত হইয়া পড়িল, ঠিক এই সময়ে বীরভূম জেলায় "জয়দেব" জন্মগ্রহণ করিলেন।

"ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের" রাধাকৃষ্ণ চরিত্র লইয়া জয়দেব—বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। অদ্যাপি সেই বৈষ্ণবধর্ম্ম ভারতের সকল প্রদেশে আদরের সহিত গৃহীত হইয়া আসিতেছে—পূজাপাদ জয়দেব গোস্বামীই তাঁহার বেদের "পরমাত্মা" বৌদ্ধযুগে "আদিবুদ্ধ" হইয়া পড়েন, বৌদ্ধগণ বেদের "প্রজাপতি সৃষ্টির" উপাখ্যানগুলিও ক্রমে ক্রমে আত্মসাৎ করিয়া লইলেন। ইহা হইতেই বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ—এই ত্রিমূর্ত্তি বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক রূপান্তরিত হয়।

তাহার পর মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবকালে—তিনি বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া ভারতে বৈদিকধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার ফলে—জনসাধারণের আবার পুরাতন ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ জন্মিল, অর্থাৎ ভারতে পৌরাণিক যুগ আরম্ভ হইল। এই "পুরাতন" কথার অপভ্রংশ "পুরাণ" নামের উৎপত্তি। এই সময় হইতেই আর্য্য ঋষিগণ "পুরাণ শাস্ত্র" রচনা আরম্ভ করিতে লাগিলেন। "বুদ্ধ" "ধর্ম্ম" ও সঙ্ঘ" সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা এবং লয়কর্ত্তা সাজিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বর নামে খ্যাত হইলেন। তিনে এক—একে তিন। এই ত্রিমূর্ত্তির আধার "আদিবুদ্ধ" বেদের পরমাত্মার সঙ্গে সুদক্ষ বৈজ্ঞানিকের পাকা

হাতে রসায়ণিক সংযোগে মিশ্রিত হইয়া এক হইলেন। বেদনির্ম্মিত সেই পুরাতন "বিষ্ণু" নামেই নামকরণ হইল, কিন্তু বৈদিক বিষ্ণু আর পৌরাণিক বিষ্ণু—নামে এক হইলেও, উভয়ের বিস্তর প্রভেদ রহিয়া গেল। বৈদিক বিষ্ণু "নিরাকারত্ব" ছাড়িয়া পুরাণে সাকার হইলেন। সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতি, দমন ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য মানবের মঙ্গল মুহূর্ত্তে—ধরায় জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি মানবকে "পিতা" এবং মানবীকে "মাতা" বলিয়া তাহাদের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন।

বুদ্ধদেব এক জন্মেই বুদ্ধ হইতে পারেন নাই। তাঁহাকে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি অশেষ যোনি ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। শেষ জন্মে—সিদ্ধার্থ গৌতমরূপে তিনি নির্ব্বাণের পথ পাইয়াছিলেন। বুদ্ধের এই জাতক উপাখ্যান অবলম্বনে হিন্দুরা বিষ্ণুকে মৎস্য, কূর্ম্মাদি অবতারে পরিণত করিলেন। শঙ্করাচার্য্য, বুদ্ধ ও গোপার সন্ন্যাস মূর্ত্তিকে "হরপার্ব্বতী" নামে জাহির করিলেন। অনেকের চক্ষে সন্ন্যাসীর কঠোর শ্রীহীন মূর্ত্তি ভাল লাগিল না, তাই পৌরাণিকগণ "বুদ্ধ ও গোপার" ঐশ্বর্য্যশালী সংসার-মূর্ত্তিকে "লক্ষ্মী-নারায়ণে" পরিণত করিলেন।

বুদ্ধ পাছে সন্ন্যাসী হইয়া যান—এই আশঙ্কায় অসংখ্য তরুণী, রূপসী, লতাতন্তুর ন্যায় সহস্র শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া শিরীষ সুকোমল বাহুর প্রেম-পুলকিত-গায় আলিঙ্গন পাশে তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। এই ঘটনা অবলম্বনে বিষ্ণুর "রাসলীলা" রচিত হইল, বুদ্ধ—গোপার সহিত বিহার করিয়াছিলেন, "গোপা" অর্থে গোয়ালার মেয়ে বুঝায়—পুরাণে সেই গোপা ব্রজগোপিনী হইলেন। গোপা ও বুদ্ধের বিহার—শ্রীকৃষ্ণের "গোপিনীবিহার" বলিয়া প্রচারিত হইল। এই সময় এক রসজ্ঞ পণ্ডিত "ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ" লিখিয়া নারায়ণের প্রধান শক্তি লক্ষ্মীদেবীকে রাধারূপে কল্পনা করিয়া তাঁহাকে লীলাকারী শ্রীকৃষ্ণের বামে বসাইয়া আপন বাসনা

পূর্ণ করিলেন। শ্রীরাধা—যে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী নন, আশা করি —ইহা সকলেই অবগত আছেন। এইরূপে বঙ্গে প্রথম বৈষ্ণবধর্ম্ম স্থাপিত হইল।

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের আমলেও অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া ব্যাভিচারের কলুষস্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, সুযোগ বুঝিয়া তাঁহারা সকলেই বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ মতে কামিনীকাঞ্চন বিরোধী কঠোর সন্ন্যাস, অনেকেরই ভাল লাগিল না। বৈষ্ণবগণ যখন "দ্বৈতবাদ" প্রচার করিলেন, তখন অনেকেই ইহাকে —উদার ধর্ম্মমত বলিয়া বৈষ্ণবদলে মিশিতে লাগিলেন। সে সময় অন্ত্যজ জাতি বৈদিক বিজাতির শ্রেণীতে স্থান পায় নাই—বৈদিক ব্রাহ্মণগণ যাহাদিগকে আন্তরিক ঘৃণা করিতেন, সেই মর্ম্মান্তিক উপেক্ষায় মর্ম্মাহত হইয়া বৌদ্ধ শ্রমণগণের উদার আহ্বানে যাহারা একদিন বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই সমস্ত লোক একে একে বৈষ্ণব দলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

বৌদ্ধ ধর্ম্মনীতির কঠোর শাসনে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ প্রকাশ্যে একত্র অবস্থান করিতে পারিতেন না, কারণ তাঁহাদের মতে এরূপ অবস্থান করিলে স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই দণ্ডগ্রহণ করিতে হইত, এমন কি তাহাদের লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না।

বৈষ্ণবধর্ম্ম—বাধা বন্ধনবিহীন। এ ধর্ম্মে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর একত্র বাস, ধর্ম্মনীতির প্রতিকূল নহে। রমণীর প্রলোভনের একটা নৈসর্গিক আকর্ষণ আছে, রমণীকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবীর কর্ম্মময় উপাদান সংসারের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কর্ম্মক্ষেত্রে—নারী যেরূপ পুরুষের সহচরী, পুরুষও সহধর্ম্মিণীর সেইরূপ সহচর। যে ধর্ম্মে প্রেম-প্রতিমা নারীর সঙ্গে একত্র অবস্থান করিলে ধর্ম্মাচরণের ব্যাঘাত হয়

না, সে ধর্ম্মের প্রতি কাহার না সহানুভূতি জন্মে? বঙ্গে স্বাধীনতার সায়াহ্নে অধঃপতিত বাঙ্গালীর অলসজীবনে কৃষ্ণপ্রেমের পূতধারা ঢালিয়া--বিলাসিনীর অভিসার গাহিতে, পণ্ডিতবর জয়দেব গোস্বামী ধরায় অবতীর্ণ হইলেন। সমাজ ও সময় লইয়া এই জয়দেবই বাঙ্গালীর প্রথম কবি।

জয়দেব—অজয়নদের তীরে কেঁদুলিগ্রামে পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জয়দেবের জন্ম। তাঁহার পিতা ভোজদেব ও মাতা বামাদেবী ইহারা উভয়েই দরিদ্রকুলে জন্মিয়াছিলেন। শৈশবকালে জয়দেব সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিবার সময় "ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ" পাঠে যে উপদেশ পাইলেন, তাহাতেই তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মে আসক্ত হন। তদবধি রাধাকৃষ্ণের পূজা না করিয়া জয়দেব কখন জলগ্রহণ করিতেন না, সংসারের কোন বিষয়েই তাঁহার অনুরাগ ছিল না। জয়দেবের মাতা বামাদেবী—পুত্রের এইরূপ ঔদাসীন্য দেখিয়া তাঁহার বিবাহ দিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। জয়দেব রূপবান, গুণবান এবং বিদ্বান ছিলেন, সুতরাং পাত্রীর অভাব হইল না।

বামাদেবীর অনুমতি পাইয়া স্থানীয় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ—পদ্মাবতী নাম্নী পরমাসুন্দরী আত্মজাকে সমভিব্যাহারে জয়দেবের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। জয়দেব দেখিলেন, সেই রূপবতী বালিকার সমুজ্জ্বল সৌন্দর্য্যে কোমলতা প্রকাশ পাইতেছে, কৈশোরের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াও বালিকা যেন উষ্ণ পবন স্পৃষ্টা মাধবীলতার ন্যায় শ্লথ শোভাময়ী! এই বালিকারত্নকে দেখিবামাত্র তাঁহার প্রাণ সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ হইল। জয়দেব তথাপি মনে মনে নানা তর্ক পূর্ব্বক স্থির করিলেন, যে সংসারী—কামিনী তাহারই সঙ্গিনী। আমি যখন সংসারী হইতে অনিচ্ছুক, তখন আমার ন্যায় উদাসীনের—বিবাহের পুণ্য বন্ধনে

আবদ্ধ হওয়া উচিত নহে। এই সকল নানারূপ চিন্তা করিয়া তিনি শরণাগত ব্রাহ্মণকে স্পষ্ট বলিলেন—আমি বিবাহ করিব না, আপনি অপর কাহাকেও স্বীয় কন্যাটীকে সমর্পণ করিয়া সুখী হন। জয়দেবের বাক্যে ব্রাহ্মণ ক্ষুণ্ণমনে প্রত্যাখ্যাতা অশ্রুমুখী কন্যাকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন।

এদিকে পদ্মাবতী—জয়দেবকে প্রথম দর্শনেই আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাহার বড় আশায় ছাই পড়িল দেখিয়া তিনিও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "চিরকুমারী ব্রত অবলম্বন করিব, সেও ভাল—কিন্তু অন্য পুরুষকে পরপুরুষ জ্ঞানে কখন হৃদয়ে স্থান দিব না।"

অপরদিকে জয়দেব ভাবিলেন, সংসারে থাকিলে হয় ত কামিনীকাঞ্চনের মায়ায় পড়িতে হইবে, আবার পিতামাতার আদেশ অমান্য করিলে মহাপাপে লিপ্ত হইতে হইবে। এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া তিনি সেইদিন রাত্রিকালে সকলের অজ্ঞাতসারে কন্থা কমণ্ডলু ধারণ করিয়া সন্ন্যাসীবেশে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে—শ্রীকৃষ্ণের মত পাঞ্চজন্য শঙ্খে ফুৎকার প্রদান পূর্ব্বক সংসারমায়া ছিন্ন করিয়া গৃহত্যাগ করিলেন। তাঁহার গৃহত্যাগের বিষয় মুহূর্ত্ত মধ্যে গ্রামের প্রতি পল্লীতে পল্লীতে প্রচারিত হইল—তখন পদ্মাবতী চিরকুমারী ব্রত অবলম্বন করিয়া জয়দেবের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন।

এই নবীন সন্ন্যাসী গৃহত্যাগ করিয়া বহু কালাবধি নানা তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে একদা কলির জাগ্রত দেবতা ভগবান জগন্নাথদেবের দারুমূর্ত্তি—হিন্দুরা যে মূর্ত্তিকে "নারায়ণ" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, যে বিগ্রহমূর্ত্তি একবার দর্শন করিলে জীবের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, বাল্যকাল হইতে জয়দেব—পিতামাতার নিকট যে দেবের মহত্ত্বের বিষয় উপদেশ পাইয়া আত্মহারা হইয়াছেন, এক্ষণে মুক্তি-

লাভের আশায়—তাঁহার সেই দেবের পবিত্র মূর্ত্তি একবার দর্শন করিতে বাসনা হইল। বহুদিন অতিবাহিত করিয়া বহু দেশ পর্য্যটনপূর্ব্বক এক্ষণে তিনি কর্ম্মচ্যুত ধূমকেতুর ন্যায় পুরুষোত্তমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কলির জাগ্রত দেবতা ভগবানের দারুমূর্ত্তি দর্শনপূর্ব্বক আপনাকে চরিতার্থ-বোধ করিতে লাগিলেন। স্থানীয় পাণ্ডারা এই যুবক সন্ন্যাসীর ব্যবহারে তাঁহাকে অকপট ভক্ত স্থির জানিতে পারিয়া শ্রীমন্দিরেই আশ্রয়দান করিলেন।

মহাত্মা জয়দেব—যেদিন পুরীধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ঐ দিন জগন্নাথের কোন একটী উৎসব উপলক্ষে—সেই গভীর নদী বারিধিকূলে কৌমুদী প্রফুল্লা রজনীতে পুষ্প সুরভি সুবাসিত আলোকোজ্জ্বল নাটামন্দিরে লোকারণ্যের মধ্যে বসিয়া এক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী তন্বঙ্গী গান গাহিতেছিলেন। জয়দেব পরিচয়ে জানিতে পারিলেন, তিনি দেবদাসী। দেবদাসীরা চিরকুমারী, অর্থাৎ তাহাদের বিবাহ হয় না—দেবপ্রসাদ লব্ধবৃত্তি হইতে তাহাদের ভরণপোষণের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

রঙ্গমঞ্চের এই দেবদাসী দেখিতে যেমন সুন্দরী, তাহার মধুর সঙ্গীতগুলিও তেমনি মিষ্ট। তাহার কণ্ঠস্বরে ঠিক যেন বৃষ্টি ক্ষোভ রহিত জলধরের গম্ভীর দারুময় ভগবানের ধ্বনীতে ও শোণিতের স্পন্দনে তড়িত্তরঙ্গের অনুকম্পন অনুমিত হইতেছিল। এই দেবদাসী যুবতী সুন্দরীর বেশভূষার কোন পরিপাটী না থাকিলেও তাহার পুণ্য তনুর উচ্ছ্বসিত লাবণ্য—যেন শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়মন প্লাবিত করিয়া নিখিল বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। শ্রোতৃবর্গ সকলেই এই গায়িকার গানে মোহিত হইয়া "তারিফ" করিতেছিলেন।

মর্ম্মরখচিত দেবমন্দিরের সোপানে বসিয়া আমাদের রসিক জয়দেব

সেই স্বচ্ছন্দ পিকের সানন্দ ঝঙ্কার এক মনে শুনিতেছিলেন, আর এক একবার সুন্দরী গায়িকা যুবতীর স্বেদসিক্ত অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি—সস্পৃহলোচনে সকলের চক্ষুকে প্রতারণা করিয়া দেখিতেছিলেন। এতাবৎকাল যে জয়দেবের হৃদয় কঠোর বৈরাগ্য মরুভূমির মত শুষ্কাবস্থায় বর্ত্তমান ছিল, আজ সেই আসক্তহীন নীরস হৃদয়—দূরশ্রুত সিন্ধু কল্লোলের ন্যায় প্রেমবন্যার সাড়া পাইয়া দুরুদুরু স্পন্দনে সহসা কাঁপিয়া উঠিল। মায়ার মোহিনীশক্তিতে এবার জয়দেব আত্মহারা হইয়া এই গায়িকার বীণানিন্দিত মোহনকণ্ঠের স্তুতিসূচক ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। রমণী তাঁহার ধন্যবাদ শুনিবামাত্র পূর্ণোন্মুক্তনয়নে সেই স্তাবকের প্রতি একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবামাত্র দেখিলেন, এক জ্যোতির্ম্ময় যুবা পুরুষ, তাহার গানে তন্ময় হইয়া তাহারই পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছেন, কিন্তু সে চাহনীতে—উদ্দাম ইন্দ্রিয়ের ঘৃণিত উত্তেজনা নাই, তথাপি মলয়ান্দোলিতা চন্দনলতার ন্যায় তরুণী একবার শিহরিয়া উঠিল, কিশলয় কোমল করতল বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিয়া যুবতী সে হৃদয়বেগ তখনই সম্বরণ করিল। এবার এই পরিচিত চাঁদমুখ পুনঃদর্শনে যুবতীর সেই মধুর কণ্ঠস্বর রোদনঝঙ্কারে পরিণত হইল। গায়িকার অবস্থা দেখিয়া প্রধান পাণ্ডা স্থির করিলেন, সে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছে, সুতরাং তিনি গায়িকাকে বিশ্রামের অনুমতি দান করিলেন। এদিকে সেই অলস মন্থরগমনা সুন্দরী—সঞ্চারিণী পল্লবিতা লতার ন্যায় আনত দেহে ধীরে ধীরে রঙ্গস্থল ত্যাগ করিবার সময় সোপানোপরি উপবিষ্ট জয়দেবের দিকে একবার ফিরিয়া চাহিলেন, তাহার সেই করুণ চাহনীতে পণ্ডিত জয়দেব গোস্বামী বুঝিলেন, যে ইহা যুবতীর হৃদয়ের চিরসঞ্চিত অস্ফুট অসম্পূর্ণ প্রেমকাহিনী নীরব ভাষায় ব্যক্ত করিতেছে।

পরদিন প্রথম সূর্য্যরশ্মির অরুণ আলোকে—জয়দেব ও এই

গায়িকা উভয়ের পরিচয় হইল। জয়দেব যখন এই দেবদাসীর নাম পদ্মাবতী শুনিলেন, তখন তাঁহার জানিতে বাকি রহিল না যে, এই দেবদাসীই—সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের দুহিতা। প্রথম যৌবনে বিবাহের আনন্দময় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া—এই উজ্জ্বল স্বর্ণমুষ্টিকে যিনি একদিন ধূলিমুষ্টির ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই ধূসর মলিন শশিলেখা—আজ পূর্ণশশির প্রভা ধারণ করিয়াছে। জয়দেবের সেই পূর্ব্বকাহিনী স্মরণ হইবামাত্র অনুতাপ হইল—এতদিন মায়াময় মানবজীবনটা কেবল নিরর্থক স্বপ্নেই কাটিয়া গিয়াছে! দেবদাসী পদ্মাবতী তাঁহার ঝঞ্ঝাহত প্রাণের জড়ত্বকে অপসারিত করিয়া দিল। জগবন্ধুর কৃপায়—জয়দেব আজ বিশ্ব-রাজ্যে মাথা গুজিবার অবসর খুজিয়া পাইলেন। পদ্মাবতীকে উপেক্ষা করিয়া একদিন তিনি যে ভ্রম করিয়াছিলেন, আজ তাহাকে ক্ষিপ্র আলিঙ্গনে বন্ধন করিয়া সেই মহাভ্রম সংশোধন করিতে মনস্থির করিলেন।

পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত এস্থলে জয়দেব সংক্রান্ত যাহা কিছু লিপিবদ্ধ হইল, ইহার বেশীর ভাগ "জীবন চিত্র" গ্রন্থ হইতে সাহায্য পাইয়াছি, এজন্ত আমি গ্রন্থ প্রকাশকের নিকট ঋণী।

বৈষ্ণবধর্ম্ম হৃদয়হীন অপ্রেমিকের ধর্ম্ম নহে। জয়দেব বুঝিলেন, অনির্দ্দিষ্ট পথে অসহায় ভ্রমণের অপেক্ষা সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মচর্য্য করা শ্রেষ্ঠ! মিলনের মহা সাধনায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমলাভ হয়, তাহারই নাম "সহজ সাধন।"

পদ্মাবতী বহুকাল হইতে গৃহত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তমে দেবদাসী-রূপে অবস্থান করিলেও এতাবৎকাল তাহার সরল হৃদয় শৈশবের ন্যায় নিষ্পাপ ছিল, সেই পুণ্যফলে প্রথম দৃষ্টিতেই তিনি জয়দেবকে আপন বলিয়া চিনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, এইদিন মন্দির

কুট্টিমে যে সময় জগন্নাথদেবের আরতির মঙ্গল শঙ্খ বাজিতেছিল—ঠিক সেই সময় সেই নির্জ্জন সাগর-সৈকতে মুক্তালোক প্রচুর চন্দ্রাতপতলে দাঁড়াইয়া বিশ্বপ্রেমিক ভগবানের দারুমূর্ত্তিকে সাক্ষী করিয়া ভবিষ্যতের আশাপূর্ণ বংশীধ্বনি শুনিতে শুনিতে জীবনের পুণ্যময় অবসরে চিরসন্ন্যাসী ও চিরকুমারী স্ব স্ব হৃদয় বিনিময় করিলেন।

প্রেমের মৃদুহিল্লোলে—প্রাণেশ্বরের হর্ষ আকুল কোমলকরের রোমাঞ্চ স্পর্শ অনুভব করিয়া পদ্মাবতীর কুমারীব্রত ভঙ্গ হইল, কিন্তু পাছে উৎকল বাসীদিগের হস্তে প্রেয়সীকে লাঞ্ছনাভোগ করিতে হয়, এই আশঙ্কায় জয়দেব পদ্মাবতীর সঙ্গে উড়িষ্যা ত্যাগ করিলেন। বহু পূর্ব্ব হইতে জয়দেব ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, এক্ষণে পদ্মাবতী পতির পদধুলায় শ্যামল যৌবন ঢাকিয়া রাখিয়া তিনিও ভিখারিণী সাজিয়া ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। হরিগুণ গানে অমৃতময় ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়া পাদপকুটীরের পর্ণ শয্যায় শয়ন করিয়া এই যুগলদম্পতীর জীবন পরম সুখে অতিবাহিত হইতে লাগিল।

নারীহৃদয়ে যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে, পদ্মাবতী সেই সমস্তটুকু দিয়া স্বামীর সেবা করিতেন। ইহার ফলে—অল্পদিনের মধ্যেই পদ্মাবতী জয়দেবের জীবনের অবলম্বন হইয়া উঠিলেন। পদ্মাবতীকে এক্ষণে দেখিলে জয়দেবের মনে হইত—কাদম্বিনী ঘন চিকুরছায়ায় এ পূর্ণ চাঁদ কোথা হইতে উদিত হইল? পূর্ব্বেই উল্লেখ হইয়াছে, জয়দেব মহাপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার জীবনের গভীর আকাঙ্ক্ষা ও যৌবনের অসীম উচ্ছাস একত্র হইয়া—হৃদয়ে কবিত্বশক্তি জাগিয়া উঠিল।

জয়দেব দরিদ্র হইলেও এবার তিনি রাধামাধবের বিগ্রহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। পদ্মাবতীর পরামর্শে তিনি দেবতার মন্দির নির্ম্মাণের অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য দেশান্তর যাত্রা করিলেন, রাধামাধবজীউর

কৃপায় প্রচুর অর্থ সংগ্রহ হইল। এ অর্থে দেবতার সেবা যত্নের ত্রুটি হইবে না স্থির জানিয়া তাঁহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না, সুতরাং তিনি হৃষ্ট-চিত্তে স্বদেশে ফিরিতে মনস্থ করিলেন; কিন্তু বিধি বাদ সাধিল—পথিমধ্যে দস্যুদল তাঁহার অর্থের সন্ধান পাইয়া যথাসর্ব্বস্ব অপহরণপূর্ব্বক পলায়ন করিল, অধিকন্তু পিশাচগণ এরূপ নির্দ্দয়ভাবে জয়দেবকে প্রহার করিয়াছিল যে, তাঁহাকে অচৈতন্য অবস্থায় পথে পড়িয়া থাকিতে হইয়াছিল; ভগবান রাধামাধবজীউর কৃপায়—সে যাত্রায় কতকগুলি কৃষক তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিলে, তিনি শূন্য হস্তে বহু কষ্টে প্রাণে প্রাণে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

আমাদের বাঙ্গালাদেশে—বৌদ্ধেরাই প্রথমে "মুষ্টিভিক্ষার" প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন। এবার জয়দেব সেই মুষ্টিভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা চালাইতে লাগিলেন, পতিপরায়ণা প্রেমময়ী পত্নী পাইয়া জয়দেবের কবিত্ব শক্তি বিকাশপ্রাপ্ত হইল। তখন তিনি বৃন্দাবন-বিহারী রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করিয়া গীত-গোবিন্দ পদাবলী রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন, আর পদ্মাবতী আপন প্রতিভাবলে সেই পদাবলীর সুর সংযোগপূর্ব্বক স্বভাবসিদ্ধ মধুর মোহনকণ্ঠে সেই গান—দ্বারে দ্বারে গাহিয়া বেড়াইতেন। এইরূপে তাঁহারা উভয়ে ভিক্ষা করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত রাধামাধবজীউর সেবা এক রকমে অতিবাহিত হইত।

এইভাবে কিছুদিন অতীত হইবার পর আবার তাঁহাদের দেশ ভ্রমণ করিতে বাসনা হইল। তখন উভয়ে পরামর্শ করিয়া প্রথমেই তাঁহারা বঙ্গদেশের রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে উপস্থিত হইলেন। এই সময় গৌড়ের স্বর্ণসিংহাসনে বঙ্গের শেষ স্বাধীন রাজা "লক্ষ্মণসেন" বারিপতন ক্ষীণ মেঘের বুকে দামিনীর শেষ বিকাশের মত শোভা পাইতেছিলেন।

বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেন বাঙ্গালীর উপযুক্ত রাজাই ছিলেন, অর্থাৎ তিনি বাঙ্গালীর মত বিলাসী, বাঙ্গালীর মত অদৃষ্টবাদী এবং যথার্থ বাঙ্গালীরই মত কাব্যপ্রিয় ছিলেন। দেশপূজ্য জগদ্বিখ্যাত মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় তাঁহারও সভায়—রসিক, ভাবুক ও কবির আদর ছিল, সুতরাং রাজা লক্ষ্মণসেনের সেই স্ফটিকময় রত্নরাজি সমাকুল সভামণ্ডপে যেন সতত বসন্তের মলয় বহিত, কুসুমের সৌরভ ছুটিত, নবযুবতী কিঙ্করী বলয়াঙ্কিত বাহুবল্লবী ঈষৎ সঞ্চালিত করিয়া মহারাজকে চামর ব্যজন করিত, মদনের প্রতিরূপ ছত্রধারী রাজশিরে রত্নছত্র আপন শোভা বিস্তার করিত।

সেই রাজসভা মধ্যে এবার জয়দেব ও পদ্মাবতী উভয়েই আপন প্রতিভাবলে রাজার মন আকর্ষণ করিলেন, অর্থাৎ রাজসভায় যত কবি ও গায়িকা বর্ত্তমান ছিলেন, তাহাদের মধ্যে ইহারাই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিলে, রাজা প্রফুল্লমনে এই বৈষ্ণব-দম্পতীকে আশ্রয় প্রদান করিলেন।

রাজাশ্রয়ে নিরুদ্বেগে ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে বসিয়া জয়দেব—বৈষ্ণবের অমূল্য ধন "গীতগোবিন্দ" রচনা করিলেন। পূর্ব্বেই উল্লে হইয়াছে, পদ্মাবতী স্বামীকে আন্তরিক ভালবাসিতেন। সখীমুখে স্বামীর অলীক মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া পদ্মাবতীর মূর্চ্ছা হইয়াছিল, তখন জয়দেব মৃতসঞ্জীবনীস্বরূপ হরিনাম সুধায়—সেই মৃতকল্পাপত্নীর চৈতন্য সঞ্চার করেন। পত্নীর ভালবাসার গভীরত্ব বুঝাইবার জন্য তিনি আপনাকে "পদ্মাবতী চরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী" বলিয়া পরিচিত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এই দাম্পত্যজীবনের প্রগাঢ় ভালবাসায়—"গীতগোবিন্দের" জন্ম।

গীতগোবিন্দ—জয়দেব ও পদ্মাবতীর আত্মকাহিনী। গীত-

গোবিন্দ—আদিরসাত্মক প্রেমের নিখুঁত ফটো। গীতগোবিন্দ—রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা কীর্ত্তন করিয়া বঙ্গদেশকে বৈষ্ণবধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছে। জয়দেবের এ ঋণ—বৈষ্ণবগণ কখনও পরিশোধ করিতে পারিবেন না।

গীতগোবিন্দ রচনা সম্বন্ধে একটী জনশ্রুতি আছে যে ;—

"প্রিয়ে চারুশীলে" প্রমুখ গানটী রচনার সময় জয়দেব একটু সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন। মানিনীর মানের মাত্রা গুরুতর হইলে—নায়ক চরণে ধরিয়া "চণ্ডী"কে শান্ত করেন, কিন্তু জগদীশ শ্রীকৃষ্ণ কি সামান্য নায়কের মত রাধার চরণ ধরিবেন? জয়দেবের ইহা সঙ্গতবোধ হইল না। "স্মর গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং" এই পর্য্যন্ত লিখিয়া তিনি ইতস্ততঃ করিতেছিলেন—যেন সেই বৈশাখের পূর্ণিমার মত সমুজ্জ্বল প্রতিজ্ঞায় সেদিন তাঁহার ভাষার অনাটন পড়িয়া গিয়াছিল।

জয়দেবের বাসস্থান হইতে স্রোতস্বিনী গঙ্গা অষ্টাদশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত থাকিলেও তিনি প্রত্যহ তথায় যাইয়া স্নান করিতেন, তৎপরে আহার করিতেন। পদ্মাবতী—স্বামীকে রচনায় ব্যস্ত, এদিকে বেলা অতিরিক্ত হইল দেখিয়া তিনি তাঁহাকে স্নান করিতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। পত্নীর অনুরোধে সেদিন জয়দেব গঙ্গাস্নানে বহির্গত হইবার অল্পক্ষণ পরেই—জয়দেবের ইষ্টদেব "লীলাকারী শ্রীকৃষ্ণ" স্বয়ং জয়দেবের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং জয়দেব লিখিত যে রচনাটী অসম্পূর্ণ ছিল, তিনি স্বহস্তে উহা লিখিয়া পূরণ করিয়া দিলেন; তৎপরে পদ্মাবতী প্রদত্ত "অন্ন" স্বেচ্ছায় ভোজন করিয়া যখন সেই পদ্মাবতী তাম্বুল রচনায় ব্যাপৃত—শ্রীহরি অবসর পাইয়া ঠিক সেই সময় ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

স্বামীর ভুক্তাবশিষ্ট লইয়া পদ্মাবতী প্রফুল্লমনে ভোজন করিতেছেন, এমন সময় প্রকৃত জয়দেব সিক্তবেশে স্বীয় পুরে—পত্নীকে তাঁহার পূর্ব্বে আহার করিতেছেন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং পদ্মাবতীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সরলহৃদয়া পদ্মাবতী অম্লানবদনে—পুঁথি লেখা হইতে আহার এবং তাম্বুল না লইয়া প্রস্থানের সময় বিষয় যথাযথ প্রকাশ করিলেন। ইহাতে জয়দেব আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সর্ব্ব-প্রথমেই তিনি তাঁহার পুঁথিখানি দেখিলেন। এই পুঁথির লেখাই সেই রহস্য ভেদ করিয়াছিল, অর্থাৎ জয়দেব যে চরণ অসমাপ করিয়া স্নান করিতে গিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই চরণ সম্পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ইহাতেই তিনি স্থির করিলেন যে—তাঁহারই ইষ্টদেব তাঁহারই রূপ ধরিয়া মানিনীর পদতলে পতিত হইয়া লিখিয়া গিয়াছেন—

"দেহিপদপল্লবমুদারং"

নীলাকাশে নক্ষত্রধবল ছায়াপথের মত সেই পবিত্রকরের পুণ্যাক্ষরে জয়দেবের শৃঙ্গার প্রাণ—গীতগোবিন্দের মর্ম্মে মর্ম্মে অতৃপ্ত বাসনার আকুল উচ্ছাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। চিরবাঞ্ছিতের চরণে জয়দেবের প্রাণের আহ্বান প্রেমের সাগরসঙ্গমে গিয়াছে।

জয়দেবের বাসনা সিদ্ধ হইল দেখিয়া তিনি আহ্লাদে পত্নীর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবার সময় বলিতে লাগিলেন, "পদ্মাবতি! তোমার নারী জন্ম সার্থক হইয়াছে, তুমি তোমার স্বামীর স্বামীকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছ, তাঁহার প্রসাদ পাইয়াছ; আমি হতভাগ্য তাঁহাকে দর্শন করিয়া হৃদয়ের অনন্তজ্বালা জুড়াইতে পারিলাম না।" এইরূপে আত্মহারা কবি তাঁহার ভক্তিমূল প্রেমব্রত—উদ্যাপন করিলেন।

বৈষ্ণবগণ অদ্যাপি সেই সাধক জয়দেবের স্মৃতি রক্ষার জন্য প্রতি

বৎসর একটী মেলার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মাঘ মাসের মকর সংক্রান্তিতে—যাত্রীগণ জয়দেবের সেই জীর্ণ পর্ণকুটীরে বৈকণ্ঠের অনাবিল শোভা দর্শনে মৃত্যুমিলন মানবজীবন পবিত্র করিয়া থাকেন।

বৃন্দাবনে যাত্রীদিগকে কোথাও পৃথক্ বাসা ভাড়া দিতে হয় না। এখানে যে ব্রজবাসীকে তীর্থগুরু মান্য করা যায়, তিনিই তাঁহার অধানস্থ যাত্রীদিগের বিশ্রাম স্থানের বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। বাসার নিমিত্ত এ তীর্থে কেবল প্রত্যেক যাত্রীকে কুঞ্জবাসীর সম্মানের জন্য একটী ভেট ও সাধ্যানুসারে ন্যূনকল্পে ১৴০ বৃন্দা পূজার নিমিত্ত দান করিতে হয়। বৃন্দাবনে আসিলে কর্ত্তব্য বোধে শ্রীবৃন্দাপূজা সম্পাদন করিতে হয়, কেন না—বৃন্দাদেবীই শ্রীধাম বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই বৃন্দাপূজায়—চিরপ্রথানুসারে লালপাড় সাড়ী, থালা, গেলাস, অলঙ্কার, শাঁখা, সিন্দুর, দর্পণ প্রভৃতি দান করিতে হয়। অনেক ভক্ত এই পূজার সময় একটী তুলসীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া উহাতে তুলসী বৃক্ষ-রোপনপূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাপূজা করিয়া থাকেন। বলাবাহুল্য, বৃন্দাবনে ভক্তিসহকারে একটী বেদী নির্ম্মাণ করাইয়া তদোপরি তুলসীবৃক্ষ প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক উহা পূজার্চ্চনা অপেক্ষা মহৎকর্ম্ম আর দ্বিতীয় নাই বলিয়া জানিবেন। যে ভক্ত যাঁহার কুঞ্জে অবস্থান করিবেন, তাহাকে সেই কুঞ্জবাসীর নিকট বৃন্দাপূজা করিতে হয়। প্রত্যেক কুঞ্জেই তুলসী বৃক্ষসহ দেবী প্রতিষ্ঠিত থাকে; এ কার্য্যের যাবতীয় দ্রব্য-সামগ্রী কুঞ্জবাসীর প্রাপ্য। যাঁহারা নিজ হইতে উপরোক্ত দ্রব্য-সামগ্রী সরবরাহ করিয়া বৃন্দাদেবীর অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র মূল্য দিতে হয় না, কিন্তু যাঁহারা এই সমস্ত প্রদান করিতে অসমর্থ, তাঁহারাই কেবল ১৴০ মূল্য দিয়া কুঞ্জবাসীর নিকট উক্ত দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্যস্বরূপ প্রদান করিয়া পূজার্চ্চনার আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি লইয়া থাকেন।

বৃন্দাবনের দেবালয়ে—ভেটের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই, আট আনা হইতে পাঁচ টাকা কিম্বা তদূর্দ্ধ পর্য্যন্ত ভেট দিতে পারেন, উহা যাত্রীগণ আপন সামর্থানুযায়ী দান করিয়া থাকেন—তবে এথানকার নিয়ম এই যে যিনি এক দেবালয়ে যেরূপ ভেট করিবেন, তাঁহাকে সেইরূপ ছয় স্থানে ভেট দিতে হইবে—অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীশ্যামসুন্দর, কুঞ্জবাসী, শ্রীযমুনাদেবী এবং গুরুর পাট এই ছয় স্থানে সমানভাবে ভেট করিতে হইবে; এতদ্ভিন্ন শ্রীরাধারমণ, শ্রীগোকুলানন্দ ও শ্রীরাধাদামোদরের দেবালয়ে পৃথক /০ আনা ভেট দিয়া ভগবানের শ্রীমূর্ত্তির দর্শন করিতে হয়।

এ তীর্থে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে স্বীয় গুরুর পাটের পরিচয় উত্তম রূপে অবগত হইয়া যাইবেন, নচেৎ গোলকধাঁধায় পড়িতে হয়। আর এক কথা—উপরোক্ত ছয় স্থানের ভেটদানের সময় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া এই কার্য্য সমাপন করিবেন ও দেবতাদিগের পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করিবেন। কাহারও মারফতে কেহ যেন কোন ভেট পাঠাইবেন না, কেন না—ইহাতে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফল হইবার সম্ভাবনা। প্রমাণস্বরূপ মনে করুন আপনি কাহার মারফত—কোন দেবালয়ে ভেট পাঠাইয়া দিয়াছেন, পরে ব্রজবাসীরা যদ্যপি পুনরায় আপনাকে বাধা করিয়া ঐ ভেট আদায় করেন, ইহাতে হয় ত আপনি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া দু-একটী কথা বলিতে পারেন, ফলতঃ উহাই কুফলে পরিণত হয়। কথিত আছে, তীর্থ স্থানে কাহারও সহিত কলহ বা কাহারও মনে কষ্ট দিতে নাই।

উপরোক্ত যে ছয় স্থানের ভেটের বিষয় প্রকাশিত হইল, তন্মধ্যে গুরুর পাটে ভেট করাই কঠিন ব্যাপার, কারণ বৃন্দাবনে অনেক স্থানের অনেক গুরুর পাঠ আছে, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই যাত্রীর নিকট

হইতে আপন পাটে ভেট জমা লইবার চেষ্টা করিতে থাকেন, ইহা এক বিষম সমস্যা।

ভক্তগণ বৃন্দাবনে শ্রীরাধাগোবিন্দজীউর শ্রীচরণ বন্দনা করিতেই আসিয়া থাকেন, সুতরাং ভেট করিবার সময় প্রথমে শ্রীগোবিন্দজীউর মন্দিরে ভেট দিয়া ভগবানের যুগলমূর্ত্তির শ্রীচরণ দর্শনান্তে অপর স্থানে যাইবেন।

বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া—সর্ব্বপ্রথমেই কেশীঘাটে স্নানপূর্ব্বক শুদ্ধ কলেবরে দেবস্থানে যাইতে হয়। শ্রীনন্দের নন্দন শ্রীকৃষ্ণ গোকুল হইতে আপন দলবলসহ বৃন্দাবনে বাস করিবার সময়, কেশী নামক এক দৈত্য ব্রজবাসীদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; শ্রীকৃষ্ণ ঐ সময় সেই দুর্জ্জয় দৈত্যকে এই ঘাট-স্থানের উপর তাহাকে সংহার করিয়া ভয়ার্ত্ত ব্রজবাসীদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত ঐ দৈত্যের নামানুসারে এই ঘাটটীর নাম কেশীঘাট নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

কেশীঘাট

বৃন্দাবনে—বর্ত্তমান কেশীঘাট যাহা যাত্রীগণ দর্শন করিয়া থাকেন, ইহা এক মনোহর দৃশ্য! এই বাঁধা ঘাটটী প্রস্তর নির্ম্মিত এবং সোপানশ্রেণীতে সজ্জীকৃত। ইহার তীর হইতে শ্রীশ্রীমদনমোহনজীউর অত্যুচ্চ পুরাতন মন্দিরের চূড়াটী স্পষ্ট দর্শন পাওয়া যায়। কোন ব্রজবাসী বা কোন তীর্থ যাত্রীর এখানে মৃত্যু ঘটিলে তাহার শবদেহ এই ঘাটের একপার্শ্বে সৎকার হইবার ব্যবস্থা আছে। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত বৃন্দাবনের কেশীঘাটস্থ হাতরাসের রাজবাড়ীসহ একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল।

কেশী-ঘাটে—সকল্পপূর্ব্বক স্নান, দান করিলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় গঙ্গা স্নান ফলাপেক্ষা শতগুণ পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে, একথা পূর্ব্বেই উল্লেখ হইয়াছে। এই ঘাটেই ব্রজবাসী পাণ্ডার দ্বারা মন্ত্রপূতসহকারে শ্রীযমুনাদেবীর উদ্দেশে পূজার্চ্চনা করিতে হয়। যমুনা পূজা করিবার সময় ভক্তগণ সাধ্যানুসারে পঞ্চোপচার, দশোপচার এবং ষোড়শোপ-চারে পূজা, দানপূর্ব্বক আপন ব্রত উদ্যাপন করিয়া থাকেন। ভক্তগণ ইহার মধ্যে যে কোন উপচারেই পূজা করুন না কেন, স্থানীয় নিয়মানু-সারে সূর্য্যকন্যা যমুনাদেবীর উদ্দেশে—লালপাড় সাড়ী, থালা, গেলাস, অলঙ্কার, শাঁখা, সিন্দুর, দর্পণ প্রভৃতিসহ যথানিয়মে দেবীর পূজার্চ্চনা করিতে হয়। কোন কোন ভাগ্যবান যাত্রী—এই পূজা সমাপনান্তে স্বীয় ব্রজবাসী পাণ্ডাকে ভূমিদান, ষোড়শদান প্রভৃতি দান করিয়া আপনাপন মুক্তির পথ পরিষ্কার করিয়া থাকেন। বলাবাহুল্য, সকল যাত্রীর ভাগ্যে এইরূপ দান সংঘটন হয় না, সুতরাং ব্রজবাসী পাণ্ডার নিকট যমুনাদেবীর যে একটী ভেটের বিষয় পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, ঐ ভেটের মূল্য দান করিলে তিনি নিজ হইতে যমুনাপূজার আবশ্যকীয় দ্রব্য-সামগ্রীগুলি সরবরাহ করিয়া থাকেন। যমুনাদেবীর ভেট আর এখানকার তীর্থকার্য্য সমাপনান্তে প্রত্যাবর্ত্তনকালে সুফলের সময়ে যাত্রীগণ ব্রজবাসী পাণ্ডাকে যাহা দান করিবেন, এই দুইটীই তীর্থগুরু ব্রজবাসীর লাভ। অবশিষ্ট যাহা কিছু দান করিবেন, উহা পৃথক্ পৃথক্ দেবালয়ে জমা হইয়া থাকে।

কেশী-ঘাটের নিয়ম সকল পালনের পর গোবিন্দঘাট, ভ্রমরঘাট, চিড়ঘাট, যমুনাপুলিন ইত্যাদি পর পর চব্বিশটী ঘাটে শ্রদ্ধাসহকারে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান বা জলস্পর্শ করিতে হয়, তৎপরে গোবিন্দ ও শ্রীরাধা-রাণীদেবীকে ভক্তিসহকারে ভক্তিদান করিয়া ব্রজরজে লুটিপাটি খাইয়া

সাধ্যমত হরির লুট এবং মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া মহাব্রত উদ্যাপন করিতে হয়। এইরূপে শ্রীগোপীনাথ, শ্রীগোকুলানন্দ, শ্রীরাধারমণ, শ্রীমদনমোহন, শ্রীরাধাদামোদর ও শ্রীশ্যামসুন্দরের যথানিয়মে পূজার্চনাপূর্ব্বক অভিলষিত মানত প্রার্থনা করিবেন। অনন্তর কেশবজী ও গোকুলেশ্বরকে যথাশক্তি ভক্তিদান করিয়া শেষে ব্রহ্মমোহন কুণ্ডাদিতে স্নান ও তর্পণ করিবার বিধি আছে। এইরূপে সমস্ত নিয়মগুলি পালন করিলে তীর্থফল পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই উল্লেখ হইয়াছে, এ তীর্থে বৃন্দাবন, মথুরা, শ্যামকুণ্ড, গোকুল, রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধনগিরি প্রভৃতি পবিত্র স্থানগুলি ব্রজমণ্ডল নামে প্রসিদ্ধ। ইহার পরিমাণ চৌরাশী ক্রোশ, সুতরাং সকল যাত্রী এই প্রশস্ত পথ অতিক্রম করিয়া ব্রজমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতে পারেন না। কথিত আছে, কেবলমাত্র পঞ্চক্রোশী বৃন্দাবনধাম পরিক্রম এবং চব্বিশ বনের পরিবর্ত্তে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের রমণীয় প্রসিদ্ধ বারটী বন প্রদক্ষিণ করিতে পারিলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তিনি সমস্ত ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার ফললাভ করিতে সমর্থ হন। অতএব পূর্ণধাম বৃন্দাবনে আসিয়া যাত্রীদিগের কর্ত্তব্যবোধে সেই বিখ্যাত বারটী বন ও পঞ্চক্রোশী বৃন্দাবন পরিক্রমণ করা উচিত।

বৃন্দাবনের পরিধি পূর্ব্বে পাঁচ ক্রোশ নিরূপিত ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানকালে উক্ত পাঁচ ক্রোশের মধ্যে অন্যূন দুই ক্রোশ স্থান যমুনাগর্ভে লীন হওয়ায় এক্ষণে মাত্র তিন ক্রোশ পরিধি জাগিয়া আছে, তথাপি পূর্ব্ব সংস্কারবশতঃ সকলেই ইহাকে সেই পঞ্চক্রোশী বলিয়াই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

যাত্রীদিগের মধ্যে অনেকেই বাসন্তী সমীরচুম্বিত অর্দ্ধ ফুটন্ত গোলাপের সৌন্দর্য্য দেখিয়া থাকিবেন, হেমন্তের শিশির স্নাত সেফা-

লিকার মনোরম সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া থাকিবেন, বর্ষা বিধৌত চম্পকের গৌরকান্তির ছটা মনোযোগের সহিত দেখিয়া থাকিবেন, কৃষ্ণমেঘপূর্ণ বিস্তৃত আকাশে সৌদামিনীর তীব্ররূপ জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া থাকিবেন, এ সব অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়াও যদি মন মোহিত না হইয়া থাকে, তবে বৃন্দারণ্যের এই প্রাকৃতিক শোভা একবার দর্শন করিলে অর্থাৎ লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের সাধের বৃন্দারণ্যের সৌন্দর্য্য মাধুরী নয়নপথে পতিত হইলে নিশ্চয়ই উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইবেন। কেন না—এই পঞ্চক্রোশী প্রদক্ষিণকালে তরুলতাবেষ্টিত বিহঙ্গকূলকূজিত মনোহর কুঞ্জ সকল দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইবেন, আবার ইহার স্থানে স্থানে নির্ম্মল সলিল পূর্ণ পবিত্র সরোবরে অবগাহন করিয়া কত শান্তি সুখানুভব করিবেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এতদ্ভিন্ন ময়ূর-ময়ূরীগণের নৃত্য, নিরীহ মৃগকুলের কেলীসহ আশ্চর্য্য গতি অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হইবেন ও ব্রজমণ্ডলের নানাপ্রকার শোভা সন্দর্শনপূর্ব্বক আপন পরিশ্রমের সার্থক বিবেচনা করিবেন সন্দেহ নাই। যদ্যপি কোন যাত্রীর দলমধ্যে বৃদ্ধ বা অসমর্থ ব্যক্তি বর্ত্তমান থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সুবিধার নিমিত্ত তিনি যেন কর্ত্তব্যবোধে বৃন্দাবন হইতে একখানি ডুলী ভাড়া করিয়া সঙ্গে নিযুক্ত করেন? এই পঞ্চক্রোশী প্রদক্ষিণ করিবার একখানি ডুলী যাতায়াতের।/০ আনা হইতে ।৵০ আনা ভাড়া ধার্য্য আছে। এইরূপ আবার স্মরণ করিয়া এই পঞ্চক্রোশী পরিমিত স্থান প্রদক্ষিণ করিবার সময় স্বীয় ব্রজবাসী পাণ্ডার নিকট হইতে বারঘাটের সঙ্কল্প করিবার নিমিত্ত একটী ব্রাহ্মণ সঙ্গে লইবেন। কারণ তিনি সঙ্গে থাকিলে সমস্ত পথ প্রদর্শন ও বারঘাটের সঙ্কল্পের মন্ত্র উচ্চারণ সকলই তাঁহারই দ্বারা হইবে। আর এক কথা—এই শুভ যাত্রা করিবার পূর্ব্বে বারটী পয়সা, বারটী পৈতা ও বারটী হরিতকী বা সুপারি সঙ্গে লই-

বেন। যে বারটী ঘাটে সঙ্কল্প করিতে হয়, যথাক্রমে সেই ঘাটগুলির নাম প্রকাশিত হইল ;—

১। রাজ-ঘাট, ২। বরাহ-ঘাট, ৩। কালিয়-হ্রদ, ৪। প্রস্কনন্দন-ঘাট, ৫। বিহার-ঘাট, ৬। শিঙ্গারবট ঘাট, ৭। গোবিন্দ-ঘাট, ৮। আদিত্য-ঘাট, ৯। বস্ত্রহরণ-ঘাট, (বস্ত্রহরণ-ঘাটের সীমামধ্যে অদ্যাপি সেই প্রাচীন কাত্যায়নীর মন্দিরটী আপন শোভা বিস্তার করিয়া অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে)। ইহাই সেই ঘাট—যে ঘাটে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীগণের বস্ত্রহরণ করিয়া তাঁহাদের তন্ময়ের বিষয় পরীক্ষা করিয়াছিলেন, ১০। ভ্রমর-ঘাট, ১১। যুগল-ঘাট, সর্ব্বশেষে কেশী-ঘাটে সঙ্কল্পপূর্ব্বক পঞ্চক্রোশীর নিয়মপালন করিতে হয়। যে সকল যাত্রী জন্মাষ্টমী উৎসব দর্শন শেষ করিয়া ২৪টী উপবনের লীলা স্থান দর্শনে বহির্গত হইবেন, তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত বনগুলি পরিভ্রমণ করিতে হইবে যথা ;—

১। গোকুল, ২। গোবর্দ্ধন, ৩। বর্ষাণ, ৪। নন্দগ্রাম (বর্ষণ এবং নন্দগ্রামের শোভা অতুলনীয়), ৫। সঙ্কেত, ৬। পরিমদিরা, ৭। অড়ীঙ্গ, ৮। শেষশায়ী, ৯। শ্রীকুণ্ড, ১০। মাটগ্রাম, ১১। খেলন-বন, ১২। কচ্ছ-বন, ১৩। উচোগ্রাম, ১৪। গন্ধর্ব্ব-বন, ১৫। বিচ্ছু-বন, ১৬। আদিবদ্রী, ১৭। করহলা, ১৮। কোকিলাবন, ১৯। দধি-বন, ২০। অজনোখর, ২১। কোট-বন, ২২। পিসায়ো, ২৩। রাবল, ২৪। পরসোলী। নন্দগ্রামের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল।

যে সকল ভক্ত উপরোক্ত চব্বিশটী উপবন পরিভ্রমণ করিতে অসমর্থ তাঁহারা কেবলমাত্র নিম্নলিখিত ১২টী প্রসিদ্ধ বন প্রদক্ষিণ করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, যথাক্রমে ঐ বিখ্যাত ১২টী বনের নাম প্রকাশিত হইল ;—

১। মধুবন, ২। তালবন, ৩। কুমুদবন, ৪। মহাবন, ৫। বহুলাবন, ৬। কাম্যবন, ৭। খদিরবন, ৮। ভদ্রবন, ৯। ভাণ্ডীবন, ১০। খেলন-বন, ১১। লোহবন, ১২। বৃন্দাবন। কথিত আছে, উপরোক্ত ১২টী বন ভক্তিসহকারে পরিক্রমণ করিলে বহু পুণ্যসঞ্চয় করিতে পারা যায়। এই নিমিত্ত একটী প্রবাদ আছে, "যদি না দেখিনু বন, তবে ত নয় এ সেই মুরলীধারীর বৃন্দাবন"।

লীলাময়ের লীলা বোঝা কঠিন ব্যাপার। ভাবুক যে ভাবে তাঁহাকে দর্শন করিতে চান, তিনি তাহাকে সেইভাবেই দর্শন দিয়া থাকেন। প্রমাণস্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার যেরূপ প্রকৃতি, তিনি তাহাকে সেইরূপেই পরিচালনা করিয়া থাকেন। যে বৃন্দাবন নিত্যধাম, দেবগণের পূজনীয় ও পবিত্র, যথায় কেহ হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!! বলিয়া ভক্তিভাবে রোদন করিতে করিতে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতেছেন, কেহ জলে ও স্থলে বানর এবং বৃহদাকার কচ্ছপদিগকে আহার দিয়া সেই সকলকে একত্রিতপূর্ব্বক কত আমোদ অনুভব করিতেছেন, কেহ বা গাঁজায় দম দিয়া অসতী যুবতীদিগের প্রতি কটাক্ষ সঞ্চারণে মুগ্ধ হইতেছেন, কেহ বা খোল করতাল ও উচ্চ নিশান তুলিয়া কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইয়া হরি সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন, আবার কেহ বা নরম ছোলা ভাজার আস্বাদে বিভোর হইয়া কেবল তাহারই সুখ্যাতি করিতেছেন, এইরূপ কত প্রকার লোক এখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

দয়াময়! নিজগুণে কৃপা করিয়া সুমতি দান করুন, যেন দুষ্টমতি লোকদিগের কুচক্রে মিলিতে বা আপনার মহামহিমান্বিত পবিত্র নামে কলঙ্ক করিতে বাসনা না হয়। কেন না—এই পবিত্র ধামে স্বচক্ষে যাহা দেখিলাম, উহা লেখনীর দ্বারা প্রকাশ করিতে অসমর্থ

শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর পুরাতন মন্দির

এই লালপ্রস্তর নির্ম্মিত অত্যুচ্চ মন্দিরটী রাজপুতবীর মহারাজ মানসিংহ কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। বৃন্দাবনের যাবতীয় মন্দির অপেক্ষা ইহাই উচ্চতায় শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিল, এমন কি আগ্রা সহরের সম্রাটবাটী হইতে ইহার চূড়া অধিক উচ্চ অনুভব হইত। এই কারণে হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া সম্রাট ঔরঙ্গজেব মন্দিরের শিখরদেশটী ভাঙ্গিয়া ভূমে পাতিত করাইয়াছেন। বলাবাহুল্য, অদ্যাপি এই মন্দিরের শিল্পকার্য্য নয়নপথে পতিত হইলে মোহিত হইতে হয়। যে সময় সম্রাটের লোকজন তাঁহার আদেশপালন করিতে এখানে উপস্থিত হয়, সেই সময় রূপসনাতন উভয় ভ্রাতায় মিলিত হইয়া এই মন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বের এক গলির মধ্যে শ্রীমূর্ত্তিটীকে শ্রীমতী রাধিকাসহ প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। স্থানীয় ব্রজবাসী পাণ্ডার নিকট উপদেশ পাইলাম, বহু পূর্ব্বে ভগবান শ্রীগোবিন্দজীউ এক বন মধ্যে লুকাইত ছিলেন, গাভী সকল প্রত্যহ তাঁহাকে হৃষ্টচিত্তে দুগ্ধদান করিয়া আসিত, পরিশেষে তিনি রূপসনাতনের উপর সদয় হইয়া স্বপ্নে তাঁহার অবস্থানের বিষয় জানাইলে তিনি ভক্তিসহকারে সেই বিগ্রহমূর্ত্তিটী এখানে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করেন।

রূপ ও সনাতন দুই ভাই—পূর্ব্বে মুসলমান বাদশাহার নিকটে চাকরী করিতেন। তৎপরে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া রূপগোস্বামী উপাধি প্রাপ্ত হন। বৃন্দাবন মধ্যে ইঁহাদের সমাজ বৃহৎ ও বিখ্যাত। সেই বিখ্যাত সমাজের নিকট তেঁতুলতলায় অদ্যাপি শ্রীচৈতন্যদেবের পদচিহ্ন দর্শন পাওয়া যায়। কথিত আছে, রূপ যখন

নবাব সরকারে কর্ম্ম করিতেন, সেই সময় একদা বর্ষাকালের অন্ধকার রজনীতে নবাব তাঁহাকে তলপ করেন, আজ্ঞাপ্রাপ্ত রূপ—সেই অন্ধকার রজনীতে জলে ও কাদায় অতি কষ্টে যখন তাঁহার নিকট গমন করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় এক হীন জাতীয় চণ্ডাল কুটীর মধ্যে তাহার গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই অন্ধকারে জলে ভিজে ভিজে কে যাইতেছে, বল দেখি ?"

তদুত্তরে চণ্ডালিনী বলিল, "তোমার কিরূপ অনুমান হয় ?"

চণ্ডাল বলিল, "আমার বোধ হয়, একটা কুকুর যাইতেছে।"

কিন্তু চণ্ডালিনী বলিল, কখনই নয়—এ নিশ্চয় কাহারও চাকর হইবে, নচেৎ এই মহা দুর্য্যোগে অন্য কেহ হইতে পারে না ; আপনি বিবেচনা করুন, একটী সামান্য জীব—যাহাকে সকলে কুকুর বলে, তাহারও স্বাধীনতা আছে, অর্থাৎ তাহারা ইচ্ছামত অনেক কাজ করিতে পারে ; কিন্তু দুর্ভাগ্য চাকরের ভাগ্যে তাহা হইবার যোটী নাই।

রূপ তাহাদের এই যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র আপনাকে ধিক্কার দিয়া এবং নিজেকে কুকুরেরও অধম বুঝিয়া সংসারমায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করতঃ ক্রমে রূপ গোস্বামী উপাধি প্রাপ্ত হন।

শেঠের মন্দির

স্বনামধন্য লক্ষ্মীচাঁদ শেঠ এই অত্যাশ্চর্য্য প্রশস্ত ত্রিমহল মন্দির ও একটী বাগান এখানে সন ১২৬৩ সালে নির্ম্মাণ করাইয়া আপন কীর্ত্তি স্থাপিত করেন।

কথিত আছে, শেঠেরা অতিশয় ধনবান। পাঠক সমাজে ইঁহাদের

কিছু পূর্ব্ব বৃত্তান্তের পরিচয় দেওয়া উচিত। গোকুলদাস পারিখজী একজন গুজরাতী, তিনি গোয়ালিয়ার রাজার কোষাধ্যক্ষ হইয়া নিঃসন্তান অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন। শেষ দশায় গুরুর উপদেশ মত তিনি আপন মুক্তির নিমিত্ত বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এক সহোদর ব্যতীত ইহসংসারে তাঁহার আপনার বলিতে কেহই ছিলেন না; আবার সেই একমাত্র সহোদরের সহিত গোকুলদাসের মনের মিল না থাকায়, কোন বিশেষ কারণে তাহার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া অন্তিমকালে তিনি বিরক্ত হইয়া জৈনধর্ম্মাবলম্বী মণিরাম নামক একজন কর্ম্মচারীকে আপন যাবতীয় সম্পত্তি দান করিয়া যান। সেই মণিরামের বংশধরেরা কালক্রমে বৈষ্ণবধর্ম্মের মাহাত্ম্য অবগত হইয়া একে একে সকলেই এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন, তাঁহারাই ব্রজমণ্ডলে এক্ষণে শেঠ নামে খ্যাত হইয়াছেন। রঙ্গাচার্য্য স্বামী ইঁহাদের পৈতৃক গুরু। ইনি দ্রাবিড়ী, সুতরাং এই গুরুর আদেশ মত বৃন্দাবনের এই মন্দিরটী অকাতরে ৪৩ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়সহকারে তামিলভাবে প্রস্তুত করাইয়া আপন কীর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছেন। মন্দিরাভ্যন্তরে শেঠজীর স্থাপিত শ্রীরঙ্গজী বিরাজ করিতেছেন ও একটী বৃহৎ স্বর্ণের স্তম্ভ শোভা পাইতেছে। সাধারণে ঐ স্তম্ভটীকে সোণার তালগাছ বলিয়া থাকেন, কিন্তু আমি বারম্বার পরীক্ষা করিয়াও ইহার তালগাছ নাম কেন হইয়াছে, উহা বুঝিতে পারিলাম না। শ্রীধাম বৃন্দাবনের মধ্যে এই বাগান ও দেবালয়টী শোভায় ও সৌন্দর্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।

চৈত্র মাসে ব্রহ্মোৎসব মেলার সময় এখানকার এই শ্রীরঙ্গনাথজীউর বিগ্রহমূর্ত্তিটী মন্দির হইতে প্রতিদিন অতি সমারোহে সেই বাগানে আনীত হয়, ঐ সময় বাগানটী অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে। প্রতি বৎসর কৃষ্ণাদ্বিতীয়া তিথি হইতে ত্রয়োদশী

পর্য্যন্ত এই বারদিন উৎসবের মধ্যে পঞ্চমী ও দশমীতিথিতে বাগানের ভিতর বিগ্রহদেবের সম্মুখে অনেক টাকার বাজী পোড়াইয়া আমোদ কৌতুক হইয়া থাকে ; অধিকন্তু এই দুইদিন অপরাহ্ণে প্রথম প্রাচীরের মধ্যস্থিত উদ্যানে নানাবিধ নাচ, গান ও তামাসা হইয়া থাকে দাক্ষিণ্যাতের অনুরূপ এই বিখ্যাত মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে দুর্গের ন্যায় সুদৃঢ় প্রস্তরের প্রাচীর আছে এবং মধ্যে একটী সুন্দর পাথর দ্বারা বাঁধান পুষ্করিণীও আছে। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমার দিন ঐ পুষ্করিণীতে শ্রীবিগ্রহদেবের গজেন্দ্রমোহন নামে এক লীলাখেলা উৎসব হইয়া থাকে। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত সেই জগদ্বিখ্যাত শেঠজীর দেবালয়ের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল।

ব্রহ্মোৎসব ব্যতীত ভাদ্র মাসের কৃষ্ণানবমীর দিন এখানে যে মেলা হয়, উহা "লাঠ্‌ঠার মেলা" নামে খ্যাত। ঠিক এইরূপ একটী মেলা ফরাসী চন্দননগরে "ফ্যাসতা" নামে প্রসিদ্ধ আছে। মহাবীর নেপোলীয়ানের নাম বোধ হয়, অনেকেই শুনিয়াছেন, সেই ফরাসীবীর নেপোলীয়ানের জন্মোৎসব মেলাটী ফ্যাসতা নামে প্রসিদ্ধ। একটী স্থূল ও দীর্ঘ কাষ্ঠস্তম্ভ তৈল ও নানাপ্রকার মসৃণ পদার্থ দ্বারা পিচ্ছল করতঃ তাহার নিম্নভাগের দিকটী মাটিতে প্রোথিত করিয়া উর্দ্ধভাগে কয়েকটী পিতলের ছোট ঘটিতে টাকা পূর্ণ করা হয় এবং ঐ সকল ঘটিগুলি সেই স্তম্ভের শিখরদেশে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, আবার তাহার নিকটে উচ্চ মঞ্চ প্রস্তুত করাইয়া রং, তৈল ও জল লইয়া অনেকে অপেক্ষা করিতে থাকেন ; যাহারা উক্ত টাকার লোভে ঐ মসৃণ স্তম্ভ বাহিয়া উপরে সেই ঘটিপূর্ণ টাকাগুলি লইবার চেষ্টা করে, কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত যথাসময়ে উক্ত মঞ্চের উপর হইতে সেই প্রকার সঞ্চিত কলসী হইতে তৈল জল ঢালিয়া দেওয়া হয়, সুতরাং তাহারা নানারঙ্গে রঞ্জিত হইয়া ভূমে

পতিত হইতে থাকে। এ রহস্য মন্দ নয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—এইরূপ কষ্ট ও লাঞ্ছনাভোগ সহ্য করিয়াও শেষে ঐ সমস্ত দ্রব্য-গুলিকে লাভ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষে মন্দির হইতে বাগান পর্য্যন্ত শ্রীরাম-লীলার অভিনয় হইয়া থাকে। এই দীর্ঘকালব্যাপী লীলাখেলার সময় সেদিন দেবালয়ের সম্মুখস্থ বিস্তৃত স্থানে ধনুর্ভঙ্গাভিনয় এবং গোবিন্দ-বাজারে—ভরত মিলনাভিনয় হইয়া থাকে, এই দুই অভিনয়ই দর্শন-যোগ্য।

পৌষ মাসে কৃষ্ণএকাদশী হইতে শুক্লাপঞ্চমী পর্য্যন্ত মন্দিরের দ্বিতীয় মহলের নাটমন্দিরে "বৈকুণ্ঠ উৎসব" নামে আর একটী উৎসব হইয়া থাকে। এই সময় নাটমন্দিরটী বহু মূল্যবান চিত্র ও ঝাড়, লণ্ঠন প্রভৃতির দ্বারা সুসজ্জিত করা হয় এবং প্রতিদিন রাত্রিকালে শ্রীমূর্ত্তিটীকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত করাইয়া ভগবান "পোড়ানাথের বিগ্রহমূর্ত্তিটীকে" গীতবাদ্যসহকারে মন্দির প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিক পরিক্রমণ করান হয়।

ব্রহ্মচারীর মন্দির

এই মন্দির গোয়ালিয়ারের মহারাজ "সিন্ধিয়া" নির্ম্মাণ করাইয়া প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক স্বীয় গুরু জীবাজীরাও নামক ব্রহ্মচারীকে দান করেন। তাঁহারই উপদেশ মত মন্দিরটী প্রস্তুত হইয়াছিল, তন্মধ্যে এই ব্রহ্মচারী—হৃষ্টচিত্তে শ্রীরাধাগোপাল, শ্রীহংসগোপাল এবং শ্রীনৃত্যগোপাল নামে তিনটী বিগ্রহমূর্ত্তি স্থাপিত করেন। এই নিমিত্ত এই মন্দিরটী "ব্রহ্ম-চারীর মন্দির" নামে প্রসিদ্ধ।

লালা বাবুর মন্দির

প্রাতঃস্মরণীয় পরম ভক্ত পাইকপাড়া নিবাসী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর—জনসমাজে লালা বাবু নামে পরিচিত ছিলেন। সেই মহাত্মাই ১৮১০ খৃষ্টাব্দে এখানে এই মন্দিরটী প্রস্তুত করাইয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নামে এক বিগ্রহমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনধন শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি দর্শন করিলে নয়ন ও জীবন সার্থক হয়। কথিত আছে, এই মহাত্মা একদা এক মেছুনীর বাক্যে সংসার ত্যাগ করিয়া এখানে দানশালা, অতিথিশালা ও মন্দিরটী প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক জীবনের শেষভাগ এই স্থানেই অতিবাহিত করতঃ মুক্তির পথ পরিষ্কার করিয়া সাধারণকে অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে শিক্ষাদান দিয়াছেন। প্রবাদ—কোন এক সময় জনৈক মেছুনী তাঁহার বাটীতে মৎস্য বিক্রয় করিতে আসিয়া সহসা "হরি হে পার কর, সময় বয়ে যায়" বলে, তাহার এই সারগর্ভ বাক্যটী শ্রবণপূর্ব্বক তিনি স্থির করিলেন, আমারও ত সময় বয়ে যাইতেছে, পরপারের জন্য আমি ত কিছুই করি নাই। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি ভবপারের কাণ্ডারী শ্রীহরির শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহার মন্দির মধ্যে অদ্যাপি দানশালা, অতিথিশালা এবং এক তুলসীমঞ্চের মধ্যে সেই মহাত্মার সমাধি মন্দিরটী বর্ত্তমান থাকিয়া অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউর মন্দির

এই মন্দির মধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি দর্শন করিলে আনন্দে অধীর হইবেন, সন্দেহ নাই। ইনি গোপীদিগের কর্ত্তারূপে বিরাজ করিতেন বলিয়া এখানে গোপীনাথ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। বৃন্দাবনে শ্রীগোপীনাথজীউর শ্রীমূর্ত্তিটী শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীমদনমোহনের মূর্ত্তি অপেক্ষা আকারে অনেক ছোটরূপে দর্শন পাওয়া যায়। এই শ্রীমূর্ত্তিটী মধুপণ্ডিত দ্বারা বংশীবটমূলের ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়া এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমদনমোহনজীউর মন্দির

শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রতিদিন মথুরায় ভিক্ষা করিতে যাইতেন, সেই স্থানে কোন চোবের বাটীতে শ্রীমদনমোহনকে প্রাপ্ত হন। কুব্জা-দেবী ভক্তিসহকারে এই মদনমোহনের শ্রীমূর্ত্তিটী প্রত্যহ পূজা করিতেন। মথুরায় কংসরাজার পতন হইবার পর এই মদনমোহন মূর্ত্তিটীও অদৃশ্য হইয়াছিল।

কথিত আছে, মদনমোহনজীউ একদা সনাতন গোঁসাইএর প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া নিজালয়ে আনয়নপূর্ব্বক পুরাতন মন্দিরের নিকট তাঁহাকে এই স্থানে প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক সেবা করিতেন এবং নিত্য "আঙাকড়ী" প্রস্তুত করিয়া ভক্তিসহকারে ভগবানের ভোগ দিতেন। ভক্তের ভগবান্ উহাতেই সন্তুষ্ট হইতেন। এই নিমিত্ত অদ্যাপিও এখানে নানা

উপচারে সেই মদনমোহনজীউর ভোগের পর "আণ্ডাকড়ী" দিয়া একবার ভোগ হইয়া থাকে, (আটা জলে মিশ্রিত হইয়া আগুনে পোড়ান হয়, উহা আণ্ডাকড়ী নামে খ্যাত)। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে একদা রামদাস নামক জনৈক বণিক নৌকাযোগে সেই দেবস্থানের নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন। লীলাময় ভগবান আপন লীলা প্রকাশ করিবার জন্য মন্দিরের সম্মুখে বণিকের সেই নৌকাখানি আটক করিয়া রাখিলেন। এদিকে রামদাস দুই-তিনদিন প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও কোনরূপে তাহার সেই নৌকাখানিমুক্ত করিতে না পারিয়া হতাশপ্রাণে গোসাইজীর শরণাপন্ন হইলেন এবং কাতরস্বরে তাঁহাকে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

গোসাইজী—বণিকের করুণবিলাপে এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ অবগত হইলে—তাঁহার সরল হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। তখন তিনি বণিক্‌কে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তুমি নৌকায় যাইলেই আমার মদনমোহনের কৃপায় অবরুদ্ধ নৌকাখানি সহজেই চালিত হইবে।"

বণিক এইরূপে আশ্বাসিত হইয়া তাঁহার আদেশ মত নৌকায় উঠিয়া দেখিলেন যে, যথার্থই নৌকাখানি মুক্ত হইয়াছে। এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া রামদাস ঐ স্থানে মানত করিলেন যে, আমি যে ভয়ঙ্কর স্থানে প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া বাণিজ্য করিতে যাইতেছি, যদি ইহাতে আমার বিত্ত লাভ হয় এবং নির্বিঘ্নে বাটী প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে নিজ ব্যয়ে প্রভুর এখানে একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিব। এইরূপ মানত করিয়া তিনি গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিলেন। এদিকে দয়াময়ের কৃপায় তাঁহার কোন কিছুরই অভাব হইল না, সুতরাং তিনি প্রত্যাবর্ত্তন-

পূর্ব্বক এই দেবালয়টী নির্ম্মাণ করিয়া পূর্ব্ব অঙ্গীকার পালন করিলেন। আজ-কাল বৃন্দাবনে ভগবান মদনমোহনজীউর যে মন্দির আমরা দেখিতে পাই, উহা সেই রামদাস বণিকেরই নির্ম্মিত।

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরজীউর মন্দির

এই মন্দিরটী ধারেন্দা পরগণার অন্তর্গত বাহাদুরগ্রাম নিবাসী শ্রীশ্যামানন্দ গোস্বামী মহাশয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই নয়নানন্দদায়ক নবজলধর শ্রীশ্যামসুন্দর ও পার্শ্বে স্থির সৌদামিনী সদৃশ শ্রীমতী রাধিকা-দেবীর একত্র দর্শন করিতে ভক্তবৃন্দকে /০ আনা ভেট দিতে হয়। বলাবাহুল্য, এরূপ অপরূপ "শ্রীমূর্ত্তি" সমস্ত বৃন্দাবন মধ্যে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সাহজীর মন্দির

লক্ষ্ণৌ নিবাসী সা বিহারীলাল এখানে বহু অর্থ ব্যয়সহকারে আপন কীর্ত্তি স্থাপিত করেন। এই সাহজীর বংশধর—রামলাল বদ্রিদাস বাহাদুর যিনি তাঁহার কলিকাতাস্থ কুটীরের অধিকারী।

বৃন্দাবনে—সাহজীর মন্দিরের দৃশ্য অতি মনোহর ও নানাবিধ সুন্দর সুন্দর শ্বেত এবং কৃষ্ণ মারবেল পাথরের উপর কারুকার্য্যখচিত; বস্তুতঃ ইহার শিল্পনৈপুণ্য দর্শন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। দেবালয় মধ্যে নানা ধরণের নানাপ্রকার ফোয়ারা সংযুক্ত থাকায়, ইহার শোভা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৃন্দাবনে জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাতে প্রায় সকল মন্দিরেই স্নানযাত্রা উৎসব হইয়া থাকে। সেই উৎসবটী "জলযাত্রা" নামে খ্যাত।

উৎসব সময় এই সাহজীর মন্দিরের জলযাত্রা দর্শন করিলে—আনন্দে অধীর হইতে হয়, কারণ এই সকল ফোয়ারাগুলি এখানে এরূপভাবে সজ্জিত ও খোলা থাকে যে, "জলযাত্রা" উৎসব দর্শন করিতে যাইয়া দর্শকগণেরও স্নানযাত্রা হইয়া থাকে, অর্থাৎ এই জলযাত্রা উৎসব দর্শন করিতে গিয়া কেহ না ভিজিয়া ফিরিতে পারেন না।

অনেক দেবালয়ে এই জ্যৈষ্ঠ মাসে আবার "ফুলবাঙ্গালা" নামক উৎসব হয়,অর্থাৎ দেবালয়ের মধ্যস্থ এক স্থানে পুষ্পের দ্বারা কুঞ্জ প্রস্তুত করিয়া রাত্রিকালে ঐ কুঞ্জমধ্যে বিগ্রহমূর্ত্তির অভিষেক হইয়া থাকে।

শ্রীবঙ্কুবিহারীর মন্দির

এই মন্দিরটী হরিদাস গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত। তিনি একজন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন, অর্থাৎ নিধুবনে ভজন করিয়াই তিনি জনসমাজে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, একদা তিনি স্বপ্নাদেশে জানিতে পারিলেন—বিশাখা-কুণ্ড মধ্যে এক দেবমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন, তদনু-যায়ী তিনি সন্ধান করিলে যে বিগ্রহমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন, ঐ মূর্ত্তিই এখানে প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক শ্রীবঙ্কুবিহারী নামে প্রসিদ্ধ করেন। এই বিগ্রহমূর্ত্তির চরণযুগল সদাসর্ব্বদা বস্ত্র দ্বারা আবৃত থাকে, বৎসরান্তে কেবল বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া দিনে ওয়ালটেয়ারের নিকটস্থ প্রহ্লাদপুরীর নৃসিংহদেবের ন্যায় ভক্তগণ তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিবার অবসর পাইয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীরাধারমণজীউর দেবালয়

বা

অদ্ভুত শালগ্রামশিলা

পূর্ব্বে এই মূর্ত্তি শালগ্রামশিলারূপেই অবস্থিত ছিলেন। স্থানীয় ব্রজবাসীর নিকট উপদেশ পাইলাম, একদা কোন ধনাঢ্য জমিদার এখানে উপস্থিত হইলে বৃন্দাবনস্থ যাবতীয় দেবালয়ের বিগ্রহমূর্ত্তিকে বস্ত্রালঙ্কার দান করিয়াছিলেন। যথানিয়মে সেই দাতা এই দেবালয়েও বস্ত্রালঙ্কার পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু সেবায়েত গোস্বামী মহাশয় ঐ সমস্ত অলঙ্কারাদি প্রাপ্ত হইলে সন্তুষ্ট হওয়ার পরিবর্ত্তে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, হায়! আমি এ সমস্ত বহু মূল্য অলঙ্কারাদি লইয়া কি করিব? আজ যদি আমার ইষ্টদেব হস্তপদবিশিষ্ট হইতেন, তাহা হইলে এই সকল অলঙ্কার দ্বারা তাঁহাকে ভূষিত করিয়া আমি কতই না আনন্দানুভব করিতাম। ভক্তবৎসল—ভক্তের আন্তরিক দুঃখ অবগত হইয়া তাঁহার দুঃখ দূরীকরণার্থে রাত্রিকালে ঐ শিলা হইতেই দ্বিভুজ মুরলীধর মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ভক্তের আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন। তাই বলি, ভক্তাধীন! তুমি ভক্তের আশা পূর্ণ করিবার জন্য সকলই করিতে পার! এই শ্রীরাধারমণ মূর্ত্তি এবং পূর্ব্ব ঘটনার বিষয় অবগত হইলে আনন্দে অধীর হইতে হয়। শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয় এই মন্দিরটী স্থাপিত করিয়াছিলেন, দেবালয়ের পশ্চাদ্ভাগে শ্রীরূপ ও শ্রীজীব গোস্বামীদিগের সমাজ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সেই সমাজক্ষেত্র দর্শন করিলেও ভক্তগণ পুণ্যসঞ্চয় করিতে পারিবেন।

সেবা-কুঞ্জ

এই কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাসহ বিহার করিয়া থাকেন। রাত্রিকালে জনমানুষ এখানে থাকিতে অধিকার পান না, সুতরাং রাত্রিকালে কেহই এখানে থাকেন না। ব্রজবাসীগণ ইহার মধ্যে কতকগুলি শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা স্থান দেখাইয়া থাকেন। স্থানটী প্রাচীরবেষ্টিত। কুঞ্জমধ্যে "ললিতা-কুণ্ড" নামে একটী সরোবর আছে। প্রবাদ এই-রূপ—কোন সময়ে এক ব্যক্তি অন্যের অলক্ষিতভাবে রাত্রিকালে তথায় লুকাইয়াছিল, পরদিন প্রাতঃকালে তাহাকে খঞ্জ ও বোবা অবস্থায় এই প্রাচীরসীমার বাহিরে পতিত থাকিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রহ্ম-কুণ্ড

এক সময় প্রজাপতি ব্রহ্মা—ব্রজে জন্মগ্রহণ করিবার কামনা করিয়া ভগবানের আরাধনায় রত হন, তাঁহারই অশ্রুতে এই কুণ্ডটীর সৃষ্টি হইয়াছে। প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসের শুক্লানবমী তিথিতে এই কুণ্ড-তীরে একটী মেলা হইয়া থাকে, এবং উক্ত নির্দ্দিষ্ট দিনে ভক্তগণ মুক্তি কামনাপূর্ব্বক ইহাতে স্নান, তর্পণ করিয়া চরিতার্থ বোধ করিয়া থাকেন। কুণ্ডটী বেমেরামতি অবস্থায় থাকায় এক্ষণে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

অক্রূর তীর্থ

নন্দালয় হইতে মথুরা গমনকালে শ্রীরামকৃষ্ণ এই স্থানে ভক্ত অক্রূরকে যমুনা-জলে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালে সেই স্থানটী "অক্রূরঘাট" নামে প্রসিদ্ধ আছে।

নিধুবন

পূর্ব্বে এই বন অত্যন্ত নিবিড় ও সুদৃশ্য ছিল। কথিত আছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনাগণসহ গুপ্তভাবে এই নিভৃত স্থানে বিহার করিতেন এবং এই স্থানেই একদা শ্রীমতীরাই রাজা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দ্বারী সাজাইয়া কত আনন্দ-কৌতুক অনুভব করিয়াছিলেন। এই নিধুবনে "বিশাখা-কুণ্ড" নামে একটী পুণ্য সরোবর দেখিতে পাওয়া যায় ব্রজবাসীরা এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটী লীলা চিহ্ন দেখাইয়া থাকেন। আশ্চর্য্যের বিষয়—যে বৃন্দাবন বানরদিগের আবাসস্থল, যে বানরগণ নির্জ্জন ও বৃক্ষকুঞ্জে বাস করিতে ভালবাসে, স্থান মাহাত্ম্যগুণে শ্রীরাধার আদেশে সেই বানরকুল সন্ধ্যার পর হইতে সমস্ত রজনীমধ্যে এখানে একটীও দেখিতে পাওয়া যায় না, আবার প্রভাত হইতে-না-হইতে ইহাদের সমাগম হইতে থাকে। এইরূপ আবার একদা এক কাক (পক্ষী বিশেষ) রাত্রিকালে এই বনে চীৎকার করিয়া শ্রীমতীর নিদ্রা-সুখে ব্যাঘাত করিয়াছিল বলিয়া রাধারাণী রোষভরে বায়সকুলকে জন্মের মত বৃন্দাবন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন, সুতরাং কোন কাককে এখানে দেখিতে পাওয়া যায় না।

নিধুবনে—অনেক ইষ্টক নুড়ি পতিত থাকে, এই লীলা স্থানে উপস্থিত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক যিনি শ্রীরাধার নিকট প্রার্থনা করিয়া ঐ সকল পতিত ইষ্টক দ্বারা কৃত্রিম বাটী প্রস্তুত করেন, শ্রীশ্রীরাধারাণীর কৃপায় তিনি সেইরূপ একটী বাটী লাভ করিতে সামর্থ হন। এই নিমিত্ত ভক্তগণ এখানে উপস্থিত হইয়া সেই নুড়ির দ্বারা কৃত্রিম বাটী নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন।

যমুনা-পুলিন

এই স্থানে শ্রীনন্দদুলাল গোপবালাগণকে লইয়া রাসলীলা করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত এখানকার রজস্তূপ মস্তকে লেপন করিলে—শ্রীরাধাকৃষ্ণের কৃপায় সকল প্রকার পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। যে পঞ্চক্রোশ পরিমিত স্থান বৃন্দাবন নামে প্রসিদ্ধ, সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানই যমুনা-পুলিন ছিল, বর্ত্তমানকালে এখানে বিস্তর ঘর-বাড়ী প্রস্তুত হওয়াতে কেবল ইহার সামান্যমাত্র স্থানটী "যমুনা-পুলিন" নির্দ্দিষ্ট হইয়া খ্যাত হইয়াছে। বৃন্দাবনে যে সমস্ত দেবালয় ও মন্দির বর্ত্তমান আছে, সেগুলি এক-একটী বর্ণনা করিলে একখানি বৃহৎ পুস্তক প্রস্তুত হয়।

শ্রী শ্রীগোপেশ্বরদেবের মন্দির

৺গোপেশ্বর মহাদেব বৃন্দাবনের জাগ্রত এবং অনাদিলিঙ্গ। বৃন্দাবনে আসিলে এই অনাদিলিঙ্গকে পূজার্চ্চনা করা একান্ত কর্ত্তব্য বিবেচনা করিবেন ; কেন না, ভক্তগণ তাঁহার অর্চ্চনা না করিলে—তিনি কুপিত হইয়া ব্রজমণ্ডল দর্শনের যাবতীয় তীর্থফল হরণ করিয়া থাকেন।

কথিত আছে, একদা রাসের সময় যখন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবালাদিগের সহিত বৃন্দাবনে রাসলীলায় মত্ত ছিলেন, সেই সময় তাঁহার আজ্ঞায় ঐ স্থানে কোন পুরুষের প্রবেশ অধিকার ছিল না। বিশ্বেশ্বরের ঐ লীলা-খেলা দর্শনের একান্ত বাসনা হইল, সুতরাং মায়া প্রভাবে তিনি গোপ-নারীর বেশ ধারণ করতঃ ঐ মহারাসখেলা দেখিতে যান, কিন্তু মায়াময় শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাঁহার মায়া ব্যর্থ হইল। শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বেশ্বরের মায়া

অবগত হইয়া সর্ব্বসমক্ষে ঐ মায়ারূপধারী নারীমূর্ত্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে গোপেশ্বর! "হরহরি এক আত্মা, ভিন্ন নহে কদাচন"। সেই অবধি স্বয়ং বিশ্বেশ্বর এখানে গোপেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছেন এবং প্রতি বৎসর রাসের নির্দ্দিষ্ট সময় ইনি এখানে গোপীরূপ ধারণ করিয়া থাকেন। গোপেশ্বরদেবের মন্দিরটী জীর্ণ অবস্থায় যমুনাতীরের উপরিভাগে অবস্থিত।

উৎসব

বৃন্দাবনে—প্রতি মাসেই ছোট বড় উৎসব হইয়া থাকে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য উৎসবগুলি প্রকাশিত হইল;—

বৈশাখ—শুক্লা তৃতীয়াতে শ্রীবঙ্কুবিহারীর চরণ দর্শন, চন্দন যাত্রা এবং চতুর্দ্দশী তিথিতে ভগবান নরসিংহদেবের লীলাভিনয় হয়।

জ্যৈষ্ঠ—পূর্ণিমা তিথিতে প্রায় সকল দেবালয়েই স্নান-যাত্রা বা জলযাত্রার উৎসব হয়, এতদ্ভিন্ন এই জ্যৈষ্ঠ মাসে আবার অনেক দেবালয়ে "ফুলবাঙ্গালা" নামক উৎসব হইয়া থাকে।

আষাঢ়—রথযাত্রা উৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হয়। এ উৎসব এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! যিনি দেখিবেন, তাঁহাকেই চমৎকৃত হইতে হইবে। আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে এই মহোৎসবটী সম্পন্ন হইয়া থাকে। ঐ দিবস অপরাহ্নকালে ভিন্ন ভিন্ন দেবালয় হইতে সমস্ত রথগুলি বর্ত্তমানকালের নির্দ্দিষ্ট যমুনা-পুলিন নামক স্থানে একত্রিত হয়। এই উৎসব দর্শন করিবার নিমিত্ত বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

শ্রাবণ—বৃন্দাবনে যেখানে যত দেবালয় আছে, ছোট বড় সকল

দেবালয়েই শ্রাবণ মাসে শুক্লপক্ষের তৃতীয়াতিথিতে তাহাদের বিগ্রহ মূর্ত্তিটী ঝুলনযাত্রা উৎসবে যোগদান করেন এবং পূর্ণিমা-তিথিতে উৎসবের অবসান হইয়া থাকে। বৃন্দাবনে যতগুলি পর্ব্ব আছে, তন্মধ্যে ঝুলন উৎসবই সর্ব্বরকমে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া থাকে। কেন না, এই সময় যে দেবের যেরূপ আসবাবপত্র থাকে, সেবাইতগণ সাধ্যমত বিগ্রহমূর্ত্তি এবং মন্দিরটী সাজাইয়া তাঁহাদের আপনাপন ধনবলের পরিচয় দিয়া থাকেন। বলাবাহুল্য, এই প্রশস্ত ঝুলন উৎসবের সময় বৃন্দাবনধামটী যেন নবকলেবরে অপূর্ব্ব শোভায় সজ্জিত হয়। এই নিমিত্ত ঝুলন উৎসব দর্শন করিতে দলে দলে কাতারে কাতারে বহু দূরদেশ হইতে ভক্তগণের সমাগম অধিক হইয়া থাকে। এরূপ যাত্রীসমাগম বৃন্দাবনে আর কখন হয় না।

কথিত আছে, এই পুণ্যক্ষেত্র শ্রীকৃষ্ণের লীলা স্থানে আসিয়া যে সকল পাষণ্ড পাপকর্ম্মে লিপ্ত হয়, তাহারাই এখানে কচ্ছপযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ভাদ্র—কৃষ্ণা অষ্টমীতিথিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব এবং শুক্লা অষ্টমীতে শ্রীরাধার জন্মোৎসব হইয়া থাকে। এই সময় শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে হলুদজল ছড়াছড়ি, ঘটি কাড়াকাড়ি প্রভৃতি নানাপ্রকার আমোদজনক কৌতুক প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

আশ্বিন—কৃষ্ণা পঞ্চমী হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত এখানকার কয়েকটী দেবালয়ে "সাঞ্জী" নামক উৎসব হইয়া থাকে। নূতন মৃত্তিকা-বেদী নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহার উপর বিবিধ প্রকারের চূর্ণ রং দিয়া নারায়ণের লীলাখেলাকে সাঞ্জী উৎসব বলে। এইরূপ আবার পূর্ণিমা-তিথিতে শারদোৎসব হয়। লতাপুষ্পাদির কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়া উহাতে বিগ্রহমূর্ত্তির পূজার্চ্চনাকে শারদ উৎসব বলে।

কার্ত্তিক—বাঙ্গলাদেশের ন্যায় এখানেও অমাবস্যা রাত্রিতে দীপদান হয়, এই উৎসব "দেওয়ালী" নামে খ্যাত; এই সময় প্রত্যেক মন্দির, প্রত্যেক বাড়ী, সাধারণ রাজপথগুলি পর্য্যন্ত আলোকমালায় সজ্জিত হয়, অধিকন্তু প্রতি ঘরে ঘরে লক্ষ্মী-পূজা হইয়া থাকে।

পর দিবস প্রাতে লক্ষ্মী-পূজার ন্যায় সকল বাড়ীতেই শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা এবং মধ্যাহ্নে—প্রত্যেক দেবালয়ে "অন্নকূট" উৎসব হইয়া থাকে। ভারে ভারে অন্ন, তদুপযুক্ত বিবিধ প্রকার দধি, ব্যঞ্জন, ফল, মিষ্টান্ন প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে ভোগ সজ্জিতপূর্ব্বক ঐ ভোগদর্শনই অন্ন-কূট নামে খ্যাত। এই দিবস দলে দলে কাতারে কাতারে অসংখ্য ভক্তগণ সেই ভোগদর্শন হইবার পর হইতেই প্রসাদ লইতে থাকেন।

কার্ত্তিক মাসের শুক্লা অষ্টমীতিথিতে গোপাষ্টমী লীলাখেলা প্রদর্শিত হয়। এই উৎসবকালে ব্রাহ্মণ বালকগণকে শ্রীকৃষ্ণ ও সুদামাদি সখা সাজাইয়া নানা গোবৎসসহ গোচারণের ভাব প্রদর্শনকে গোপাষ্টমী উৎসব বলে। এই কার্ত্তিক মাসেই আবার শুক্লপক্ষে যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ কংস অনুচর অঘাসুর, বকাসুর প্রভৃতিকে এখানে বিনাস করিয়া-ছিলেন, সেইরূপ একটী কৃত্রিম লীলা প্রদর্শন হয়।

অগ্রহায়ণ মাসে—কেবল শেঠের বাড়ী রামলীলা উৎসব বাহির হয়।

পৌষ মাসে—কেবল শেঠের বাড়ীতে "বৈকুণ্ঠ উৎসব" নামে একটী উৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

মাঘ মাসে—শুক্লা-পঞ্চমীতে এখানে প্রত্যেক দেবালয়ে বসন্তোৎসব হইয়া থাকে। এই পঞ্চমীর অপরাহ্নকালে বৃন্দাবনের পথ-গুলিকে যেন এক নবশ্রীধারণ করে, কারণ চির প্রথানুসারে এই দিবস ব্রজবাসীগণ পীতবস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উদ্যান ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

ফাল্গুন মাসে—হুলী উৎসব। এই হুলা উৎসব এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমীতিথিতে আরম্ভ হইয়া চৈত্র কৃষ্ণা প্রতিপদে সমাপ্ত হইয়া থাকে। এরূপ মহামারী ব্যাপার উৎসব—লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করা অসাধ্য। এই হুলী উৎসবকালে কি স্ত্রী, কি পুরুষ, ব্রজবাসীমাত্রেই যেন উন্মাদগ্রস্ত হইয়া থাকেন, কেন না—এরূপ ঢলাঢলী, আবীর মাখামাখী, লাঠী খেলা করিবার সময় নানা ভাব-ভঙ্গীসহকারে অকথ্য ভাষায় স্বাধীনভাবে কথা বলাবলি আর কখন এখানে শুনিতে পাওয়া যায় না। এই চৈত্র মাসের কৃষ্ণা প্রতিপদের দিন অপরাহ্নকালে প্রত্যেক মন্দিরে বিগ্রহমূর্ত্তি দোলে বসিলে সেই হুলী উৎসবের পূর্ণাহুতি হইয়া শেষ হয়।

চৈত্র মাসে—শ্রীরঙ্গনাথজীউর "ব্রহ্মোৎসব" কেবল শেঠের ঠাকুর বাড়ীতেই হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ছোট ছোট উৎসব যে বৃন্দা-বনে কত হয়, উহা লিখিয়া কত জানাইব।

উপরোক্ত উৎসব ব্যতীত এখানে আর একটী উল্লেখযোগ্য উৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সেই উৎসবের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই, কারণ যে বিগ্রহ যে মন্দিরে যে দিন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, ঐ নির্দ্দিষ্ট দিনেই সেই মন্দিরে এই উৎসবটী "সিংহাসন" উৎসব নামে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বৃন্দাবনের সাধারণ অবস্থা

ব্রজের ভাষা এবং বেশভূষা মাড়োয়ারীদিগের অনুরূপ। বৈষ্ণব-ধর্ম্মই ইঁহাদের প্রীতিপ্রধান। তাঁহাদের মতে যুগল-ভজন আবশ্যক, কিন্তু আরাধিত যুগলমূর্ত্তির পরস্পর সম্পর্ক অপবিত্র। এই কারণে

এখানে বৈষ্ণবধর্ম্মে ব্যভিচার হেয় বলিয়া গণ্য হয় না। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অনন্তপ্রণয়ই যখন তাঁহাদের আদর্শ, তখন সতীত্ব বিষয়ে উপাসকের মন কি ভাবে গঠিত হয়, উহা সহজেই অনুমেয়।

এখানে সবরেজিষ্টারী আফিস, সরকারী ডাক্তারখানা, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, থানা, মিউনিসিপ্যালিটী এবং অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটকোর্ট বিদ্যমান থাকিয়া শান্তিরক্ষা করিতেছে। খাদ্য-সামগ্রীর মধ্যে ছানার দ্রব্য ব্যতীত সকল সামগ্রীই পাওয়া যায়। এ প্রদেশে ভাল ভাল আচার পাওয়া যায়; রজকের সুবিধা এ দেশে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে যতগুলি বাজার আছে, তন্মধ্যে রোতিয়া নামক বাজারে ভাল খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায়। তরিতরকারীর বাজারের মধ্যে গোবিন্দ বাজারটীই শ্রেষ্ঠ। প্রাতঃকাল হইতে বেলা দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত এখানকার বাজার বসিবার নিরূপিত সময় ধার্য্য আছে। এই নির্দ্ধারিত সময় অতীত হইলে আর কোন প্রকার আনাজ-পত্র এখানে পাওয়া যায় না। "আদা" বৃন্দাবনে অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। বৃন্দাবনে অন্যূন পঁচিশ হাজার লোকের বসতি আছে।

গোবিন্দবাজারের অপর নাম "লুইবাজার"। এখানে তরী-তরকারী ব্যতীত বৃন্দাবনী ও জয়পুরী ছাপার নানা প্রকার ধুতী, চাদর, শাড়ী, নামাবলী, লুই, উলের ধুতি, ধোসা, লোমবস্ত্র, পিত্তলের ও মাটীর খেলনা প্রভৃতি সকল বাজার অপেক্ষা সুবিধা দরে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

বেলবন

কেশীঘাটের পরপারে প্রায় এক মাইল দূরে এই প্রসিদ্ধ বনটী অবস্থিত। এখানকার এই বন—বহু সংখ্যক বিল্ববৃক্ষে পরিশোভিত। প্রবাদ এইরূপ, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী এই স্থানে বিষাদ মনে সতত অবস্থান করেন, কেন না—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে রাসলীলায় মত্ত হন। তখন যাবতীয় গোপবালাগণ তথায় গমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কিন্তু একমাত্র মাধুর্য্যরসের অধিকারিণী শ্রীমতীলক্ষ্মীদেবী ঐ সময় মান-ভরে তথায় যাইতে না পারিয়া বিষাদমনে এই স্থানে বসিয়া অদ্যাপি নারায়ণের তপস্যা করিতেছেন। যাত্রীগণ এই পবিত্র বন পরিভ্রমণের সময় বৃন্দাবন হইতে সিন্দুর, চাউল, শুক্লপুষ্প, লোহা, আল্‌তা প্রভৃতি সংগ্রহপূর্ব্বক তথায় লক্ষ্মীদেবীকে পূজার্চ্চনা করিতে যাত্রা করিয়া থাকেন।

এইরূপ আবার শ্রীকৃষ্ণ যখন যমুনা পুলিনে মহা রাসলীলা করেন, তখন বৃন্দাদেবী শ্রীরাধার দূতীরূপে নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটান, সেই কারণবশতঃ শ্রীমতী মান করেন। শ্রীরাধার ঐ মানভঞ্জন করিতে শ্রীকৃষ্ণকে আপন মান জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীমতীর পদধারণ পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছিল। লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে লীলা করিয়া অপর এক লীলা প্রকাশ করিবার অছিলায় প্রিয়সখি বৃন্দা-দেবীকে এই বলিয়া অভিসম্পাত প্রদান করিলেন, "তুমি শ্রীরাধার নিকট আমায় যেরূপ অপদস্থ করিলে, তাহার প্রতিফলস্বরূপ সর্ব্বস্থানে তোমায় তুলসীবৃক্ষরূপে উৎপন্ন হইয়া অবস্থান করিতে হইবে, আরও কুকুর ঐ তুলসীর মহিমা অবগত না হইয়া তোমার উপর প্রস্রাব করিয়া

আমার অপমানের প্রতিশোধ লইবে।" এই নিমিত্ত একটী প্রবাদ আছে :—

"হেঙ্গল মানে না তুলসী বন।
ঠ্যাঙ্গ তুলে মুত্তোই মন॥"

বৃন্দাদেবী—শ্রীকৃষ্ণের নিকট এইরূপ শাপগ্রস্ত হইয়া প্রতিদানস্বরূপ তাঁহাকে এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন যে, "তোমায় শিলারূপ ধারণ করিয়া প্রসিদ্ধ হইতে হইবে, কিন্তু মানবগণ ঐ শালগ্রামশিলা মূর্ত্তি ভক্তিসহকারে পূজার্চ্চনা করিবে।" বৃন্দাদেবী মনোদুঃখে এইরূপ শাপ দিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং তাঁহারই রাঙ্গা চরণ দু'খানি হৃদয় মধ্যে স্থাপিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের তপস্যায় রত হইলেন।

এদিকে দেবীর স্তবে তুষ্ট হইয়া নারায়ণ তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলে—তিনি উপস্থিত সুযোগ পাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এই প্রার্থনা করিলেন, ভগবান যদি দাসীর প্রতি সদয় হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বর দান করুন, "যেন আমার তুলসী-পত্র ব্যতীত আপনার পূজা না মঞ্জুর হয়, তাহা হইলে সতত আমি ঐ রাঙ্গা চরণে স্থানপ্রাপ্ত হইব।" ভক্তবৎসল ভগবান "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহার আশা পূর্ণ করিলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তুলসীদেবী সর্ব্বত্র পূজিত হইয়াছেন, কিন্তু শাপপ্রযুক্ত এই পত্র গঙ্গাজলে ধৌত না করিয়া নারায়ণের পূজা হয় না।

বেলবন হইতে দুই ক্রোশ অগ্রসর হইলে "মান-সরোবর"। এই স্থানে বৃষভানুনন্দিনী মান করিয়া তাঁহার নয়ননীরে এক সরোবর প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত এই পুষ্করিণীটী "মান-সরোবর" নামে খ্যাত হইয়াছে। ভক্তগণ ইচ্ছা করিয়া আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলে—পাণিগ্রামে উপস্থিত হইতে পারিবেন। "পাণিগ্রামে আনন্দী-

বিনন্দী" দর্শনলাভ হয়, ইহারই সন্নিকটে বলদেব নামে যে তীর্থ বর্ত্ত-মান আছে,তথায় যে একটী ক্ষীরসরোবর নামে পবিত্র পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়—সেই ক্ষীরসাগরের সন্নিকটে এক মন্দির মধ্যে রোহিণী-নন্দনকে দর্শন করিয়া যাবতীয় পথক্লেশের অবসান করিতে পারিবেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাত্রা করিয়া যে ব্যক্তি শুদ্ধচিত্তে ভক্তিসহকারে একটী তুলসীবেদী প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, তিনি বৈকুণ্ঠপতির কৃপায় নিঃসন্দেহে পিতৃগণসহ বৈকুণ্ঠে স্থানপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এরূপ সৎ-কার্য্য এখানে আর দ্বিতীয় নাই।

ব্রজমণ্ডলের চৌরাশী ক্রোশ বন যাত্রার কোন শুভাশুভ দিনের আবশ্যক হয় না। শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসবের পর অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষের দশমী তিথির অপরাহ্নকালে এই শুভ যাত্রা করিতে হয়। এই ব্রজমণ্ডলীর দ্বাদশবন ও বহু সংখ্যক উপবন প্রদক্ষিণ করিলে ভারতবর্ষের যাবতীয় তীর্থ দর্শনের ফললাভ হইয়া থাকে; বৈষ্ণবগ্রন্থে ইহা স্পষ্টাক্ষরে প্রকা-শিত আছে। সুতরাং হিন্দু সন্তানমাত্রেরই ইহা প্রদক্ষিণ করা একান্ত কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে হইবে। কথিত আছে, একদা গোপরাজ বৃদ্ধ নন্দ ও রাণী যশোমতীর তীর্থপর্য্যটনের বাসনা হইল, কিন্তু তাঁহারা রামকৃষ্ণের স্নেহে এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, কি প্রকারে স্নেহ-প্রতিমা রামকৃষ্ণকে দৃষ্টের বহির্গত করিয়া তাঁহারা তীর্থপর্য্যটন করিতে যাইবেন, কেবল এই চিন্তাতেই তাঁহাদিগকে কাতর হইতে হইত; অবশেষে একদা তাঁহারা তীর্থপর্য্যটনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, তখন আকাশ পথে এক দৈববাণী শ্রুত হইল, "নন্দরাজ ও মহিষী, আপনাদের অন্য তীর্থে যাত্রা নিষ্প্রয়োজন; কেন না—এই ব্রজমণ্ডলেই ভারতের যাবতীয় তীর্থ সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে।" সেই দৈববাণী শ্রবণমাত্র তখন তাঁহারা আশ্বাসিত হইয়া সপরিবারে এই ব্রজমণ্ডলের সমস্ত বন ও

উপবন সকল ভ্রমণ করিয়া ভারতবর্ষের যাবতীয় তীর্থ পর্য্যটনের ফল-লাভ করিতে সমর্থ হইলেন।

যাত্রিগণ! সুবিধা বিবেচনা করিলে—এই উপদেশটী স্মরণ রাখিবেন। যাঁহারা বৃন্দাবন হইতে আগ্রা, ভরতপুর রাজবাটী, জয়পুর সহর ও ভুবনবিখ্যাত শ্রীগোবিন্দ ও গোপীনাথজীউর পবিত্র মূর্ত্তি পুষ্কর ও সাবিত্রীদেবীকে পূজার্চ্চনা করিতে অভিলাষ করিবেন, যদ্যপি কেহ বন-পরিক্রমণের সময় বৃন্দাবন যাত্রা করেন, অর্থাৎ ঝুলন ও জন্মাষ্টমীর সময় হয়, তাহা হইলে জন্মাষ্টমী উৎসব হইবার চারি-পাঁচ দিবস পূর্ব্বে বৃন্দাবন হইতে উপরোক্ত স্থানগুলির শোভা দর্শন করিতে যাত্রা করিবেন; তথা হইতে আবার কর্ত্তব্যবোধে জন্মাষ্টমীর নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভগবানের জন্মোৎসব দর্শন করিলে সকল দিকে সুবিধা হইবে।

বৃন্দাবন হইতে প্রথমে রেলযোগে আগ্রায় যাইবেন, কিন্তু আগ্রায় যাইতে হইলে বৃন্দাবন ষ্টেশনে ট্রেণে আরোহণপূর্ব্বক মথুরা জংশনে আবার গাড়ী বদল করিয়া আচনেরা নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হইবে, তথায় যে ট্রেণে উঠিবেন, উহা ক্রমান্বয়ে আগ্রায় পৌঁছিবে।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব ব্যাপার বৃন্দাবনে এক অদ্ভুত দৃশ্য। এ দৃশ্য যিনি একবার দর্শন করিয়াছেন, ইহজন্মে তিনি তাহা ভুলিতে পারিবেন না। ভক্তবৃন্দ—এই মহোৎসব দর্শনান্তে প্রফুল্লমনে কেহ স্বদেশ গমনের জন্য ব্যস্ত, আবার কেহ বন-পরিক্রমণে বহির্গত হইয়া থাকেন। বলাবাহুল্য, দশমীর পর দিবস এই ধাম এইরূপে একেবারে যাত্রীশূন্য হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ হইয়াছে, যে সকল যাত্রী ব্রজমণ্ডলের চৌরাশীক্রোশ বন-পরিক্রমণ করিতে যাত্রা করিবেন, তাঁহারা যেন বৃন্দাবনধাম হইতে

আপনাপন ব্রজবাসী (পাণ্ডা) সঙ্গে রাখেন, কারণ একজন ব্রজবাসী যাত্রীর সঙ্গে থাকিলে তাঁহার তত্ত্বাবধানে স্বচ্ছন্দে বন প্রদক্ষিণ হইয়া থাকে, অর্থাৎ এই অপরিচিত স্থানে যাত্রীদিগকে কোনরূপ কষ্টভোগ করিতে হয় না। ব্রজ চৌরাশীক্রোশ বন মধ্যে সকল স্থানে বাসোপযুক্ত গৃহাদি নাই, সুতরাং রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত একটী তাম্বুর বিশেষ আবশ্যক। দশ-বারজন লোক অক্লেশে থাকা যায়, এরূপ একটী তাম্বু—বৃন্দাবনধামের মধ্যেই ৮।১০৲ টাকা ভাড়া দিলেই পাওয়া যায়। বন-পরিক্রমণ যাত্রীদিগের যেরূপ তাম্বুর আবশ্যক, সেইরূপ আবার একখানি গো-শকট প্রয়োজন, কেন না—এই পক্ষকাল পরিক্রমণের আবশ্যকীয় পাথেয় বহনের সুবিধার নিমিত্ত। বনের স্থানে স্থানে তাম্বু খাটান এবং জিনিষ-পত্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটী ভৃত্যের একান্ত আবশ্যক, অতএব উহাও কর্ত্তব্যবোধে বৃন্দাবন হইতে একটী সংগ্রহ করিবেন।

এই স্থানে একটী কথা বলিবার আছে—এই ভৃত্যটী যেন পাণ্ডার পরিচিত হয়, কারণ বনমধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান সকল দর্শনকালে যাত্রীগণ প্রায়ই হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকেন, সেই সময় এই ভৃত্যই যাবতীয় আসবাবপত্র রক্ষা করিয়া থাকে। একটী ভৃত্যের মজুরী প্রতি রোজ ॥৵০ আনা হইতে ৷৷০ আনা ধার্য্য আছে। এই প্রশস্ত চৌরাশী ক্রোশ বন পরিক্রমণ করিতে অভাবপক্ষে চৌদ্দ দিবস সময়ের কম শেষ হয় না, অতএব যাত্রীগণ এই যাত্রা করিবার পূর্ব্বে বৃন্দাবন হইতে এক পক্ষের আহারীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিবেন। মেলা সময় বনের স্থানে স্থানে হাট বাজার বসিবার ব্যবস্থা হয়, তাহাতে মোটামুটী আহারীয় অর্থাৎ সরু চাল ও সরিষার তৈল ব্যতীত সমস্ত দ্রব্যই পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য, ভক্তগণ এই মহা-

ব্রত উদ্যাপন করিবার সময় আনন্দে বিভোর হইয়া স্থান মাহাত্ম্য গুণে সংসারের সকল মায়াই ছিন্ন করিতে সমর্থ হন সন্দেহ নাই, কিন্তু কি আশ্চর্য্য মায়াময়ের মায়াপ্রভাবে সেই সংসার বিষয় মনে হইবামাত্র আবার আত্মীয়স্বজনের নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইয়া তাহাদের প্রীতির জন্য তীর্থ স্থানের উপহারগুলি সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হন এবং যথাসময়ে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিয়া নিজালয়ে উপস্থিত হইয়াই গঙ্গাস্নান, বিপ্রগণকে ভুজ্যি দান এবং সাধ্যমত তাঁহাদের ভোজনান্তে দক্ষিণা প্রদানে সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন। কারণ কথিত আছে, এই সমস্ত নিয়মগুলি যথানিয়মে পালন করিতে পারিলে—নিঃসন্দেহে তীর্থফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তীর্থপর্য্যটনের পর স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক গঙ্গা স্নানের ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ;—

রাজা ভগীরথের স্তবে তুষ্ট হইয়া ভাগীরথী মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে তিনি ভগবান মহেশ্বরকে একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো! আমি, তুমি ও পার্ব্বতী এই ত্রিশক্তি একত্রে সংযুক্ত থাকায় —মর্ত্ত্যধামে পাপীগণ গঙ্গাস্নান করিলে অনায়াসে সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ; কিন্তু নাথ! এই স্থানে আমার একটী বিষয় জিজ্ঞাস্য আছে—যে সকল পাপী স্নান করিবে, তাহাদের পাপরাশি গঙ্গাতেই নিমগ্ন থাকিবে, অতএব ভগবান! এরূপ স্থলে আপনি এমন একটী উপায় করুন, যদ্দ্বারা ঐ পাপরাশি [illegible] প্রাপ্ত হয়।" তখন সদাশিব তাঁহাকে মধুরবচনে আশ্বাসিত করিয়া বলিলেন, "দেবি! তুমি নিঃসন্দেহে গমন কর। অতঃপর আমার আদেশে যে কোন ব্যক্তি তীর্থপর্য্যটনের পর যথানিয়মে গঙ্গাস্নান না

করিবে, তাহার যাবতীয় পুণ্যফল সেই পাপরাশি নাশ করিবে, অর্থাৎ যদ্যপি কোন ব্যক্তি তীর্থপর্য্যটনের পর গঙ্গাস্নান না করে, তাহা হইলে স্বয়ং আমি গুপ্তভাবে তাহার সকল পুণ্য হরণ করিয়া ঐ পাপরাশি ক্ষয় করিব।" ভগবান মহেশ্বরের নিকট এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ভাগীরথী হৃষ্টচিত্তে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই নিমিত্ত তীর্থ পর্য্যটনকারীকে নিজালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যথানিয়মে গঙ্গাস্নান করিতে হয়।

গঙ্গা-মাহাত্ম্য বিষয়ে আর একটী প্রাচীন গল্প প্রকাশিত হইল ;—

একদা হরপার্ব্বতী ও গণেশ—একত্রে কৈলাশপর্ব্বতে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় দেবসেনাপতি "কার্ত্তিক" তীর্থপর্য্যটনে কৃতনিশ্চিত হইয়া পূজ্যপাদ পিতামাতার অনুমতি প্রার্থনা করিলে—তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে কার্ত্তিকের বাসনা পূর্ণ করিলেন। তখন গণেশ আন্তরিক দুঃখিত মনে ভগবানের শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন, "পিতঃ! শরানন অনায়াসে অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার দ্রুতগামী ধীশক্তিসম্পন্ন বাহন ময়ূরের সাহায্যে তীর্থ সকল পর্য্যটন করিতে সমর্থ হইবেন,সন্দেহ নাই, কিন্তু হে জগৎপতে! আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমার বাহন দুর্ব্বল ইন্দুর, অতএব আমার প্রতি সদয় হইয়া এমন একটী উপায় করিয়া দিন, যদ্দ্বারা আমিও কার্ত্তিকের ন্যায় অল্প সময়ের মধ্যে যাবতীয় তীর্থপর্য্যটন ফলপ্রাপ্ত হইতে পারি?"

ভগবান মহেশ্বর তখন গণেশের আন্তরিক দুঃখ দূরীকরণার্থে এই উপদেশ দিলেন, "বৎস গণেশ! এক্ষণে তোমার দূরদেশস্থ কোন তীর্থ

পরিক্রমণ করিবার আবশ্যক নাই। তুমি যে তীর্থে গমন করিতে অভিলাষ করিবে, আমার উপদেশ মত কেবল তোমার জননী পার্ব্বতী-দেবীকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক গঙ্গাস্নান করিবামাত্র সেই তীর্থের ফললাভ করিতে সমর্থ হইবে।" তখন গণেশ পিতৃ উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার কৃপায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে আপন অভিলাষ পূর্ণ করিয়া লইলেন। অতএব যে কোন ব্যক্তি তীর্থপর্য্যটনে অক্ষম, অথচ তীর্থ দর্শন অভিলাষী—তাঁহারা যেন আপনাপন পূজনীয়া মাতৃচরণে ভক্তিস্থাপন করতঃ গঙ্গা স্নান করিয়া গণেশের ন্যায় যাবতীয় তীর্থপর্য্যটনের ফলভোগ করেন।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত

সমালোচনা

(সারসংগ্রহ)

স্থানাভাববশতঃ কয়েকখানি ভিন্ন সকল অভিমত প্রকাশিত হইল না।

বর্ত্তমান সাহিত্যযুগের অদ্বিতীয় সমালোচক চুঁচুড়া নিবাসী দেশপূজ্য সুপ্রবীণ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহোদয় "সচিত্র তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী সম্বন্ধে বলেন ;—

কতকটা সখের খাতিরে, কতকটা স্বাস্থ্যের জন্য যৌবনে অনেক তীর্থেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, আজ আবার বৃদ্ধ বয়সে ঘরে বসিয়া আগ্রহের সহিত "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" পড়িলাম। দেখিলাম, এই নূতন লেখক এক নূতন পন্থায় তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের খাঁটি হিন্দুত্ব সব প্রকাশ হইয়াছে। গ্রন্থের গুণপনা এই যে, ইহাতে সমাজের ছড়াছড়ি, অলঙ্কারের ছড়াছড়ি নাই, ভাষাটী বেশ সরল, স্নিগ্ধ ও শান্ত—যেন বাঙ্গালীরই ঘরের কথা, আর গ্রন্থকারের গুণপনা এই যে, পরের মুখে ঝাল না খাইয়া ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর পবিত্র চক্ষে তীর্থ সম্বন্ধে মাহাত্ম্য সকল খুঁটিনাটী কথা কহিয়া সাধারণের অজ্ঞেয় বহু তত্ত্বই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। এই গ্রন্থের এক খণ্ড সঙ্গে থাকিলে বিদেশ গিয়া সহচরের অভাবে কোন অসুবিধাই ভোগ করিতে হয় না ; কেন না, কোন্ তীর্থে কি দর্শনীয় কি করণীয়, কোন্ পূজার কোন্ দ্রব্য প্রয়োজনীয়, কোন্ স্থানের অধিবাসীরা কোন্ জিনিষকে কি নামে অভিহিত করে, এ সকল কথা বেশ নিপুণতার সহিত বিশদভাবে বোঝান হইয়াছে।

বসুধা, ১ম সংখ্যা—১২শ বর্ষ, সন ১৩১৯ সাল।

বিখ্যাত "মেদিনীপুর" হিতৈষী সম্পাদক বলেন ;—

সচিত্র "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" শ্রীগোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত। উত্তম কাপড়ে বাঁধান মূল্য ১৲ টাকা। তীর্থ সমূহের পনেরখানি উত্তম হাফটোন ছবি আছে। গ্রন্থকার বহুবার তীর্থপর্য্যটন করিয়া যে সমুদয় জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাহাই গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠে তীর্থ-যাত্রীবৃন্দ বিশেষ জ্ঞানলাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তীর্থে কত প্রকার চোর, জুয়াচোর, বদমাস ও প্রতারক আছে, ইহা পাঠে তাহা জানিতে ও সাবধান হইতে পারিবেন। ইহাতে তীর্থ সমূহের বিশেষ বিবরণ ও কোন্ কোন্ তীর্থে কোন্ কোন্ দ্রব্যের আবশ্যক ও দ্রষ্টব্য স্থান কি, তাহাদেরও বিশেষ উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান তীর্থ-সমূহের বিবরণী সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন প্রাচীন পুরাণ-কাহিনী-তীর্থের উৎপত্তিও বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকারের প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা লোকহিতৈষণাবৃত্তিই সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট হইতেছে, এজন্য তিনি অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র।

মেদিনীপুর হিতৈষী, ২৫শে আষাঢ়, সন ১৩১৮ সাল।

বৈশ্যজাতির মুখপত্র প্রসিদ্ধ "সুবর্ণবণিক" সম্পাদক বলেন ;—

"তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" শ্রীগোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত, ৩৫৬ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীবিপিনবিহারী ধর কর্তৃক প্রকাশিত. মূল্য ১৲ টাকামাত্র। এই পুস্তকখানি বিলাতী বাঁধাই, ছাপানও অতি সুন্দর। অনেক তীর্থ-চিত্র ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" তীর্থযাত্রীর একমাত্র সম্বলের বস্তু বলিলে অত্যুক্তি হয় না, …ণকালে তীথযাত্রীদিগকে ঠগের হাতে পড়িয়া অনেক সময়ে …স্ব হইতে হয়, তন্নিবারণের জন্য গ্রন্থকার এই পুস্তক প্রণ

করিয়া ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। অনেক স্থানের ইতিহাসও ইহাতে বেশ সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

সুবর্ণবণিক, ৩রা অগ্রহায়ণ, সন ১৩১৭ সাল।

জগদ্বিখ্যাত বসুমতী সম্পাদক বলেন ;—

সচিত্র "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" শ্রীগোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত, ৩৫২ নং অপার চিৎপুর রোড হইতে শ্রীবিপিনবিহারী ধর কর্তৃক প্রকাশিত। উত্তম কাপড়ে বাঁধা, মূল্য ১৲ টাকা। নানা তীর্থের বহু হাফটোন ছবি ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তীর্থযাত্রীগণ পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন। ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থ সমূহের বিবরণ প্রভৃতি ইহাতে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

বসুমতী, ২রা অগ্রহায়ণ, সন ১৩১৮ সাল।

জন্মভূমি সম্পাদক বলেন ;—

সচিত্র "তীর্থ ভ্রমণ-কাহিনী" শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। কাশী, গয়া, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, অযোধ্যা ও কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি অনেকগুলি পুণ্যতীর্থ ভ্রমণ করিয়া গোষ্ঠবিহারী বাবু এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহাতে জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক আছে। যাঁহারা তীর্থ দর্শনে অভিলাষী, এতদ্দ্বারা কেবল তাঁহাদের বিশেষ উপকার হইবে, এমন নহে—যাঁহারা ঘরে বসিয়া পাঠ করিবেন, তাঁহারাও অনেক জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন। তীর্থের অনেক স্থানের মাহাত্ম্য অনেকে অবগত নহেন, এই পুস্তকে বিশেষ বিশেষ পুণ্যস্থানের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য সন্নিবেশিত থাকাতে ইহা ভক্তগণের পরম আদরণীয় হইয়াছে।

জন্মভূমি, ১৫ সংখ্যা, মাঘ, সন ১৩১৮ সাল।

একমাত্র দৈনিক সুপ্রসিদ্ধ নায়ক সম্পাদক বলেন,-"সচিত্র তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা।

এই বইখানি খুলিলে প্রথমেই ইহার চিত্রগুলি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; ইহাতে গ্রন্থকারের প্রতিকৃতিসহ ১৫।১৬খানি পূর্ণ আকারের সুদৃশ্য হাফটোন চিত্র আছে। চিত্রগুলি সুন্দর! গ্রন্থের আকার ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, আড়াই শত পৃষ্ঠার অধিক। উত্তর ভারতের অনেকগুলি তীর্থক্ষেত্রের বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তীর্থক্ষেত্রে গমনের পথে প্রবঞ্চক ও সেতুয়া এবং তীর্থক্ষেত্রে পাণ্ডাগণের অত্যাচার হইতে আরম্ভ করিয়া প্রধান প্রধান তীর্থ ক্ষেত্রের উৎপত্তির বিবরণ পূজা ও দেবদর্শন বিধি, দেবতা ও পাণ্ডাগণের প্রণামী এবং অন্যান্য প্রাপ্য, তীর্থ যাত্রীদিগের যে সকল দ্রব্য, যে পরিমাণ পাথেয় এবং নিজের আহারের জন্য যে সকল জিনিষ আবশ্যক, তাহার তালিকা—এ সকল বিষয় এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তীর্থ ক্ষেত্রের বিবরণের সঙ্গে অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানেরও বিবরণ ইহাতে লিখিত হইয়াছে, এমন কি নারীজাতির লক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ও এ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা মন্দ নয়, মোটের উপর গ্রন্থখানি সুপাঠ্য হইয়াছে।

নায়ক—২৪শে বৈশাখ, ৫ম বর্ষ, সন ১৩১৯ সাল।